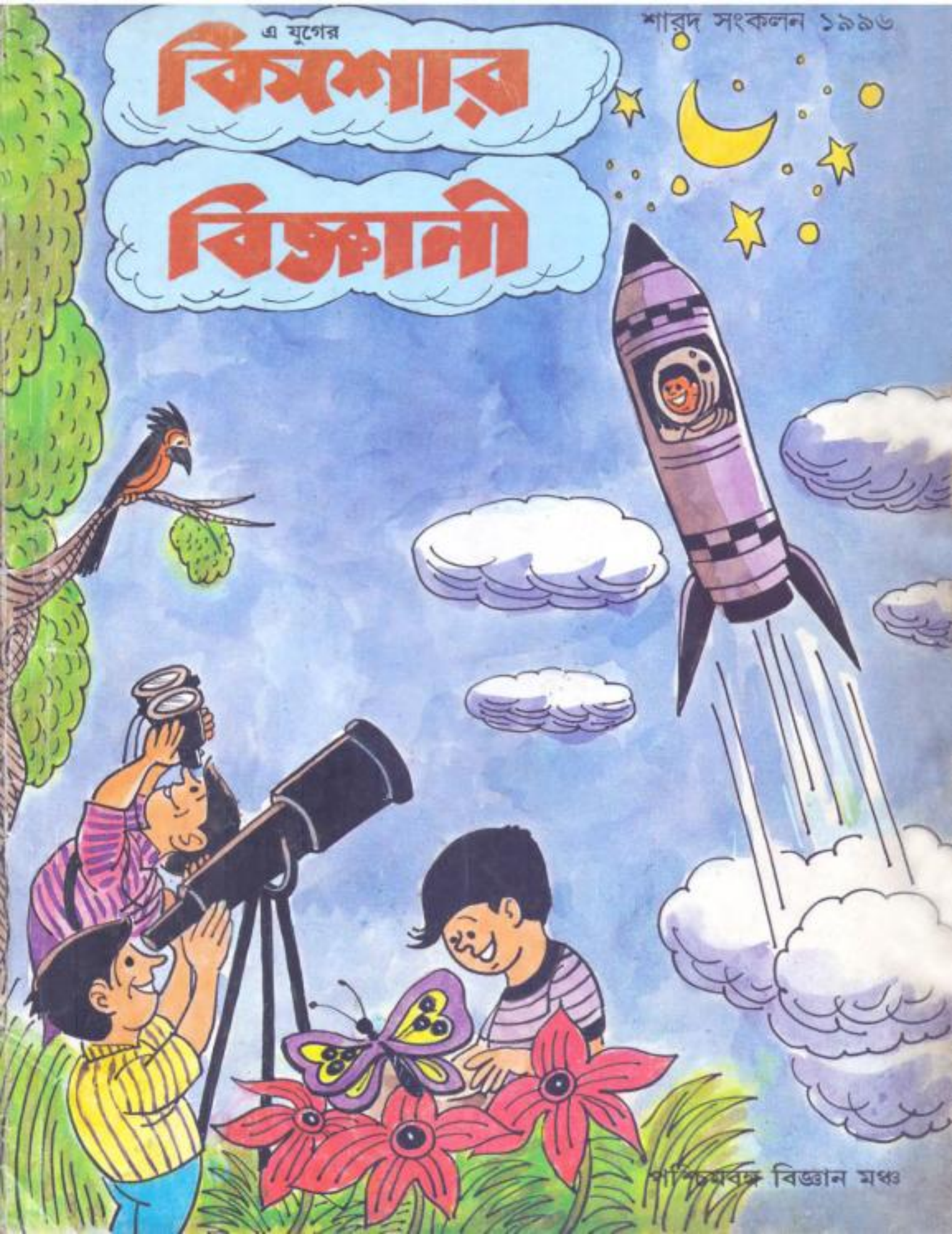

এ যুগের
কিশোর
বিজ্ঞানী
শারদ সংকলন ১৯৯৬
পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান মঞ্চ

With best Compliments of

**
***
****
*****
******

A. G. CONSULTANT GROUP (P) LTD.

SERVICES ❐ ENGINEERS ❐ CONSULTANTS

11, OLD POST OFFICE STREET
CALCUTTA-700 001

এ যুগের

কিশোর বিজ্ঞানী

শারদ সংকলন ১৯৯৬

সম্পাদক ❑ শ্যামল চক্রবর্তী

সহ-সম্পাদক ❑ দীপা সরকার

সম্পাদক মণ্ডলী ❑ শংকর চক্রবর্তী, পৃথা দাশগুপ্ত, নীহার রায়, নিমাই দত্তগুপ্ত, জীবন সর্দার, শ্যামল দাশগুপ্ত, শ্রীকান্ত চট্টোপাধ্যায়, তপন সামন্ত, অশোক মিত্র।

প্রচ্ছদ ❑ অমল চক্রবর্তী

অলংকরণ ❑ তপন দে

লেজার টাইপিং ❑ শৈলী
৪এ, মানিকতলা মেইন রোড, কলিকাতা-৫৪
ফোন-৩৫২-২২৬৩

মুদ্রণ ❑ শৈলী

মূল্য ❑ বাইশ টাকা

পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান মঞ্চের পক্ষে শ্রীদীপ ভট্টাচার্য কর্তৃক হেমন্ত ভবন (৪র্থ তল)
১২, বি. বা. দি. বাগ, কলিকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত

সূ চী প ত্র

মৌলিক কণার কাহিনী / জয়ন্ত বসু / ৬
বর্তমান শতাব্দীর মাঝামাঝি যে বহু হেড্রন কণার সন্ধান পাওয়া গেছলো, সেগুলোকে কোন-না-কোন ছকে সাজাবার চেষ্টা থেকেই কোয়ার্কের .....

গবেষণাগারে বিবর্তন / গোপাল ভট্টাচার্য / ২১
বিবর্তনের পথে আজ যে জয়ী কাল সে পরাজিত। আজ যে পরাজিত সে চিরতরে হারিয়ে যেতে পারে। এর কারন পরিবেশের ক্রমশঃ পরিবর্তন। .....

বিপ্লবীরা যেখানে হার মেনেছেন / অপরাজিত বসু / ১১
বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে সময়ের কোন ছোট মাপ আছে, তেমনি বড় মাপও আছে। একজন মানুষ বাঁচে $১০^{১০}$ সেকেণ্ড ডাইনোসররা বেঁচে ছিল $১০^{১৬}$ সেকেণ্ড আগে ! ....

চকচকে গাছপালা / দিবাকর সেন / ২৪
শাপলা পাতা জলে ভাসে। শাপলা পাতায় জল দাঁড়ায় না। পদ্ম পাতায়ও জল দাঁড়ায় না। যদি জল দাঁড়াত তা হ'লে এ জাতীয় গাছের পাতা শুকনো চকচকে দেখা যেত না। .....

বিশ্বাস বনাম বিজ্ঞান / বলরাম মজুমদার / ১৪
সমস্ত ইউরোপে সাড়া পড়ে গেল। সব বাড়ীতেই এ বই কেনার জন্য হুড়ু-হুড়ি। পড়তে হবে ডারউইন কি বলতে চায়। দেখা গেল মানুষ বইটাকে ভাল ভাবে নিল না।

আর্কিমিডিস / শংকর চক্রবর্তী / ২৫
রোমান সেনাপতি মার্সেলাস তিন বছর সিরাকিউজকে অবরুদ্ধ করে রেখেও জয় করতে পারেন নি। এর মূলে ছিল আর্কিমিডিসের বৈজ্ঞানিক প্রতিভা। .....

চঞ্চল অতিথি / জীবন সর্দার / ১৭
আমার দেওয়া নাম নিয়ে আমিই চলতাম। কিন্তু মজে গিয়েছিলাম প্রজাপতির খোঁজখবরে। বসা বা ছুটন্ত প্রজাপতি দেখেই মজা পেতাম। .....

কলাগাছের জীবনকথা / কমল চক্রবর্তী / ২৯
কলায় বিভিন্ন ধরনের ধাতব মৌল থাকে। সব থেকে বেশি থাকে ম্যাগনেসিয়াম, তারপরে সোডিয়াম এবং তারপরে পটাসিয়ামের স্থান। .....

চকোলেট গাছ / জয়ন্ত দাস / ২০
আমেরিকা থেকে দেশে ফেরার সময় কলম্বাস বেশ কিছু ক্যাকাও ফল পকেটে করে নিয়ে এসেছিল। আর তারপর ! বর্বর নিগ্রোদের সেই খাদ্য .....

ম্যালেরিয়া ফাইলেরিয়া / সুভাষ বন্দ্যোপাধ্যায় / ৩২
সাধারণত ৩-১২ মাসের মধ্যে স্ত্রী শূককৃট ডিম দেয়। সেই ডিম থেকেই বের হয় মাইক্রোফাইলেরিয়া। জন্মানোর সময় এদের দেহ একটি পাতলা .....

মাত্র দু'ঘণ্টার জন্যে ! / অসিত দত্ত / ৩৫
বেলের আবেদন জমা পরার মাত্র দুঘন্টা পরে এলিসা গ্রে একটি হলফনামা পেশ করেন। হলফনামায় গ্রে তার কল্পনার রূপ বর্ণনা করতে গিলে লেখেন .....

শব্দোত্তর অণুবীক্ষণ / সন্তোষ কুমার ঘোড়ই / ৩৯
শেষকথা বলে বিজ্ঞানে কিছু হয় না। সময়ের সংগে তুলনামূলকভাবে যন্ত্রের সুবিধা বা অসুবিধার কথা বলা যায় মাত্র। ইলেকট্রন অণুবীক্ষণ যন্ত্রের চেয়ে .....

তিনটি ছড়া / ভবানী প্রসাদ মজুমদার

বিজ্ঞানের পাঁচালি / ৪৩
'শুমেকার লেভি' আছড়ে পড়লো বৃহস্পতির বুকে

ভৃগু-কিরো, সবাই জিরো / ৪৪
"বরাত খারাপ ! বরাত খারাপ !" চেঁচাস্ মিছেই রাগে

হাঁচি থেকে হার্টফেল, কাশি থেকে ক্যান্সার / ৪৫
বিজ্ঞানী কালু রায়, বাড়ি যার কালনায়

হারানো স্বর / তরুণ বন্দ্যোপাধ্যায় / ৪৬
এখন তোর গানটা আমি রিউইন্ড করে শোনাচ্ছি। তুই শুধু আমাকে বল, গানটাতে কোথায় কিরকম পরিবর্তন চাস তুই। মানে কিরকম হলে সেটা তোর মনের .....

নিম / চন্দন কর / ৫০
পেটের অসুখের ক্ষেত্রে নিমপাতা উপকার দেয়। গ্রীষ্মের চর্মরোগ, ফোঁড়া ইত্যাদি থেকে রক্ষা পাওয়ার উপায় নিমপাতা ভেজানো জল। .....

ধূমকেতু রহস্য ও হেইল্-বপ /

অমলেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় / ৫২
১৬৮২ সালে হ্যালির যখন ২৬ বছর বয়স, তখন ইউরোপের আকাশে দারুণ উজ্জ্বল এক ধূমকেতুর আবির্ভাব হয়, হ্যালি তখন অক্সফোর্ড .....

গ্যাস্প্রা / অলোকমোহন চট্টোপাধ্যায় / ৫৯
১৮০১ সালে ইটালীর বিজ্ঞানী পিয়াস্জী প্রথম গ্রহাণু আবিষ্কার করেন। সেটার নাম দেওয়া হয় সিরেস। সিসিল শহরের অধিষ্ঠাত্রী দেবীর নামে এই .....

আরও ছড়ার ছড়াছড়ি

আকাশ পাড়ায়, আলো-ইশারায় /

শ্যাম বন্দ্যোপাধ্যায় / ২০
গ্রহ, তারা আর ধূমকেতু নিয়ে ভেবে, ...

ঝগড়াঝাটি / তপোময় ঘোষ / ২৩
হাইলা নামক গেছো ব্যাঙকে .....

ভেবু ও কেবুর অঙ্ক পাঠ / অরুণাভ মিশ্র / ৬৩
ঘুম ভেঙে মাঝ রাতে, উঠে দেখে ভ্যাবলা .....

প্রকৃতির পাঠশালা / চৈতালী ভদ্র নন্দী / ৬৭
আকাশ থেকে শিক্ষা নিয়ে উদার হব ভাইরে। .....

গণিত শিক্ষা / রতনমোহন খাঁ / ৬১
গণিতের পাঠক্রমে গণিতের ব্যাকরণ মুখ্য হবে, কিন্তু ব্যাকরণ সব গ্রাস করবে না। গণিতের সম্মানের পাঠক্রমে কম্পিউটার বিজ্ঞান, অ্যাকাউন্ট্যান্সি, ...

নোবেল পুরস্কার ও স্যার আলফ্রেড নোবেল / শ্রীরূপ গোপাল গোস্বামী / ৬৫
কেবলমাত্র একটি মাত্র সংস্থা থেকেই সবগুলি পুরস্কার দেওয়া হয় না। পদার্থবিদ্যা ও রসায়নের পুরস্কার দুটি দেয় সুইডিশ বিজ্ঞান একাডেমি, ...

একটি টুপি ঘটিত কাহিনী / স্বপন বন্দ্যোপাধ্যায় / ৬৮
সেখানে একটা রিসিভার তাকে গ্রহণ করতো। তারপর তা বিশেষভাবে তৈরি একটি টেপে আঁচড় দিয়ে সৃষ্টি করতো চিন্তার তরঙ্গ রেখা। সেই টেপকে উচ্ছ .....

শব্দ জব্দ / সুমিত্রা চৌধুরী / ৭৩
বাদুড়ের পাঠানো তরঙ্গ যদি প্রতিফলিত হয়ে ফিরে না আসে তাহলে ওরা বুঝতে পারে ধারে কাছে কোনো কঠিন বস্তু নেই। আবার কঠিন বস্তুতে .....

জীবনের অস্তিত্ব মঙ্গলগ্রহে ? / অমিয়কুমার হাটি / ৭৬
আসলে গ্রহান্তরে বা তারকান্তরে প্রাণ আছে এটা মানুষের একটা বিশ্বাস। দার্শনিকরা এ নিয়ে কথা বলেছেন। ধরা যেতে পারে প্লেটোর কথা। তাঁর ধারণা ছিল .....

বোকাবাক্স / নৃসিংহ কুমার ভট্টাচার্য / ৭৮
যদি একজন সারাদিন হাজারটা বিজ্ঞাপনে হাসি খুশি সুন্দর জামাকাপড় পরা মানুষদের দেখে যারা গাড়ি চড়ে, সেলুলার ফোন ব্যবহার করে, রাজকীয় .....

পরমাণুর আড়ালে বোমা / নিমাই দত্তগুপ্ত / ৮১
হিটলার বাহিনীর অত্যাচার, প্রতিহিংসা, জাত্যাভিমান, চুক্তিভঙ্গ, পররাজ্য গ্রাস মানুষকে অতিষ্ঠ করে তোলে। তার অত্যাচার প্রতিহিংসা সহ্য করতে না পেরে .....

মেঘ ও বৃষ্টি / দিলীপ কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় / ৮৩
অম্ল-বৃষ্টির ফলে বিষিয়ে উঠছে নদনদী, খালবিল, হ্রদ ও ঝিলের জল। নষ্ট হচ্ছে চাষের জমি, জলজ প্রাণী, সবুজ অ্যালগি ও শ্যাওলা। মাছের ডিম ফুটছে না। .....

প্যালিনড্রোম নিয়ে দু-চার কথা / অনীশ দেব / ৮৬
ভাষা সংক্রান্ত প্যালিনড্রোমের যেসব উদাহরণ এ পর্যন্ত দিয়েছি, তার সবই প্রায় ইংরাজি। বাংলায় কি কোনও প্যালিনড্রোম-শব্দ হয় না ? নিশ্চয়ই হয়। .....

জিন খানা / ত্রিদিব কুমার চট্টোপাধ্যায় / ৮৯
ভদ্রলোকের কথা বলার মতো অবস্থা নেই ! যেটুকু বোঝা গেল, ওঁরাও আজ কাগজে খবর দেখে এসেছিলেন। তারপর স্ত্রীর পেড়াপেড়িতে আজ থেকেই .....

বিজ্ঞানের শব্দ জব্দ / রোশেনারা মিশ্র / ৯২

সম্পাদকীয়

❖

উৎসবে উৎসবের আনন্দে মেতে থাকতে কার না মন চায় বলো। চাইলেও পারছি কই ?

পরমাণু বোমা আমরা কেউ চাইনা। নাগাসাকি চাইনা। হিরোশিমা চাইনা। অনেকগুলো দেশ মিলে একসঙ্গে বসা হল। চুক্তিপত্র হোক একটা, কেউ আর কোনদিন পরমাণু বোমা তৈরী করবেনা।

পরমাণু গবেষণার বিষয়ে আমাদের দেশ পিছিয়ে নেই। ফলে টেবিলের আলোচনায় ডাক পেলুম আমরাও।

নামেই আলোচনা। দু'একটা দেশতো আগেই সিদ্ধান্ত করে এনেছে। আমাদের বলা হল, গুটিয়ে নাও এবার পরমাণু গবেষণা।

আমরা রাজী হইনি। কেন হইনি রাজী ? বড়ো বড়ো ক'টা দেশ, মাথায় যার আমেরিকা, বানিয়ে রেখেছে বেশ কিছু বোমা। আগে এসব বোমাকে ধ্বংস করা হোক। সব ক'টা দেশ যদি নিঃশেষ করে দেয় সব মজুত, তবেই আলোচনার মানে হয়।

কেউ কেউ জমিয়ে রাখবে বেশ, আর আমরা হুটহাট বন্ধ করে দেবো সব পাট, এ হতে পারেনা। সঙ্গত কারণেই একথা আমরা শুনিনি। আমাদের প্রতিনিধি দৃঢ়চিত্ত। অভিনন্দন তাঁকে।

গ্যাট চুক্তিতে সই করে দেশটা বুঝি বেচেই দিয়েছিলুম আমরা। ফিরে দাঁড়িয়েছি সেই আমরাই। ভেবে ভালো লেগেছে।

উৎসবের আনন্দে চাইলেও মেতে থাকতে পারছিনা। ক' সপ্তাহ আগে মাত্র, কাবুলে শাসন বদল হল। রাষ্ট্রসংঘকে তো মানতে হয় সবারই। অথচ রাষ্ট্রসংঘের ভেতর থেকে টেনে হত্যা করা হল এক শাসকনেতাকে।

যে মায়েরা জীবনযুদ্ধে লড়েছেন, এক ফতোয়ায় চলে গেল এঁদের চাকুরী। শুধু চাকুরী কেন, বিজ্ঞান প্রযুক্তির কোন আধুনিকতার ছোঁয়া মায়েদের বোনেদের চলবেনা।

উন্মাসে মত্ত হয়ে উঠেছে এক দল মানুষ। রাজার রাজার যিনি — তার নাকি এমনই বাসনা।

নির্মমতার এই ছবি শেষ হবে কবে কে জানে।

রাগ করোনা এসব কথা বলতে হলো বলে। আগুন যদি লেগে যায় পাশে, চুপ করে থাকবো কেমন করে আমরা, বলো।

নানা রঙের লেখায় সাজানো হল এই সংকলন। বিজ্ঞানের নিবন্ধের পাশাপাশি বিজ্ঞানের গল্প-ছড়াও আমরা দিয়েছি। জানিও, কেমন লেগেছে তোমাদের। শুভেচ্ছা নিও।

মৌলিক কণার কাহিনী

জয়ন্ত বসু

তরুণ বিজ্ঞানী জ্ঞানাঙ্কুর বসাক দুর্গাপুরে দিদির বাড়িতে এসেছে সপ্তাহান্তের দু'দিনের ছুটিতে। সকালে জলযোগের পর একটু ঘুরতে বেরবে ভেবেছিল, এমন সময় ঝমঝম করে বৃষ্টি এসে পড়ায় বেজার মুখে বারান্দায় বসে আছে। আরো বেজার মুখ করে সেখানে এসে হাজির হল তার ভাগ্নে চক্রধর ওরফে চাকু। তার বোন চিন্ময়ী ওরফে চিনি তাকে যথারীতি এক প্রশ্ন করে বেকায়দায় ফেলেছে বলে তার এই বিরক্তি। মামার কাছে সে কথাটা পাড়বার আগেই চিনিও সেখানে এসে উপস্থিত। দাদাকে কিছু বলবার সুযোগ না দিয়েই সে বলতে শুরু করলো ঃ

জানো মামু, কাল আমাদের স্কুলে 'ভৌত বিজ্ঞানের দিদি' বললেন যে, পরমাণুর নিউক্লিয়াসের মধ্যে যে প্রোটন আর নিউট্রন থাকে, সেগুলোও নাকি আবার অন্য কণা দিয়ে তৈরি — কণার নামটা আমি ভুলে গেছি বলে দাদাকে জিগ্যেস করেছিলাম, তা দাদা বললো, ও সব তোদের ভৌত দিদির ভুতুড়ে কথা — ও রকম কোন কণাই নেই। তুমি বলো তো মামু, দিদি কি তাহলে ভুল বলেছেন ?

জ্ঞানাঙ্কুর ভাবলেন, সত্যি কথাটা তো বলতে হবে তবে চাকুর মেজাজটাও ঠাণ্ডা করা দরকার। তাই সে গৌরচন্দ্রিকার অবতারণা করে বললো, বিজ্ঞানে যে সব তত্ত্ব ও তথ্য আবিষ্কৃত হয়, সেগুলো স্বীকৃত হতে ও তারপর সাধারণভাবে পরিচিত হতে বেশ কিছুটা সময় লাগে। সেজন্য স্কুল-কলেজের পাঠ্যপুস্তকে — বিশেষত আমাদের মতন দেশে — সে সব অন্তর্ভুক্ত হতে অনেকখানি সময় লাগে। সে সব বিষয়ে স্কুল-কলেজে আলোচনা হয় না বললেই চলে। চিনি, তোমার দিদি যে কণার কথা বলেছেন, সেই কোয়ার্ক বিজ্ঞানের সাম্প্রতিক আবিষ্কার। চাকুর মতন উচ্চমাধ্যমিকের ভাল ছাত্রদেরও তাই এ বিষয়ে না জানাই স্বাভাবিক।

চাকুর দিকে আড়চোখে তাকিয়ে জ্ঞানাঙ্কুর দেখলো, তার মুখ থেকে মেঘ কেটে যাচ্ছে। সে বলে চললো, কোয়ার্কের বিষয় বলবার আগে মৌলিক কণা সম্বন্ধে দু'চার কথা বলা দরকার, যাতে কোয়ার্কের ধারণা কেন ও কিভাবে এল, তা বুঝতে পারবে। তোমরা তো জানো, এখন থেকে একশো বছর আগেও বিজ্ঞানীরা মনে করতেন, পরমাণু পদার্থের ক্ষুদ্রতম অবিভাজ্য কণা। Elementary particle বা মৌলিক কণা বলতে তখন পরমাণুকেই বোঝাত। তারপর ৩০-৪০ বছরের মধ্যে জানা গেল, পরমাণুর গঠন অনেকটা সৌর জগতের মতন — মাঝখানে রয়েছে নিউক্লিয়াস আর দূর থেকে তাকে প্রদক্ষিণ করছে এক বা একাধিক ইলেকট্রন। আরো জানা গেল, নিউক্লিয়াসের মধ্যে রয়েছে দু'রকম কণা ঃ প্রোটন ও নিউট্রন। প্রোটনের ভর নিউট্রনের ভরের চেয়ে সামান্য কম কিন্তু ইলেকট্রনের ভরের প্রায় ১৮৪০ গুণ। প্রোটন ধনাত্মক বৈদ্যুতিক আধানযুক্ত, ইলেকট্রন ঋনাত্মক বৈদ্যুতিক আধানযুক্ত, তবে দু'টির আধানের পরিমাণ সমান। নিউট্রন হল বিদ্যুৎ নিরপেক্ষ। আর এক ধরনের বিদ্যুৎ নিরপেক্ষ কণার সন্ধান পাওয়া গেল, যার ভর ইলেকট্রনের ভরের তুলনাতেও নগণ্য। এর নাম দেওয়া হল নিউট্রিনো। এই যে প্রোটন, ইলেকট্রন, নিউট্রন ও নিউট্রিনো, এগুলির প্রত্যেকটিরই আবার বিপরীত কণা আছে।

চিনি একটু আশঙ্কিত হয়ে বলে, বিপরীত কণা কী ? বিপরীত শব্দ মুখস্থ করতে করতে তো জেরবার হয়ে গেছি। সে রকম কিছু নয়তো ?

জ্ঞানাঙ্কুর ব্যাখ্যা করে বলে, বিপরীত কণা হল এমন কণা, কোন একটি বা দু'টি ধর্মের দিক থেকে যা সাধারণ কণার বিপরীত কিন্তু ভর ও অন্য সব বিষয়ে একেবারে এক। যেমন ধরো, ঋণাত্মক আধানযুক্ত ইলেকট্রনের

বিপরীত কণা পজিট্রনের আধান হল ধনাত্মক কিন্তু ভর হল ইলেকট্রনের ভরের সমান। বিপরীত কণার বৈশিষ্ট্য হল এই যে, সাধারণ কণার সঙ্গে তার মিলনে দু'টিই বিলুপ্ত হয়ে শক্তির উদ্ভব হয়। আমাদের জগতে এজন্যে বিপরীত কণাগুলি ক্ষণস্থায়ী।

এখন থেকে একশো বছর আগেও বিজ্ঞানীরা মনে করতেন, পরমাণু পদার্থের ক্ষুদ্রতম অবিভাজ্য কণা। Elementary particle বা মৌলিক কণা বলতে তখন পরমাণুকেই বোঝাত। তারপর ৩০-৪০ বছরের মধ্যে জানা গেল, পরমাণুর গঠন অনেকটা সৌর জগতের মতন — মাঝখানে রয়েছে নিউক্লিয়াস আর দূর থেকে তাকে প্রদক্ষিণ করছে এক বা একাধিক ইলেকট্রন।

চাকুর মুখে মেঘ ঘনাচ্ছে দেখে অবস্থার সামাল দিতে জ্ঞানাঙ্কুর নিজেই প্রশ্নের উত্তর দেয়। বলে, Strong force বা সতেজ বল নামে যে আকর্ষণ বল আছে, তার জন্যই কণাগুলো একত্র থাকে। নাম থেকেই বুঝতে পারছো, এই বল খুব শক্তিশালী। নিউক্লিয়াসের মধ্যে এর প্রভাব বৈদ্যুতিক বলের প্রভাবের চেয়ে অনেক বেশি। তবে এর বিস্তৃতি খুব কম, নিউক্লিয়াসের বাইরে সামান্য দূরত্ব পর্যন্তই এ কার্যকর থাকে।

চাকুর কিছুটা ধৈর্যচ্যুতি হয়। সে বলে, কোয়ার্কের সঙ্গে এ সবের সম্পর্ক কী ?

জ্ঞানাঙ্কুর ঃ ধীরে, ভাগ্নে, ধীরে ! সম্পর্ক একটা আছে বৈকি, কোয়ার্ক যেমন, বিপরীত কোয়ার্কও তেমনি গুরুত্বপূর্ণ কণা। তবে সে কথায় পরে আসছি।

ইলেকট্রন, প্রোটন প্রভৃতি যে সব কণার কথা আমি বলেছি, সেগুলো ছাড়াও যে পদার্থের অন্যান্য কণা আছে, তিরিশের দশকের মাঝামাঝি থেকে তা বোঝা যাচ্ছিল। মহাকাশ থেকে আগত মহাজাগতিক রশ্মির বিশ্লেষণ, কণা ত্বরক যন্ত্রে প্রচণ্ড গতিশীল কণাগুচ্ছ সম্পর্কিত পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং তাত্ত্বিক গবেষণা থেকে কালক্রমে বহু নতুন কণার সন্ধান পাওয়া গেল। একটি বিশেষ ধর্ম অনুযায়ী এই সব কণাকে মূলত দু'টি শ্রেণীতে ভাগ করা হল।

সেই বিশেষ ধর্মটি কী ? — চাকু মামার জ্ঞানের পরীক্ষা নেওয়ার সুযোগ হাতছাড়া করতে চায় না।

জ্ঞানাঙ্কুর ঃ তুমি তো জানো, চাকু, পরমাণুর নিউক্লিয়াসের মধ্যে একাধিক প্রোটন ও নিউট্রন একসঙ্গে থাকতে পারে। এগুলি একসঙ্গে থাকে কেন ? বিশেষত, সব প্রোটনই ধনাত্মক আধানযুক্ত হওয়ায় তাদের মধ্যে বৈদ্যুতিক বিকর্ষণ রয়েছে, তাহলে তারা একসঙ্গে থাকে কিভাবে ?

চাকুকে নিরুত্তর দেখে চিনি বোঝে, দাদা মামার প্রশ্নের প্যাঁচে পড়ে গেছে। মনে মনে উৎফুল্ল হলেও ভাল মানুষের মতন মুখ করে বলে, কিরে দাদা, জানিস নাকি ?

যা হোক, মৌলিক কণাগুলির শ্রেণী বিভাগ প্রসঙ্গে আমি যে বিশেষ ধর্মের কথা বলেছিলাম, তা হল এই সতেজ বলে সাড়া দেওয়ার ধর্ম। ইলেকট্রন, মিউয়ন ও নিউট্রিনোর মতন যে সব কণা এই বলে সাড়া দেয় না অর্থাৎ যাদের উপর এই বল কার্যকর হয় না, তারা হল প্রথম শ্রেণীভুক্ত, তাদের বলা হয় লেপ্টন। এগুলির ভর কম বলে 'হাল্কা' শব্দটির গ্রীক প্রতিশব্দ অনুযায়ী এই নামকরণ। অবশ্য অপেক্ষাকৃত সাম্প্রতিক কালে টাওয়ন নামে যে কণা আবিষ্কৃত হয়েছে, তার ভর প্রোটনের ভরেরও প্রায় দু'গুণ কিন্তু প্রকৃতিতে তা ইলেকট্রনের মতন এবং তা সতেজ বলে সাড়া দেয় না। সেজন্যে একে লেপ্টন শ্রেণীভুক্ত করা হয়েছে।

যে সব কণা সতেজ বলে সাড়া দেয়, তারা দ্বিতীয় শ্রেণীর অন্তর্গত। এদের বলা হয় হেড্রন। 'স্থূল' বা 'পুরু' শব্দের গ্রীক প্রতিশব্দ অনুসারে এই নাম দেওয়া হয়েছে। হেড্রন কণাগুলিকে আবার দু'টি উপশ্রেণীতে ভাগ করা হয় ঃ— বেরিয়ন ও মেসন। হেড্রনদের মধ্যে যারা অপেক্ষাকৃত ভারী, তাদের বলে বেরিয়ন ; যেমন প্রোটন, নিউট্রন ও তাদের চেয়েও ভারী কণা ল্যাম্ডা-হাইপেরন, জাই-হাইপেরন ইত্যাদি। আর যারা মাঝামাঝি ভরের, তাদের বলে মেসন ; যেমন পায়ন, কেয়ন প্রভৃতি।

আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসু

চাকু : মামু, তুমি মৌলিক কণাদের এরকম শ্রেণী বিভাগের কথা বলছো বটে কিন্তু বিজ্ঞানাচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসুর জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে প্রকাশিত একটা প্রবন্ধে পড়েছি যে, বিশ্বের তাবৎ মৌলিক কণাকে যে দু'টি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়, তাদের বলা হয় বোসন ও ফের্মিয়ন। সত্যেন্দ্রনাথ বসু ওরফে সত্যেন বোসের নামে বোসন আর এন্‌রিকো ফের্মির নামে ফের্মিয়ন।

জ্ঞানাঙ্কুর চাকুর পিঠ চাপড়ে দিয়ে বললো, বাঃ, তুমি যে মন দিয়ে এ সব প্রবন্ধ পড়ো, সেটা খুব সুখের কথা। তুমি যে রকম বললে, সে ভাবেও মৌলিক কণাদের শ্রেণীবিভাগ করা হয় অর্থাৎ এটা আর এক ধরনের শ্রেণীবিভাগ। কণাগুলির যে ধর্মের ওপর ভিত্তি করে এটা করা হয়, তাকে বলে স্পিন বা ঘূর্ণন। সহজ ভাবে বলতে গেলে মৌলিক কণা লাট্টুর মতন নিজের অক্ষের চারধারে ঘোরে বলে তার একটা কৌণিক ভরবেগ আছে। এটাই হল স্পিন। নির্দিষ্ট এককে যে সব কণার স্পিনের মান শূন্য বা কোন পূর্ণসংখ্যা, তাদের বলা হয় বোসন কারণ তারা বোস সংখ্যায়ন মেনে চলে।

চিনি : বোস সংখ্যায়ন মেনে চলা বলতে কী বোঝায় ? একটি খোলসা করে বলো, মামু !

জ্ঞানাঙ্কুর : তুমি বোধহয় জানো, চিনি, কোন গোষ্ঠীতে যদি বহু মানুষ থাকে, তাদের প্রত্যেকের সম্বন্ধে আলাদা করে না জেনেও সমষ্টিগত তথ্যাদির ভিত্তিতে statistics বা সংখ্যায়নের সাহায্যে গোষ্ঠীটির আচার-আচরণ সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল হওয়া যায়। তেমনি কণাসমষ্টির আচার-আচরণও সংখ্যায়নের সাহায্যে বুঝতে পারা সম্ভব। এখন, কোয়ান্টাম তত্ত্ব থেকে আমরা জানি, আলো, এক্স্-রশ্মি প্রভৃতি বিকিরণের তরঙ্গরূপ ছাড়াও কণারূপ আছে অর্থাৎ বিকিরণকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণার সমষ্টি হিসেবে ভাবা যেতে পারে। ব্যাখ্যা করবার জন্যে সত্যেন্দ্রনাথ ১৯২৪ সালে এক নতুন সংখ্যায়ন রচনা করেছিলেন। আদর্শ গ্যাসের কণা সমূহের জন্যে একে সম্প্রসারিত করেন অ্যালবার্ট আইনস্টাইন। এই সংখ্যায়নকেই বলা হয় বোস সংখ্যায়ন। যে সব কণার ক্ষেত্রে এই সংখ্যায়ন প্রযোজ্য হয়, তারাই হল বোসন।

চাকু আগেকার কথার জের টেনে জিগ্যেস করে, ফের্মিয়ন বলা হয় কোন্ কণাদের, মামু ?

জ্ঞানাঙ্কুর : বোসন প্রসঙ্গে স্পিনের যে নির্দিষ্ট এককের উল্লেখ করেছি, সেই এককে যে সব কণার স্পিন অর্ধ-পূর্ণসংখ্যা, যেমন $\frac{১}{২}$, $\frac{৩}{২}$ ইত্যাদি, তাদের বলা হয় ফের্মিয়ন। তাদের ক্ষেত্রে যে সংখ্যায়ন প্রযোজ্য হয়, তা প্রণয়ন করেছিলেন এন্‌রিকো ফের্মি ও তাকে বিস্তৃত করেন পল ডিরাক। একে বলে ফের্মি সংখ্যায়ন।

আমি যে লেপ্টন, বেরিয়ন ও মেসনের কথা একটু আগে বললাম, তাদের মধ্যে লেপ্টন ও বেরিয়ন কণাগুলি হচ্ছে ফের্মিয়ন, আর মেসন কণাগুলি হল বোসন।

চাকু : তুমি যে ফোটনের কথা বললে, তা তো বোস সংখ্যায়ন মেনে চলে, তবে তা অবশ্যই বোসন। তাহলে তা কি মেসন গোষ্ঠী ভুক্ত ?

জ্ঞানাঙ্কুর : না, তা নয়, কারণ সব মেসনই বোসন হলেও সব বোসনই মেসন নয়। ফোটনের স্পিনের মান ১ অর্থাৎ পূর্ণসংখ্যা হওয়ায় তা বোসন কিন্তু তার ভর হল শূন্য। বস্তুত ফোটন যে কণাগোষ্ঠীর অন্তর্গত, তার কণাগুলিকে দূত-কণা বলা যেতে পারে। বিভিন্ন কণার মধ্যে আকর্ষণ-বিকর্ষণের ক্ষেত্রে এগুলি দূত হিসেবে কাজ করে। দু'টি বিদ্যুৎআহিত কণার মধ্যে ফোটনের আদান-প্রদানের মাধ্যমেই বিদ্যুৎচুম্বকীয় বল কার্যকর হয়। আমি তো আগে সতেজ বলের উল্লেখ করেছি, তেমনি আবার weak force বা ক্ষীণ বল নামেও একরকম বল আছে। পদার্থের তেজস্ক্রিয়তার মূলে কার্যকর বল হচ্ছে ক্ষীণ বলের একটি দৃষ্টান্ত। এই বলের ক্ষেত্রে দূত হিসেবে কাজ করে W^+, W^- ও Z কণা। এগুলির ভর যথেষ্ট বেশি হওয়ায় কোয়ান্টাম বলবিদ্যা অনুযায়ী এদের প্রভাব সামান্য দূরত্বের মধ্যে

সীমিত। সতেজ বলের দূতের বিষয় পরে বলবো। অন্য আর এক রকম যে বল আছে — মহাকর্ষ বল, যার কথা তোমরা নিশ্চয় জানো, সেই বলের ক্ষেত্রে গ্র্যাভিটন নামক ভরহীন কণা দূত হিসেবে কাজ করে বলে বিজ্ঞানীরা মনে করেন তবে এই কণার অস্তিত্ব পরীক্ষায় এখনো অভ্রান্ত ভাবে প্রমাণিত হয় নি। মনে রেখো, সব দূত-কণাই হল বোসন।

ইতিমধ্যে চিনির ধৈর্যের বাঁধ ভেঙ্গে যাওয়ার উপক্রম হয়। সে বলে, মামু, যে কোয়ার্কের কথা দিয়ে আলোচনা শুরু করেছিলে, সে বিষয়ে কিন্তু এখনো কিছু বলো নি।

জ্ঞানাঙ্কুর ঃ চাকুর খোঁচায় অন্য নানান কথা যে বেরিয়ে এল ! তাছাড়া, এ সব জানলে কোয়ার্কের ব্যাপার-স্যাপার বুঝতে সুবিধে হয়।

বর্তমান শতাব্দীর মাঝামাঝি যে বহু হেড্রন কণার সন্ধান পাওয়া গেছলো, সেগুলোকে কোন-না-কোন ছকে সাজাবার চেষ্টা থেকেই কোয়ার্কের ধারণার সূত্রপাত। ডিমিট্রি মেন্ডেলীফ বিভিন্ন মৌলিক পদার্থকে যখন পর্যায় সারণীতে সাজিয়েছিলেন, তখন সেই সারণীতে যে কয়েকটি ঘর ফাঁকা ছিল, রাসায়নিক ধর্মের ভিত্তিতে সেই সব ঘরের উপযোগী পদার্থ সম্বন্ধে মেন্ডেলীফ সঠিক ভবিষ্যদ্বানী করেছিলেন — এ সব কথা তোমরা নিশ্চয় পড়েছ। অনেকটা একইভাবে ষাটের দশকের গোড়ার দিকে বিভিন্ন মৌলিক কণাকে eightfold way বা অষ্টাঙ্গিক মার্গ নামক একটি ছকে সাজিয়ে মারে গেল-মান একটা ফাঁকা ঘরের উপযোগী কণার অস্তিত্ব সম্বন্ধে যে ভবিষ্যদ্বানী করেন, শক্তিশালী কণা-ত্বরক যন্ত্রের পরীক্ষায় ওমেগা-মাইনাস নামক কণার আবিষ্কারে সেই ভবিষ্যদ্বানী সঠিক বলে প্রমাণিত হল। এই থেকে এ ধারণা দৃঢ় হল যে, প্রত্যেক মৌলের পরমাণুতে যেমন ইলেকট্রন, প্রোটন ও নিউট্রন রয়েছে এবং এই তিনটি কণার বিভিন্ন সমবায়ে যেমন বিভিন্ন মৌলের পরমাণু গঠিত হয়, তেমনি প্রত্যেক হেড্রনের মধ্যে কয়েক ধরনের ক্ষুদ্রতর কণা রয়েছে এবং সেই মৌলিক কণাগুলির বিভিন্ন সমবায়ে বিভিন্ন হেড্রন উৎপন্ন হয়ে থাকে। এই ক্ষুদ্রতর কণার নাম দেওয়া হল কোয়ার্ক। যে তিন রকম কোয়ার্কের কথা প্রথমে জানা গেল, তাদের পার্থক্য যে ধর্মের জন্যে, সেই ধর্মের নাম flavour বা স্বাদ।

চাকু ঃ চিনির মতন স্বাদ আছে নাকি কোনটার ?

জ্ঞানাঙ্কুর ঃ সত্যিকারের স্বাদের সঙ্গে এই ধর্মের কোন সম্পর্ক নেই। বিজ্ঞানীরা কল্পনাপ্রবণ হয়ে মাঝে মাঝে এরকম নামকরণ করেন। তিন ধরনের স্বাদকে বলা হয় আপ, ডাউন ও স্ট্রেন্জ্। ১৯৭৪ সাল পর্যন্ত যত হেড্রনের সন্ধান পাওয়া গেছিল, সেগুলোকে এই তিনটি স্বাদের কোয়ার্কের সমন্বয় হিসেবে চিহ্নিত করা সম্ভব হয়েছিল। পরবর্তীকালে আরো তিন স্বাদের কোয়ার্ক আবিষ্কৃত হয়েছে। স্বাদগুলির নাম ঃ চার্ম, বটম (বা বিউটি) ও টপ (বা ট্রুথ)। সুতরাং মোট ছ' রকম স্বাদের কোয়ার্ক রয়েছে। প্রত্যেক স্বাদের কোয়ার্কেরই আবার বিপরীত কোয়ার্ক আছে — বিপরীত কণার বিষয় তো তোমাদের আগেই বলেছি।

প্রত্যেক কোয়ার্কই বিদ্যুতাহিত কণা। মজার ব্যাপার হল – যা আগে কখনো ভাবা যায় নি – এই কণার আধান ইলেট্রনের আধানের ভগ্নাংশ। ইলেকট্রনের আধান -১ ধরলে আপ, চার্ম ও টপ কোয়ার্কের আধান হল $\frac{২}{৩}$ এবং ডাউন, স্ট্রেন্জ্ ও বটম কোয়ার্কের আধান হল $-\frac{১}{৩}$ । প্রত্যেক কোয়ার্কের স্পিনের মান হচ্ছে $\frac{১}{২}$ । সুতরাং বুঝতে পারছো, কোয়ার্ক হল ফের্মিয়ন।

চিনি তার পূর্ব-পরিচিত দু'টি বেরিয়ন কণা সম্পর্কেই বেশি আগ্রহী। সে জিগ্যেস করে, প্রোটন আর নিউট্রন কোন্ কোন্ স্বাদের কোয়ার্ক দিয়ে তৈরি ?

জ্ঞানাঙ্কুর ঃ প্রোটন, নিউট্রন ও অন্য প্রত্যেকটি বেরিয়নই তিন রকম কোয়ার্ক দিয়ে গঠিত। প্রোটনে রয়েছে দু'টি আপ কোয়ার্ক ও একটি ডাউন কোয়ার্ক। প্রোটনের বৈদ্যুতিক আধান এজন্যে $\frac{২}{৩} + \frac{২}{৩} - \frac{১}{৩} = ১$ । নিউট্রনে আছে একটি আপ কোয়ার্ক ও দু'টি ডাউন কোয়ার্ক। সুতরাং নিউট্রনের আধান $\frac{২}{৩} - \frac{১}{৩} - \frac{১}{৩} = ০$ । প্রত্যেক কোয়ার্কের স্পিন $\frac{১}{২}$ হওয়ায় প্রত্যেক বেরিয়নের মোট স্পিন এমন হয় যে, কোয়ার্কের মতন তাও ফের্মিয়ন হিসেবে গণ্য হয়ে থাকে।

হেড্রনের অন্য উপশ্রেণীর যে মেসন কণাগুলি, সেগুলির প্রত্যেকটি গঠিত হয় একটি কোয়ার্ক ও একটি

বিপরীত কোয়ার্ক দিয়ে। মেসন মাত্রই অস্থায়ী। মেসনের মোট স্পিন এমন হয় যে, তা বোসন হিসেবে চিহ্নিত হয়ে থাকে।

চাকু ঃ হেড্রনের মধ্যে একাধিক কোয়ার্ক একসঙ্গে থাকে কেন ? তুমি তো, মামু, নানান বলের কথা বলেছ, এটা কোন্ বলের জন্যে হয় ?

জ্ঞানাঙ্কুর ঃ যে সতেজ বলের আমি উল্লেখ করেছি, তাই এর জন্যে দায়ী এবং তা কোয়ার্কেরই একটি ধর্মের অভিব্যক্তি। এই ধর্মের নাম দেওয়া হয়েছে colour বা বর্ণ। বর্ণ তিন রকম হতে পারে।

চিনি ঃ স্বাদের মতন বর্ণ শব্দটাও কি এক্ষেত্রে বিজ্ঞানীদের কল্পনাবিলাস ?

জ্ঞানাঙ্কুর ঃ ঠিক বলেছ, চিনি। বিজ্ঞানীরা তাঁদের কল্পনাকে আরো বিস্তৃত করে তিন রকম বর্ণের নাম দিয়েছেন ঃ লাল, নীল ও সবুজ। একই বর্ণের কোয়ার্ক পরস্পরকে বিকর্ষণ করে, আর ভিন্ন বর্ণের কোয়ার্ক সাধারণত পরস্পরকে আকর্ষণ করে। প্রোটন, নিউট্রন বা যে-কোন বেরিয়নের মধ্যে যে তিনটি কোয়ার্ক থাকে, তারা বিভিন্ন বর্ণের হয় বলে তাদের মধ্যে যে আকর্ষণ বল কাজ করে, তাই কোয়ার্কগুলিকে একত্র ধরে রাখে। তোমরা নিশ্চয় জানো, বৈদ্যুতিক বা মহাকর্ষীয় বলের ক্ষেত্রে দু'টি বস্তুর মধ্যে কার্যকর বল দূরত্বের সঙ্গে কমে যায়। দু'টি কোয়ার্কের মধ্যে বর্ণজনিত বলের ক্ষেত্রে কিন্তু সেই আকর্ষণ বল দূরত্বের সঙ্গে বেড়ে যায়। এই বলের প্রকৃতি বোঝবার জন্যে ভাবা যেতে পারে যে, একটি অদৃশ্য স্প্রিং এর দুই প্রান্তে দু'টি কোয়ার্ক আটকানো আছে ; ঐ দুই কণা পরস্পর থেকে যত দূরে সরে যায়, স্প্রিং তত লম্বা হয় এবং কণা দু'টির মধ্যে আকর্ষণ তত বাড়তে থাকে। এজন্যে প্রোটন, নিউট্রন ইত্যাদি কণার ভিতরের কোয়ার্কগুলি পরস্পর থেকে বেশি দূরে যেতে পারে না এবং বিজ্ঞানীরা মনে করেন, সেগুলি ঐ সব কণার মধ্যে চিরতরে বন্দী হয়ে থাকে। প্রকৃতিতে মুক্ত অবস্থায় কোয়ার্ককে পাওয়া যায় না।

প্রোটন বা নিউট্রনের মধ্যে তিনটি বর্ণেরই কোয়ার্ক থাকায় ঐ কণা সামগ্রিক ভাবে বর্ণহীন হয়ে থাকে। সেজন্যে ঐ রকম দু'টি কণা পরস্পর থেকে দূরে থাকলে বর্ণজনিত বল কার্যকর হয় না। কিন্তু তারা পরস্পরের খুব কাছে এলে একটির ভিতরের কোয়ার্কগুলির প্রভাব স্বতন্ত্র ভাবে অন্যটির কোয়ার্কগুলির উপর পড়ে ; মোট ফল হয় এই যে, কণা দু'টির মধ্যে একটি সতেজ বল কার্যকর হয়।

চিনির স্মৃতিশক্তি প্রখর। সে বলে, দূত-কণার বিষয়ে আলোচনা করবার সময় তুমি বলেছিল, সতেজ বলের ক্ষেত্রে দূতের কথা তুমি পরে বলবে। সেটা কিন্তু এখনো বলো নি।

জ্ঞানাঙ্কুর ঃ তুমি যে আমার আলোচনা মন দিয়ে শুনছো, এতে আমি খুব খুশি। তোমাদের বলেছি যে, কোয়ার্কের বর্ণজনিত বলই সতেজ বল হিসেবে প্রকাশ পায়। এই বলের ক্ষেত্রে দূত-কণাকে বলে গ্লুয়ন। অন্য সব দূত-কণার মতন এটাও বোসন। কোয়ার্ক তিন বর্ণের হতে পারে বলে একই বর্ণের বা বিভিন্ন বর্ণের কোয়ার্কের মধ্যে আকর্ষণ-বিকর্ষণে নানারকম গ্লুয়ন কাজ করে। কোয়ার্কের মতন গ্লুয়নেরও বর্ণ আছে। গ্লুয়ন মোট আট রকম হতে পারে।

চাকু ঃ কোয়ার্ক যখন তিন বর্ণের, বিপরীত কোয়ার্কও কি তাহলে তিন বর্ণের হতে পারে ?

জ্ঞানাঙ্কুর ঃ ঠিকই আন্দাজ করেছ, চাকু, প্রত্যেক বর্ণের কোয়ার্কেরই আলাদা আলাদা বিপরীত কণা আছে। কোন কোয়ার্কের বর্ণকে ধনাত্মক ধরলে তার বিপরীত কণার বর্ণ হয় ঋণাত্মক ; যেমন, কোন কোয়ার্ক যদি হয় ধনাত্মক লাল, তবে তার বিপরীত কোয়ার্ক হয় ঋণাত্মক লাল এবং এই বিপরীত ধর্মের জন্যে তাদের মধ্যে আকর্ষণ বল কাজ করে।

কোয়ার্কের বিষয়ে আর একটা কথা বলেই তোমাদের ছুটি দেব। কোয়ার্ক সম্বন্ধে যে সব তথ্য পাওয়া গেছে, তা কেবল তত্ত্ব থেকে নয়, এগুলির অনেক কিছুই সুইৎজারল্যাণ্ডে CERN ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ফের্মিল্যাব গবেষণাগারে প্রচণ্ড শক্তিশালী কণা-ত্বরক যন্ত্রের পরীক্ষায় সমর্থিতও হয়েছে।

বলা বাহুল্য, অনেক জ্ঞানগর্ভ কথা শুনতে শুনতে চাকু ও চিনির মগজের এখন একটু বিশ্রাম দরকার। ছুটির আনন্দে তারা হাত ধরাধরি করে উঠে দাঁড়াল।

বিপ্লবীরা যেখানে হার মেনেছেন

অপরাজিত বসু

"সময় চলিয়া যায় নদীর স্রোতের ন্যায়" বলে কবি কল্পনা করলেও প্রকৃত অর্থে, অর্থাৎ বিজ্ঞানীর দৃষ্টিতে সময় কোথাও যায় না। সত্যি বলতে কি, সময় নামে কোন কিছুর অস্তিত্ব অর্থহীন হয়ে যায় যদি না অন্তত দুটি ঘটনা ঘটে। দুটি ঘটনার অন্তর্বর্তী কালের নাম সময়। ঐ কাল বা সময়কে দিন, ঘণ্টা, সেকেণ্ড যা দিয়েই মাপি না কেন, সময়কে এভাবে বোঝা যায় না। সময়কে পরিমাপ করতে পারলেও তার প্রকৃতি অজানা থেকে যায়।

সময়কে মাপার জন্য যে ক্ষুদ্রতম একক সাধারণভাবে ব্যবহার করা হয় তার নাম 'সেকেণ্ড'। দৈর্ঘ, ওজন, বল ইত্যাদির একক দেশে দেশে নানাভাবে প্রচলিত ছিল এবং এখনও কিছুটা আছে। ফরাসী বিপ্লবের অন্যতম অভিঘাত ছিল এই একক পরিবর্তনের দিকে। সেসময় ও দেশে 'শতকের' হিসাবে নতুন একক গড়ে ওঠে যার নাম 'মেট্রিক সিস্টেম'। এখন পৃথিবীর বেশির ভাগ দেশ মেট্রিক সিস্টেম ব্যবহার করে। কিন্তু সময়ের কাছে বিপ্লবীরাও হার মেনেছেন, তাঁরা ঘণ্টা, মিনিট, সেকেণ্ডকে শতকের হিসাবে আনতে পারেননি, পুরানো ষষ্টি হিসাবকে মেনে চলেছেন। সেই ট্রাডিশন এখনও চলছে। সেকেণ্ডের আগে মিলি–, সেণ্টি–, ডেসি–, বসিয়ে মেট্রিক পদ্ধতি আনার কিছুটা ব্যবস্থা হলেও মিনিট, ঘণ্টা, দিন নামের এককগুলি এখনও সমান দাপটে চলছে, আর কে না জানে সেকেণ্ডের সঙ্গে মিনিট, ঘণ্টা কখনই শতকের বন্ধনে বন্দী নয়।

দৈর্ঘ, ওজন বল ইত্যাদির এককগুলি যেমন মিটার, কিলোগ্রাম, নিউটন, তেমনি সময়ের একক সেকেণ্ড। দৈর্ঘ ইত্যাদির এককের পরিমাণ নির্দিষ্ট করা আছে, অর্থাৎ এগুলি স্টাণ্ডারাইজড। ফরাসী বিজ্ঞান অ্যাকাডেমি একটি প্লাটিনাম-ইরিডিয়াম সংকর ধাতুর রডের উপরে আঁকা দুটি বিন্দুর দূরত্বকে এক মিটার নামে অভিহিত করেন। উষ্ণতাভেদে এই রডের বৃদ্ধি যৎসমান্য। প্যারিসের অদূরে একটি সরকারী সংগ্রহশালায় এটি রক্ষিত আছে। পরে এক মিটার দৈর্ঘকে আরও সুসংহতভাবে নির্দিষ্ট করা হয়। ক্রিপটন-৮৬ গ্যাস থেকে যে কমলা-লাল আলো বিচ্ছুরিত হয় তার তরঙ্গ দৈর্ঘের ১৬৫০৭৬৩.৭৩ গুণ পরিমাণ দৈর্ঘকে এক মিটার বলা হয়। বিজ্ঞানীরা একই রকমভাবে ওজন (কিলোগ্রাম) ও অন্যান্য পরিমাপের এককের সংজ্ঞা তৈরি করেছেন।

এখন প্রশ্ন হল, সময়ের এককের বেলায় শতক পদ্ধতি চালু হল না কেন এবং "এক সেকেণ্ড" সময়কেই বা কিভাবে সংজ্ঞায়িত করা হয় ? সাধারণভাবে জানি, এক দিনকে চব্বিশ খণ্ড করলে পাওয়া যায় এক ঘণ্টা, আর এক ঘণ্টাকে ষাট ভাগ করলে পাওয়া যায় এক মিনিট এবং এক মিনিটের ষাট ভাগের এক ভাগ পরিমাণ এক সেকেণ্ড। আধুনিক বিজ্ঞান অবশ্য এক সেকেণ্ড কালকে অন্যভাবে সংজ্ঞায়িত করেছে। সিজিয়াম ধাতুর কেলাসের ভিতর সিজিয়াম পরমাণু আন্দোলিত হয়, ঘড়ির পেণ্ডুলামের মতো সেই স্পন্দন দিন নেই, রাত নেই — চলছে তো চলেছেই। বিজ্ঞানীরা বলছেন, ঐ পরমাণুর ৯১৯২৬৩১৭৭০ বার স্পন্দন হতে সময় লাগে এক সেকেণ্ড — আর এভাবেই তাঁরা এক সেকেণ্ড মাপের নির্দিষ্টতা করেছেন। দেখেই বোঝা যাচ্ছে, সেকেণ্ডের বৈজ্ঞানিক সংজ্ঞা এক রকমের 'পিছন থেকে গোণা', যাকে back calculation বলে। এতে সেকেণ্ড, মিনিট, ঘণ্টার উৎপত্তি সম্পর্কে যেমন বোঝা

গেল না, তেমনি কেনই বা সময়ের এককে শতক পদ্ধতিতে রূপান্তর করা গেল না তাও বোধগম্য হল না।

দুটি ঘটনার অন্তর্বর্তী কালের নাম যে সময় তা মানুষ অনেক আগে থেকেই বুঝেছিল। প্রাগৈতিহাসিক মানুষ চাষবাস, দৈনন্দিন জীবনযাত্রা – সব কিছুতেই সময় মাপার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে। তখনকার দিনে তো ঘড়ি ছিল না, তাই মানুষ সময় মাপতো প্রাকৃতিক ঘটনাগুলিকে অনুসরণ করে। কি কি প্রাকৃতিক ঘটনা তার সামনে ছিল ? কোন্ কোন্ প্রাকৃতিক ঘটনাগুলি নির্দিষ্ট সময় অন্তর অন্তর ঘটে যায় ? ঋতুগুলি এক বছর সময় কাল পরে ফিরে আসে, আকাশে পূর্ণচন্দ্র এক মাস সময় পর পর ফিরে আসে, এক সূর্যোদয় থেকে আর এক সূর্যোদয়ের মাঝের সময়ের মাপ চব্বিশ ঘণ্টা, হাতের কব্জিতে হৃদস্পন্দনের প্রতিফলন ঘটে সময়ের তালে তালে, কোন গাছের পাতায় ফুল ফল ভরে আসে একটি নির্দিষ্ট ঋতুতে। প্রাকৃতিক ঘটনাগুলি পুনরাবৃত্তির মাঝের সময়কাল সব সময় নির্দিষ্ট — কখনও তা একবছর, কখনও এক মাস, কখনও একদিন। নির্দিষ্ট সময়ের তালে তালে কোন ঘটনার পুনরাগমনের অপর নাম চক্রাকারে প্রত্যাবর্তন। ঋতু, দিন-রাত–সবই চক্রাকারে ফিরে ফিরে আসে। চক্রাকার বলা হচ্ছে কেন ? একটি গোল চক্রের অর্থাৎ বৃত্তের পরিধি বরাবর কোন বস্তুর সঞ্চার সব সময় বস্তুকে নির্দিষ্ট কাল অন্তর পরিধির একটা নির্দিষ্ট জায়গায় ফিরিয়ে আনে। যেমন ঘড়ির মিনিটের কাঁটা এক ঘণ্টা পর পর একটা নির্দিষ্ট স্থানে আসে, সেকেন্ডের কাঁটা এক মিনিট অন্তর অন্তর একটি

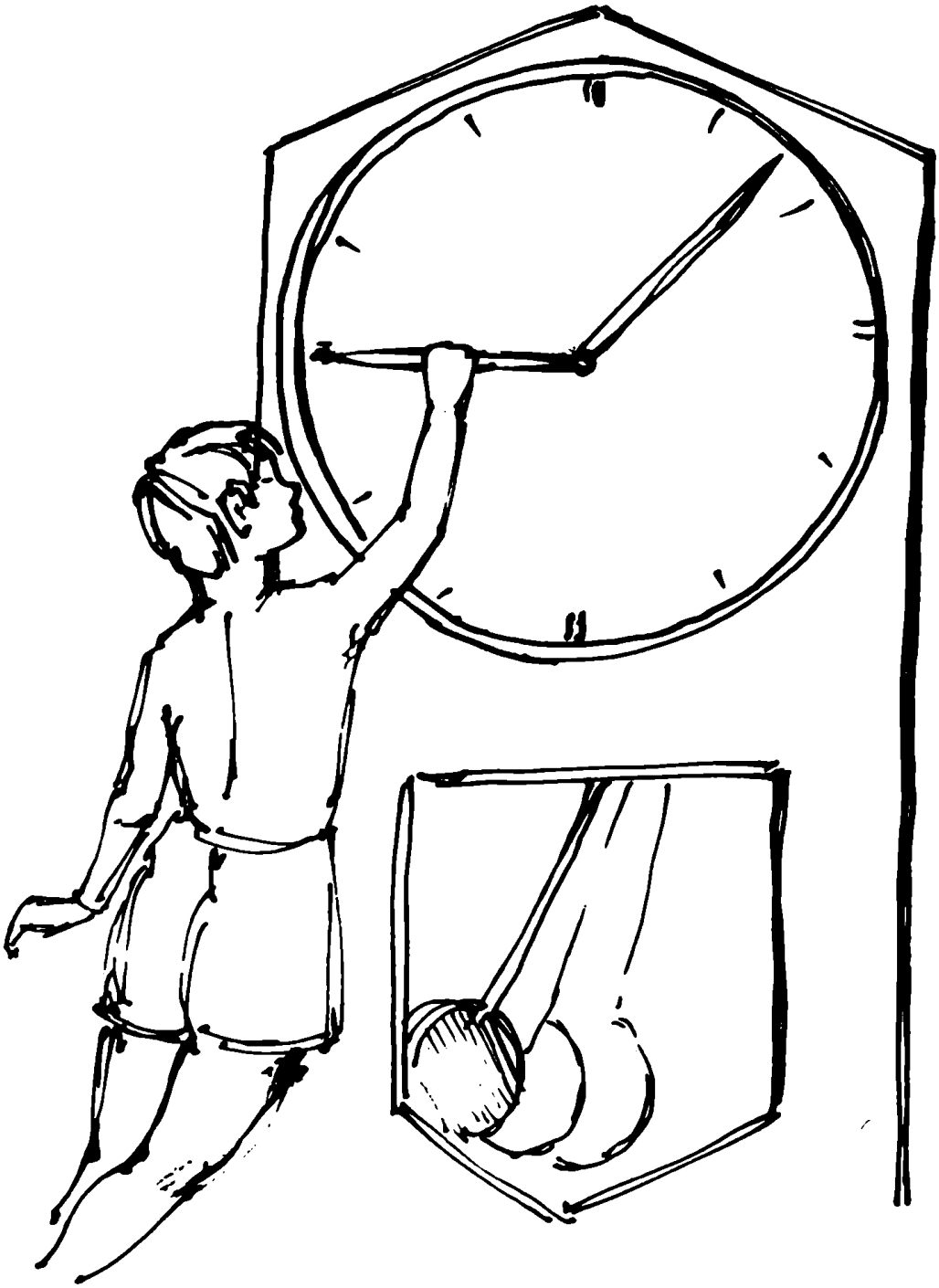

নির্দিষ্ট স্থানে আসে। পেণ্ডুলামের দোলন, দোলনার দোলন, ঘড়ির কাঁটার আবর্তন — সবই প্রকৃতিতে অভিন্ন। এদের এক কথায় বলা হয় 'সরল দোলক গতি', যা প্রকৃতিতে চক্রাকার।

চক্রাকারে গতিশীল বস্তু চক্রের কেন্দ্রে প্রতি ঘূর্ণনে ৩৬০° উৎপন্ন করে। এই ৩৬০° কোণের সঙ্গে সময়ের একক জড়িয়ে আছে। ৩৬০ যেহেতু শতকের গুণিতক নয়, বরং ৬০'র গুণিতক তাই সময়ের এককে ফরাসী বিপ্লবীরা শতক পদ্ধতিতে জুড়তে ব্যর্থ হয়ে পুরানো ষষ্টি পদ্ধতিকে বজায় রাখেন। এজন্য ৬০ সেকেণ্ডে এক মিনিট, ৬০ মিনিটে এক ঘণ্টা। কিন্তু একটা জায়গায় ঠোক্কর খেতে হয়। ২৪ ঘণ্টায় এক দিন কেন? (৭ দিনে এক সপ্তাহকে উল্লেখ করছি না, কারণ 'সপ্তাহ' কোন প্রাকৃতিক ঘটনাকে অনুসরণ করে তৈরি হয়নি)। ৩০ দিনে (অথবা ৬০ ÷ ২) এক মাস তবু গ্রাহ্য, কারণ এক পূর্ণিমা থেকে আর এক পূর্ণিমার সময়ের ব্যবধান প্রায় ৩০ দিন। ১২ মাসে (অথবা ৬০ ÷ ৫) এক বছর মানা যায়। ৩৬৫ দিনে (যা প্রায় ৩৬০'র কাছাকাছি) মানুষের তৈরি করা কোন হিসাব নয়, প্রকৃতিই এটা ঠিক করে দিয়েছে — প্রায় ৩৬০। লক্ষ্য করার ব্যাপার, অন্য গ্রহদের বেলায় এ নিয়ম খাটে না, তাদের দিনের মাপের ৩৬০ গুণ বছরের মাপ নয়।

তাহলে দেখা যাচ্ছে যে আমরা সব সময় ষষ্টি পদ্ধতিও অনুসরণ করিনি। দেশে দেশে এই ব্যতিক্রমের মাত্রার বিভিন্নতা আছে।

আমাদের দেশের কথাই আলোচনা করা যাক। প্রাচীন কালে 'প্রহর' গণনা করা হত। এক দিনকে বলা হত 'অষ্টপ্রহর'। অর্থাৎ প্রতি তিন ঘণ্টায় হত এক প্রহর। প্রহরের আর এক নাম — যাম। আরও একটা পদ্ধতি ছিল। প্রতি দিনকে ভারতীয় জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা সমান ৬০ ভাগে ভাগ করতেন এবং প্রতি ভাগের তাঁরা নাম দিয়েছিলেন 'ঘটিকা' বা 'দণ্ড'। অর্থাৎ ২৪ মিনিট সময়কালকে এক ঘটিকা বা এক দণ্ড বলা হয়। প্রতিটা ঘটিকার ৬০ ভাগের এক ভাগ সময়কে 'বিঘটিকা' বা এক 'পল' বলা হত, অর্থাৎ ২৪ সেকেণ্ড সময়কালকে এক বিঘটিকা বা এক পল বলা হত। আবার, এক বিঘটিকা বা পলের ৬০ ভাগের একভাগ সময়কে বলা হত এক 'বিপল', যার মাপ ছিল ০.৪ সেকেণ্ড।

দিনকে ২৪ ঘণ্টায় ভাগ করার থেকে ৬০ ভাগে ভাগ করা অনেক বেশি যুক্তিসঙ্গত। ৩৬০ যেহেতু ৬০ এর গণিতক তাই যুক্তিটা জোরালো। সেক্ষেত্রে ২৪ এর আবির্ভাবের পিছনে কোন সাধারণ যুক্তি নেই।

সময়ের একক 'সেকেণ্ড' বা 'বিপল' যাই হোক না কেন তাকে ক্ষুদ্রতম সময় ভাবার কোন সুযোগ নেই। এক সেকেণ্ড বা ০.৪ সেকেণ্ড সময়ের বিচারে তত ছোট নয়। পরমাণুর কম্পন, টিউনিং ফর্কের কাঁপুনি, এসবই এক সেকেণ্ডের অনেক অনেক কম সময়ের মধ্যে ঘটে থাকে। পরমাণুর কম্পনের থেকে ছোট সময়ের কম্পাঙ্ক এই দুনিয়ায় পাওয়া যায়। কম্পাঙ্ক কাকে বলবো? এক সেকেণ্ড সময়কালে স্পন্দনের সংখ্যাকে বলে কম্পাঙ্ক। সিজিয়াম ধাতুর ভিতরকার পরমাণু এক সেকেণ্ডে ৯১৯২৬৩১৭৭০ বার স্পন্দিত হয়, তাই এই সংখ্যা হল ওর কম্পাঙ্ক। এর মানে সিজিয়াম ধাতুর পরমাণু একবার স্পন্দিত হতে ১ ÷ ৯১৯২৬৩১৭৭০ সেকেণ্ড বা $১০^{-১০}$ (প্রায়) সেকেণ্ড লাগে। ভাবা যায় কি দ্রুত পরমাণুগুলি স্পন্দিত হচ্ছে?

দ্রুততার এটাই শেষ হিসাব নয়। একটা হাইড্রোজেন পরমাণুর কেন্দ্রকে ইলেকট্রন আবর্তন করছে মাত্র $১০^{-১৬}$ সেকেণ্ডে। গামা রশ্মি নির্গমকারী পদার্থ একবার কাঁপছে মাত্র $১০^{-২২}$ সেকেণ্ডে। কি ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র সময়। আশ্চর্য এত ছোট সময়কে মাপার জন্যও সেকেণ্ড ব্যবহৃত হচ্ছে, আরও ক্ষুদ্র একক আবিষ্কৃত হয় নি।

বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে সময়ের যেমন ছোট মাপ আছে, তেমনি বড় মাপও আছে। একজন মানুষ বাঁচে $১০^{১০}$ সেকেণ্ড, ডাইনোসররা বেঁচে ছিল $১০^{১৬}$ সেকেণ্ড আগে! আর এই পৃথিবীর জন্ম হয়েছিল কত আগে? সেটা যদি ৫০০ কোটি বছর হয় তবে তা সেকেণ্ডে সহজেই রূপান্তর করা সম্ভব। মাপটা হিসাব করবো?

$$৫,০০০,০০০,০০০ \times ৩৬৫ \times ২৪ \times ৬০ \times ৬০ \text{ সেকেণ্ড}$$

$$= ১৫৭৬৮ \times ১০^{১৩} \text{ সেকেণ্ড}$$

$$= ১০^{১৮} \text{ সেকেণ্ড (প্রায়)}$$

একইভাবে 'মহাডিম্ব বিস্ফোরণের (Big Bang) পর কত সময় গেছে তাও সেকেণ্ডে মাপা সম্ভব।

'সেকেণ্ড' দিয়ে বড় বা ছোট্ট মাপের সময় যাকেই মাপি না কেন তাতে কিছু যায় আসে না। $১০^{-১২}$ বা $১০^{২০}$ — সবই আমাদের চেতনায় অতিক্ষুদ্র বা অতি বৃহৎ ধারণা আনে। দৈনন্দিন জীবনে দিন, ঘণ্টা, মিনিটের গুরুত্ব অনেক বেশি। ষষ্টির বাঁধনে বাঁধা সময় যেভাবে খণ্ড-খণ্ড করা আছে তাকে কেন ফরাসী বিপ্লবীরা পাল্টাতে পারেননি তা বোঝা যায়। চক্রাকারে সময়ের অস্তিত্ব মধ্যেই লুকিয়ে আছে ফরাসীদের ব্যর্থতার সূত্র। আর সেজন্যই বিজ্ঞান যতই এগোক না কেন, কেউই সময়কে সেকেণ্ড-মিনিট-ঘণ্টা ছাড়া অন্য কোন এককে মাপতে পারেন নি। এইখানেই 'দশমিক পদ্ধতির' সীমাবদ্ধতা।

বিশ্বাস বনাম বিজ্ঞান

বলরাম মজুমদার

পৃথিবীটা আজ অনেক ছোট হয়ে গেছে। যে কোনো সময়, যে কোনো দেশের মানুষের সঙ্গে ফোনে কথা বলা যায়। ঘরে বসে অলিম্পিকের খেলা দেখলুম। কত আনন্দ। সারাদিনে পৃথিবীর যে কোনো প্রান্তে, কোনো বিশেষ ঘটনা ঘটলে, সেটি তথ্য ও ছবি সহ সন্ধ্যায় খবরে দেখতে পাচ্ছি টিভিতে।

বিস্ময় লাগে মনে। ভাবি কি হল পৃথিবীটা। আরো কত বদলাবে ভবিষ্যতে। কি ভাবে, কোন যাদুর স্পর্শে এত বদলে যাচ্ছে। উত্তর হলো বিজ্ঞান। আধুনিক বিজ্ঞান মানুষের জন্য কি করেছে ? ঘরের যে কোনো দিকে তাকালেই বোঝা যায় বিজ্ঞান কি দিয়েছে। বাল্‌বের আলো, পাখা, রেডিও, টিভি, এ সবই বিজ্ঞানের দান। ঘরের বাইরে রেলগাড়ী, মটরগাড়ী, এরোপ্লেন সবই করেছে বৈজ্ঞানিকরা। তখন মনে প্রশ্ন আসে ব্যাপারটা কি ? হঠাৎ করে ইউরোপের মানুষ কেন বিজ্ঞান করতে বসলো। কি করেই বা সম্ভব হল এত আবিস্কার। কোথায় তার চাবি কাঠি ? সে সব কথাই এখানে ছোট করে বলতে চাই।

প্রায় দু-হাজার বছর আগে খৃষ্টধর্ম প্রচারিত হয় ইউরোপে। যিশুর ক্রুশ নিয়ে ক্যাথলিকরা বহুদিন ধর্ম প্রচারে ব্যস্ত ছিল। যিশু জন্ম গ্রহণ করেন জেরুজালেমে। তার আসে পাশের দেশের রাজারা মাঝে মাঝে জেরুজালেম দখল করে নিত। খৃষ্টানদের ধর্মগুরু পোপ। থাকেন রোমে। তিনিও এক রাজার মতন। তার সৈন্য বাহিনী আছে, আছে অর্থ ও লোকবল। ইউরোপের রাজারা তাকে মান্য করে, শ্রদ্ধাভক্তি করে। তার কথার খুব মূল্য। সবাই তার পরামর্শ নিতে এগিয়ে আসে। পোপ, প্রায় রাজার রাজা।

যখনই যিশুর জন্মস্থান আক্রান্ত হত, পোপ ইউরোপের রাজাদের আহ্বান করতো "বাঁচাও — বাঁচাও"! তখন রাজারা সৈন্যরা, বীর নাইটরা ঘোড়ার পিঠে চেপে, নিজের নিজের দেশ থেকে বেরিয়ে পড়তো। ধর্ম যুদ্ধে যেতে হবে। এর নাম ক্রুসেড। এরকম ক্রুসেড বা ধর্মযুদ্ধ ছ-বার হয়েছে ইউরোপে। ক্ষয় ক্ষতি ও জীবন নাশ হত অনেক।

তখনকার দিনে সাধারণ মানুষের জীবন ধর্মকে কেন্দ্র করেই চলতো। গীর্জায় প্রার্থনা, ধর্ম সঙ্গীত, স্থানীয় নাচ-গান, চাষ-আবাদ, ব্যবসা-বাণিজ্য। সাহিত্য চর্চা বলতে পুরাতন কবিতা বা কাব্য পাঠ ছিল জনপ্রিয়। জনগণ পড়তো লেটিন, আর মস্ত বীরদের কাহিনী।

রাজা ছিল মহান ব্যক্তি। একথা প্রচার করা হতো। বলা হতো — "ভগবান রাজা করেছেন প্রজাদের শাসনের জন্য। প্রজারা সব ব্যাপারে রাজাকে কৈফিয়ত দেবে। রাজা কৈফিয়ত দেবে কেবল ভগবানের কাছে।" জনসাধারণকে বোঝানো হতো এটা। "বিশ্বাস কর ! রাজা-ভগবান প্রেরিত মানুষ" এই মতই চলতো জীবন।

এই রকম জীবন যাত্রার মধ্যে গ্রীসের জনগোষ্ঠীর চিন্তাশীল ব্যক্তিরা একটু নতুন ভাবে চিন্তা ভাবনা শুরু করেছিলেন। সেটা চলতেই থাকে। সেই চিন্তার মূল সূত্র হলো — "বিশ্বাস নয় — বিশ্লেষণ" — "ভক্তি নয় যুক্তি"। যুক্তির দ্বারা বুঝতে হবে, বোঝাতে হবে পারিপার্শ্বিক ঘটনা। এথান থেকেই শুরু হয় বিজ্ঞান চেতনা।

গ্রীসের চিন্তাশীল মানুষদের যুক্তি ও ভাবধারা সারা ইউরোপের জনগণকে একদিন গ্রাস করে ফেলে। তারা বুঝতে পারে বাঁচার মন্ত্র হবে "বিশ্বাস নয় — বিশ্লেষণ"! মানুষ হয়ে ওঠে যুক্তিবাদী। মানুষের চেতনাবোধ বাড়ে। রাজা, ধর্মযাজক, ও এরিষ্টোক্রেট্‌দের অবহেলা, বঞ্চণার প্রতি ক্ষোভ বৃদ্ধি পায়। মানুষের নিজ কর্মক্ষমতার ওপর জাগে আস্থা। মানুষ বদলে যায়। ১৪৫৩ সাল। ইউরোপে আসে নবজাগরণ। আসে রেঁনাসাঁ।

গ্যালিলিও

মানুষ বিশ্লেষণ মুখী হয়ে ওঠে। পুরাতন সংস্কার ঝেড়ে ফেলে দিয়ে নতুন ভাবে বাঁচতে চায়। কয়েকটা ঘটনার উল্লেখ করলে বুঝতে সুবিধা হবে। পুরাতন দিনে বিশ্বাস ছিল – সমুদ্র দৈত্য-দানায় ভর্ত্তি। চুম্বক পাহাড় আছে অসংখ্য। পাহাড়গুলো জাহাজকে টেনে ধরে রাখে। জলের দানবরা জাহাজকে ঘুর-পাক খাইয়ে সমুদ্রের তলায় টেনে নিয়ে যায়। নাবিকরা তাই দূর-সমুদ্রে যেতে সাহস করতো না। নব-জাগরণের পর নাবিকরা চাইল যাচাই করতে। বুঝতে। দেখতে হবে কোথায় দৈত্য-দানব ? কোথা ভয় ? কিসের ভয় ? বিশ্লেষণ করতে হবে। ব্যাপারটা কি ?

মনোবল গেল বেড়ে। দুর্ধর্ষ মনবল নিয়ে বড় বড় সমুদ্র ও মহাসমুদ্র পাড়ি দিতে শুরু করে নাবিকরা। আবিষ্কার হয় নতুন দেশ। নতুন মহাদেশ। এর জন্য বড় বড় নাবিকরা পৃথিবীতে অমর হয়ে আছে। যেমন কলম্বস, ভাস্কো-ডা-গামা।

অতীত দিনে মানুষ জানতো পৃথিবী একটা বড় মাঠের মত। সমতল ক্ষেত্র। তার ওপর আছে পাহাড়, পর্বত ও নদী। আকারে সূর্যের চেয়ে বড় চাঁদ, এবং চাঁদের চেয়ে বড় পৃথিবী। বিশ্বাস করতো চাঁদ ও সূর্য, পৃথিবীর চারিদিকে ঘুরে চলেছে।

এ বিশ্বাসে আঘাত দিলেন কোপারনিকাস। নাম হল নিকোলাস কোপারনিকাস। তিনি পোলাণ্ডের মানুষ। আইন নিয়ে পড়াশুনা করেন। পড়েন ডাক্তারী, জ্যোতির্বিদ্যা ও দর্শন। গীর্জার পুরোহিত হন। বেশী সময় এই গীর্জায় কাজ করতেন। সেই গীর্জায় এক উঁচু স্তম্ভই ছিল তার আকাশ দেখার স্থান। তিনি অঙ্ক কষে বললেন — সূর্য স্থির ! পৃথিবী ও গ্রহগুলি তাকে ঘিরে ঘুরে চলেছে বছরের পর বছর। ইউরোপের মানুষ একথা মানতে চায়নি। তারা প্রতিদিন দেখে যে সূর্য পূর্ব দিক থেকে পশ্চিম দিকে চলে যাচ্ছে। তাই তাদের দৃঢ় বিশ্বাস সূর্যই ঘুরছে, পৃথিবী স্থির।

পরবর্ত্তীকালে গ্যালিলিও তার টেলিস্কোপ দিয়ে দেখা ছবি থেকে বোঝেন ও বোঝান মানুষকে যে পৃথিবী ঘুরছে। সূর্য স্থির। তিনি আরো বলেন — চাঁদে পাহাড় আছে। বৃহস্পতি গ্রহের চারটি চাঁদ আছে। সাধারণ মানুষ এসব মেনে নেয়নি। প্রতিদিন যা দেখছে তাতেই তাদের বিশ্বাস। নিজের চোখের ওপর, নিজের দেখার ওপর অনেক আস্থা।

পুরানো দিনে মানুষ দেখতো পাতা মাটিতে পড়ে আস্তে আস্তে। অন্যদিকে লোহার বল দ্রুত গতিতে ওপর থেকে নিচের দিকে পড়ে। তারা ধারণা করলো হাল্কা বস্তু ভারী বস্তুর চেয়ে দেরিতে মাটিতে পৌছায়। অর্থাৎ ৫ কিলো লোহার একটা বল ও এক কিলো লোহার বল ওপর থেকে এক সঙ্গে ফেললে, দেখা যাবে যে ভারী বলটা (৫ কিলো) আগে পড়বে ও হালকা বলটা (১ কিলো) দেরীতে পড়বে। এটাই সাধারণ মানুষের ধারনা। বিশ্বাস করতো এই কথা। এ ধরণের বিশ্বাস ছল এরিষ্টটলের মত মহান বিদ্যান মানুষটির। এরিষ্টটল আলোকজাণ্ডারের গৃহ শিক্ষক ছিলেন।

এটা ঠিক নয়। গাছের পাতা ও পাথরের মাটিতে পড়ার ভিন্ন সময় লাগার কারণ, পাতা বাধা পায় বাতাস থেকে। তাই পাতা ধীরে ধীরে পড়ে। গ্যালিলিও ও নিউটন এসব নিয়ে অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেন। হালকা ও ভারী বস্তু একই উচ্চতা থেকে একই সঙ্গে মাটিতে এসে পড়ে।

মানুষের পুরাতন বিশ্বাসে বাধা আসে। গ্যালিলিও যেখানে চাকরি করতেন, সেখানে তার শিক্ষিত সহকর্মীরা তার কথা মানতে রাজী নয়। সহকর্মীরা বলতে শুরু করলেন — "এরিষ্টটলের সিদ্ধান্ত গ্যালিলিও মানছে না। গ্যালিলিও নিশ্চই সুস্থ মস্তিষ্কের মানুষ নয়"। সবাই একথা বলতে থাকলে গ্যালিলিওর চাকরি যায়। পিসা বিশ্ববিদ্যালয়ের চাকরি গেল, তাতে তিনি ক্ষুব্ধ নন। তার পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলতে থাকে। পরের বছর গ্যালিলিও পাড়ুয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে অঙ্কের অধ্যাপক হিসাবে নিয়োজিত হন।

রেঁনেসাঁ যুগে মানুষ নতুনকে জানার জন্যে, বোঝার জন্য জীবনের ঝুঁকি নিয়েছে অনেক। তাদের চেষ্টার মূলসূত্র ছিল বিশ্লেষণ ভিত্তিক। রেঁনেসাঁ যুগের আগে অর্থাৎ ১৪৫৩ সালের আগে মানুষের বিশ্বাস ছিল যে কাঠকে আগুনে

পোড়ালে, কাঠের অনেক জিনিষ পুড়ে গ্যাস হয়ে যায়। গ্যাস বাতাসে মিশে যায়। যা পড়ে থাকে তার ওজন কমে যায়। এই যুক্তিকে সামনে রেখে মানুষ ভাবতো-যে কোনো বস্তুকে পোড়ালে তার ওজন কমে যাবে। কারণ দাহ্য বস্তুর বেশ কিছুটা জিনিষ পুড়ে গ্যাস হয়ে বাতাসে মিশে যায়। মানুষ এইটা বহু দিন ধরে বিশ্বাস করে আসতো। কোনদিন বিশ্লেষণ করে দেখেনি।

ল্যাভয়সিয়ের রাসায়নিক ওজন দাঁড়ি দিয়ে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ওজন করে দেখান যে মানুষের এই বিশ্বাস সঠিক নয়। আগুনে পোড়ালে কোন কোন পদার্থের ওজন বাড়ে (সীসা)। সুতরাং আগুনে পোড়ালে পদার্থের ওজন কমে যায় এটি সংস্কারের মত মানুষের মনে গাঁথা ছিল। অনেক শিক্ষিত বৈজ্ঞানিকও এই তত্ত্ব মেনে নিত। ল্যাভয়সিয়েরের বক্তব্য ছিল বিজ্ঞান ভিত্তিক। কেউ মেনে নিক বা না নিক, ল্যাভয়সিয়ের নিশ্চিত হয়েছিল বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ করার পর। তিনি অনেক পরীক্ষার পর বুঝতে পারেন যে — আগুনে পোড়ালে কেবল মাত্র বস্তুর ওজন কমে যায় এটা ঠিক নয়।

আর একজন বৈজ্ঞানিকের কথা বলবো। যাকে তোমরা জানো বা তার নাম শুনেছো। তার জীবনের গবেষণার বিষয় বস্তু মানুষকে বোঝাতে বেশ কষ্ট হয়েছিল। তিনিও বেঁচে ছিলেন এই রেঁনাসাঁ যুগে। মানুষটি হলেন চার্লস ডারউইন। তার কাজ কর্ম ছোট করে বলি। তাহলে বক্তব্যটা বোঝার সুবিধা হবে।

ডারউইনের বয়স তখন বাইশ বছর। তিনি পাঁচ বছরের জন্য পৃথিবী ভ্রমণে বের হন। উদ্দেশ্য পৃথিবীর নানা দেশের জীবজন্তু গাছপালা সংগ্রহ করা। পাল তোলা জাহাজ নিয়ে ইংলণ্ড থেকে বের হন। সমুদ্রে ভাসতে ভাসতে দক্ষিণ এমেরিকার ব্রাজিল, আরজেনটিনা হয়ে গ্যালিপোগাস দ্বীপপুঞ্জে পৌছে যান। সেখানকার ফিঞ্চ পাখীদের ব্যাপার দেখে তিনি বিস্মিত। যে সব দেশে তিনি যান, সেখান থেকে ফসিল ও জীবজন্তুর সম্বন্ধে নানান তথ্য নিয়ে ফিরে আসেন। সেইগুলি বাকি জীবনে বিশ্লেষণ করেন ও তার বিশ্ব বিখ্যাত বই লেখেন। নাম হল — "অন দি অরিজিন অফ স্পিসিস্ বাই মিনস্ অফ্ নেচারাল সিলেকশন" (১৮৫৯)।

এই বইতে বলতে চান যে সমস্ত গাছপালা ও জীবজন্তু পৃথিবীর বুকে সব সময় পরিবর্তন হয়ে চলেছে। এই পরিবর্তনের ধারা বহু যুগ যুগ ধরে চলে আসছে। পরিবর্তিত জীব বাঁচার জন্য লড়াই করে চলেছে। যে বাঁচার জন্য উপযুক্ত সেই বাঁচে। অন্যেরা পৃথিবী থেকে বিলীন হয়ে যায়। এই বইতে তিনি আরো বলেন যে মানুষ পুরাতন দিনের বাঁদর জাতীয় জীব থেকে ক্রম বিবর্তনের মধ্যে দিয়ে ধিরে ধিরে আধুনিক মানুষে এসে পৌছেচে।

সমস্ত ইউরোপে সাড়া পড়ে গেল। সব বাড়ীতেই এবই কেনার জন্য হুড়ু-হুড়ি। পড়তে হবে ডারউইন কি বলতে চায়। দেখা গেল মানুষ বইটাকে ভাল ভাবে নিল না। "বাঁদর থেকে মানুষ এসেছে" — " একি কথা।" বাইবেলে আছে ঈশ্বর বল্লেন — "আলো আসুক — ওমনি আলো এলো। — এখানে মানুষ হোক - ওমনি মানুষ এলো"। "তাহলে কি বাইবেল মিথ্যা" — না - তা হতে পারে না"। পোপও বিসপেরা ডারউইনের এই মন্তব্যে ভীষণ চটে গেল। ডারউইনকে বলে - "অপদার্থ"। সংবাদপত্র রাগা-রাগী করে লেখা লিখতে থাকে। প্রকাশিত হয় ব্যঙ্গ চিত্র। একটি চিত্রের কথা বলি। — সেখানে আঁকা আছে - গাছের নিচে ডারউইন দাঁড়িয়ে। সেই গাছের ওপরের ডালে একটি বাঁদর বসে। সেখানে একটি লোক বলছে — "ডারউইন ! তোমার ঠাকুরদা গাছে বসে আছে দেখতে পেয়েছো" !

কঠিন ব্যঙ্গ ! অপমান ! কোন মানুষই মানতে পারেনি ডারউইনের সৃষ্টি তত্ত্বের কথা। মানুষ বহুদিন বিশ্বাস করেছে - 'ভগবান মানুষ তৈরী করেছে' বাঁদর থেকে ক্রম বিবর্তনে মানুষ হয়েছে - একথা বিশ্বাস যোগ্যনয়। তাই এত ব্যঙ্গ, বিদ্রুপ, অপমান।

বেশ কয়েক বছর যাবার পর জার্মান বৈজ্ঞানিকরা প্রথম চিৎকার করে বলেন — 'ডারউইন হয়তো ঠিকই বলেছে'। তার পর থেকে সারা পৃথিবীতে জীবজগতের গাছ ও প্রাণী নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা হচ্ছে। বিশ্লেষণ করা হচ্ছে - শরীরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ, ক্রোমোজোম, রক্তের বিভিন্ন প্রোটিন ও চরিত্র। অন্য আরো অনেক কিছু। জানতে চাইছে - বাইবেলের কথা সত্য - নাকি - ডারউইনের বক্তব্য সঠিক। তাই প্রতিদিন জীবদেহ নিয়ে কাটা-ছেঁড়া, ও বিচার বিশ্লেষণ চলছে। এসব এখনো বহুদিন চলবে। কারণ এতে মানুষ জানতে পারছে নানান তথ্য ও তত্ত্ব। এগিয়ে চলেছে আধুনিক বিজ্ঞান।

চঞ্চল অতিথি

জীবন সর্দার

এই বর্ষায় সুন্দর সুন্দর অতিথিরা আমাদের ঘরে এসেছিল। আমরা অতিথি খুব ভালবাসি। কিন্তু সবার দিকে এবার সমান নজর দিতে পারিনি।

প্রথম বর্ষার এক সন্ধ্যায় এলো কালো পিঁপড়েরা। মুখে ডিম নিয়ে। দেয়াল বেয়ে দরজার উপর, ছাদের নিচে গিয়ে বসেছিল। কোথা থেকে কেন এসেছিল, সেই খোঁজ নিতে পারিনি। ভোর না হতেই তারা নিরুদ্দেশ ! তার ক'দিন পর, ঝড় এল। বৃষ্টি হল পরপর কয়েক দিন। মাঠ বাগান জলে থৈ থৈ। সেই দিনগুলিতে পুবের, বাগানের দিকের জানালার কোনায় ভিড় দেখলাম লাল পিঁপড়ের। বাগানের মাটির তলায় এদের ঘরবাড়ি — সেখবর আমার জানা ছিল। ওদের তাড়াবার চেষ্টা করিনি। জল কমতেই সবাই চলে গেল। শুকনো মাটির গুঁড়ো যা তারা জমা করেছিল, সে ডাঁই সাফ করলাম শুধু।

রঙ্গিন ঘাস ফড়িং এসেছিল রাত করে। সব বছর যেমন আসে। তার আগে বৃষ্টি একদম ছিল না। এমন অতিথি দেখতে পেয়ে আমি তখুনি তার দিকে ঝুঁকলাম। ওর ডানার সবুজ ডোরা, মাথার দিক থেকে একটানে কাছে এসে মিলেছে। এমন করে যেন দুই ডানার একটাই ডোরা। আমাকে বেশি মনোযোগী হতে না দিয়ে সে আলমারির পেছনে চলে গেল। আমি নিরাশ হয়ে উঠে দাঁড়াতেই খুব সুন্দর প্রজাপতিটা দেখতে পেলাম। বইয়ের তাকে পিঠের উপর ডানা তুলে সেটা বসেছিল। ওটা দিনের না রাতের প্রজাপতি, মানে মথ নাকি — সেটা দেখা জরুরী ছিল আমার কাছে। এত সুন্দর প্রজাপতি দিনেও দেখেছিলাম।

মথ আর প্রজাপতির বসার ভঙ্গি দেখেই বোঝা যায় কোনটি কি। আসলে ডানা কিভাবে রয়েছে তাইই আমি নজর করলাম। বসেছিল পিঠের উপর ডানা সোজা তুলে, যেন রঙ্গিন পাল তুলে ভেসে যাচ্ছে ছোট্ট নৌকো। রঙ্গিন বলছি বটে, কিন্তু রঙ দেখছি দুটি — গাঢ় খয়েরী ডানায় চকচকে হলুদ ছোট্ট তিনটি করে বরফি।

যদি কেউ তখুনি ওটার নাম আমাকে জিজ্ঞেস করত তবে বলতে পারতাম না। সকালের দিকে দেখা এই রঙের, বিন্দু বা বরফিওয়ালা প্রজাপতিকে আমি নাম দিয়েছি "ছটফটে"। এত তাড়াতাড়ি ওড়ে আর দিক পালটায় সে, ভাল করে দেখি সাধ্য কি। ওড়ার ভঙ্গি কেঁপে কেঁপে, থমকে থমকে বলেই পা যত দেখার অসুবিধা। কিন্তু যে জ্যান্ত নমুনাটি বইয়ের তাকে বসেছিল তার কাছে যাওয়া অসুবিধা হলো না। যাতে ও পালিয়ে না যায়, আমিও তার জন্য সাবধানে এগোলাম।

আমি দেখতে চাইছিলাম ওর শুঙ্গ। একথা আমাদের সকলেরই জানা প্রজাপতির শুঙ্গ আর নিশাচর প্রজাপতি বা মথদের শুঙ্গ একদম আলাদা। প্রজাপতির শুঙ্গ হয় মুগুরের মত, নয়তো গাঁটের মত, মানে ডগা ফোলা। 'ছটফটে' প্রজাপতিদের শুঙ্গে আরও একটু বিশেষত্ব আছে। মুগুরের মত শুঙ্গ তাদেরও কিন্তু বঁড়শির মত বেঁকে গেছে ডগা। এমনটা মথদের শুঙ্গ কখখনো হয় না। খুব জোর দিয়ে বলছি একথা, 'রাতের প্রজাপতির' শুঙ্গ চিরুনি, কিংবা ঝালর কিংবা পালক কিংবা আর যাই হোক মুগুর কিংবা বঁড়শির মত নয়। মানে, অন্যরকম এছাড়া ওদের বেলায় কখনও দেখিনি। আমার বইয়ের তাকে যে ঋষি মশাই প্রজাপতির রূপ ধরে সন্ধ্যায় হাজির হয়েছেন তিনি 'ছটফটে' দলেরই। অর্থাৎ যে প্রজাপতি অন্ধকারে ওড়া ওড়িতে অভ্যস্ত। ওর শুঙ্গটি সরু, মুগুরের মত কিন্তু ডগা বঁড়শির মত বাঁকানো।

শুঙ্গ দেখার পর মনে করলাম এবার দেখা দরকার চোখ আর পা। পোকা, সে ছ'পেয়ে হোক বা আটপা ওয়ালা হোক, ডানা থাকুক বা নাই থাকুক, চোখের বিশেষত্ব থাকবেই। এক একটা চোখে হাজার হাজার পরকলা থাকতে

পারে — সেটা বিশেষ যন্ত্রে বিজ্ঞানীরা দেখে বলতে পারেন। আমরা শুধু উপর উপর দেখে বলতে পারি চোখের রঙ আর গড়ন। এক্ষেত্রে, মানে সেটাকে আমি দেখছিলাম তার চোখের গড়ন ছিল বেশ বড়, রঙ ছিল লালচে। 'ছটফটে' প্রজাপতিদের দলে লাল চোখের এমন নমুনা খুব বেশি নেই মনে হয়। ["কিশোর-বিজ্ঞানীরা খুঁজে দেখতে পারে তাদের নিজের নিজের এলাকায়।]

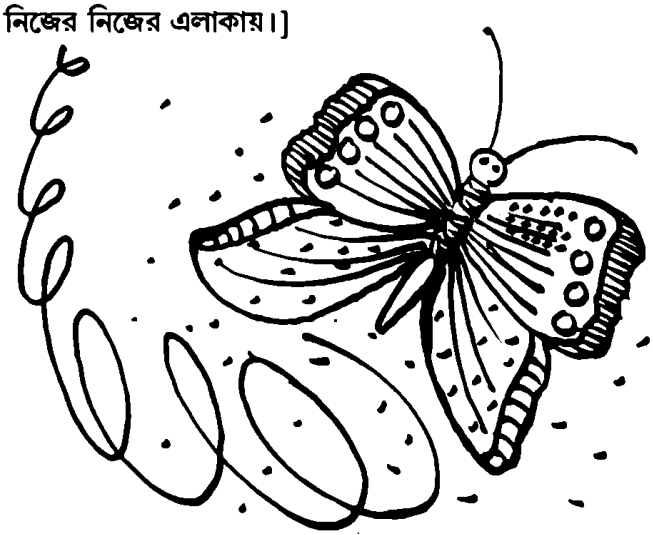

'চোখের' দেখা এক পলকে সারা হয়ে গেল বটে, কিন্তু পায়ের দিকে নজর দিতে সময় লাগল। না কোন যন্ত্র দরকার হচ্ছিল না। হঠাৎ 'ছটফটে' তার একক্ষণের জায়গা ছেড়ে উড়ল। সারা ঘর এমাথা ওমাথা দেখে, কোথাও না বসে ফের সেখানেই বসল যেখানে এতক্ষণ বসেছিল। আলমারির পেছনে যে টিকটিকিটা তাকে অনেকক্ষণ নজরে রেখেছিল। আমি কাছে থাকায় সে এগোতে সাহস পায়নি। দেখলাম এবার সে মুখ ফিরিয়ে চলে গেল। আমি হা করে 'ছটফটের' পায়ের দিকে নজর দিলাম। মনে মনে বললাম 'পারফেক্ট'।

মানে ওটার ছটা পা সব ঠিক ঠাক ছিল। এমনও দেখেছি কোন কোন খয়েরী প্রজাপতির সামনের দুটো পা খাটো। যেন পায়ের সব গুলো পর্ব বেড়ে ওঠেনি। ফল যা হয়, ওই পরিবারের প্রজাপতিগুলো ফুলের পাপড়ির ওপর বসে হেঁটে এগোতে পারে না। মধু খেতে তাকে ফুলের মাঝেই বসতে হয়। অবশ্য ডানা নেড়ে ঠিক জায়গায় বসতে একবারও অসুবিধা হয়েছে এমনটা দেখিনি। এমন করে দেখা আমি এইখানেই শেষ করে দিতাম, যদিনা কিশোর বিজ্ঞানীর কথা মনে থাকত। 'ছটফটের' কথাই লিখব বলে ঠিক করে ফেলেছি। কিন্তু আরও কিছু জানা ও দেখার দরকার ছিল — লেখাটি ঠিক ঠিক কিশোর-বিজ্ঞানীদের উপযুক্ত করে তুলতে।

'ছটফটে' বলে প্রজাপতির নাম কখনও শুনিনি। ছেলেবেলায় আমার মাষ্টারমশাই এই ধরণের প্রজাপতিকে বলতেন 'স্কিপার'–ইংরেজী শব্দ। মানে, লাফিয়ে চলে এমন প্রজাপতি। প্রজাপতি কি উচ্চিংড়ি যে লাফিয়ে চলবে ! আসলে ওড়ার ভঙ্গি কাঁপা কাঁপা বলে এমন নাম দিয়েছিল ইংরেজ প্রজাপতি বিশারদরা। তাঁরা প্রজাপতির, বিশেষ করে ভারতের প্রজাপতির হাবভাব, ভাগবিভাগ নিখুঁত নিয়মে করে দিয়েছেন। আমার মাষ্টার মশাই আমাকে প্রজাপতির প্রাথমিক জ্ঞান দিয়েছিলেন ওঁদের বই দেখেই। সে খবরও জানিয়েছিলেন তখুনি। বলেছিলেন, ভারতের প্রজাপতি পরিবারের দশটি ভাগ। একটি ভাগের নাম – হেস্পারিডি। ওটি গ্রীক শব্দ, মানে সন্ধ্যা বা পশ্চিমা। কেউ কেউ ওই শব্দটির মানে বলেন, সন্ধ্যাতারা বা শুক্রগ্রহ। এক ধরণের প্রজাপতি, যে কিনা আলো-আঁধারে চলাফেরা করে তার নাম পরিবারের নাম, ঠিক করতে ভাষার কতনা কারুকাজ করতে হয়েছে। আমি তাই বলেছিলাম ওঠাকে 'ছটফটে' বলব।

আমার দেওয়া নাম নিয়ে আমিই চলতাম। কিন্তু মজে গিয়েছিলাম প্রজাপতির খোঁজখবরে। বসা বা ছুটন্ত প্রজাপতি দেখেই মজা পেতাম। মেরে, বাক্সবন্দী করে রেখে নয়। 'ছটফটের' নানা তথ্য যোগাড় হল এইভাবে ঃ

খেয়াল করে দেখে দেখে আমার জানা হয়ে গিয়েছিল মথ, মানে রাতের প্রজাপতির ডিম গোল, চ্যাপটা আর পাতলা। কিন্তু প্রজাপতির ডিম বাহারে। রঙীন, ডুমো ডুমো আর নকশাদার। বাগানে ঝোপে পাতার তলায় খুঁজতাম, তা পেয়েও যেতাম। 'ছটফটে' প্রজাপতির ডিম অন্ধকারে ঘন ঝোপের কোন গাছের পাতার ডগায় বা তলায় খুঁজে পেয়েছি। কিন্তু ডিম ফুটে ছানা বেরনো অবধি অপেক্ষা করতেই হয়েছে। ছানা যখন তার খাওয়া শুরু করত, তখনই সেই পাতা সহ তাকে বোতলে ভরে ঘরে এনেছি। তারপর দেখতে দেখতে পনের/কুড়ি দিনের ভেতর খোলস ছেড়ে বেরিয়ে পড়ত যত্নে রাখা নমুনাটি। হাতের উপর বসে অলস ভঙ্গিতে ডানা মেলত। দম বন্ধ করে ওটার হাবভাব দেখছি। হঠাৎ পলক না ফেলতেই, উড়ত। ওদের দূরন্ত

গতির ওড়া হয়তো আয়ু বাড়িয়ে দেয়, শত্রুরা সহজে ধরতে পারেনা বলে।

'ছটফটে' ডিমগুলো লালচে বা সাদা কিন্তু ওর শুঁয়োপোকার রঙ সবুজ। মাথা আর লেজের দিক সরু, পেট মোটা। গায়ে খুব ছোট ছোট লোম। যে পাতা খেয়ে খেয়ে বড় হতে থাকে, খোলস ছেড়ে ছেড়ে ; একদিন তেমনি একটি পাতা জড়িয়ে নেয় গায়। লেজটা আটকে থাকে গাছের ছোট্ট অন্ধকার ডালে। মনে হয় মড়া শুকনো পাতা ঝুলছে। ডালের সাথে নিজেকে পাতা সহ লালার সুতোয় বেঁধে রাখে বলেই বুঝতে পেরে যাই পাতার ভেতর প্রজাপতির সম্ভাবনা একটি রয়েছে।

ছোট বেলায় যা জেনেছিলাম 'ছটফটে'দের সব খবর কিশোর-বিজ্ঞানীদের জানালাম। তারপর তো অনেকদিন পার হলো, এখনও কি প্রজাপতিরা ছোটদের কাছে কৌতূহল আর বিস্ময়ের জিনিস ! অনেকরকম 'ছটফটে' প্রজাপতি ছিল. সব গুলোর দেখা পাইনি। সব বলতে দু'তিনশ হবেই — যাদের খোঁজ প্রজাপতি-বিশারদগণ দিতে পেরেছেন। আমরা তারপর আর কতটুকু বা জেনেছি। হয়ত নতুন কোন প্রজাপতি কোন কিশোর-বিজ্ঞানীর চোখে ধরা পড়ার জন্য অপেক্ষা করছে। যার কথা শীঘ্রীর জানতে পারব। কিন্তু ছটফটে অতিথির কি হলো ! সারারাত সেটা একই জায়গায় ছিল। ভোর না হতেই, পুবের জানালা দিয়েই বাগানের ঝোপের ভেতর চলে গলে।

শেষ কথা। কেউ কেউ প্রজাপতির নাম ছটফটে রেখেছি বলে আপত্তি করছে। ওই নামে নাকি মান থাকে না। ওদের হাববাব দেখে যদি কেউ এর চেয়ে ঠিকঠিক নাম দিতেপারে আমার তাতে আপত্তি নেই। তবে এখনই আমি ওকে 'চঞ্চল অতিথি' বলে ডাকছি।

With Best Compliments from :—

TECHNOLAB

SCIENTIFIC CO

Dealing With

Slab Gel Electrophoresis, DNA Sequencer, Bioblot, Power Supply, Plastic Labwares of Tarson, Laxbro, Instruments & Chemicals for Tissue Culture, Micropipette, Imported/Indian Chemicals.

17/1D, Gopal Nagar Road,
Calcutta-700 027 .
Ph. No. (033) 479-9039

চকোলেট গাছ

জয়ন্ত দাস

অনেকটা আমাদের পেঁপে গাছের মতো। এই গাছ লাগাবার তিন চার বছর পরেই ফল ধরে। এই পর্যন্ত শুনে যারা ভাবছ সে কি মজা গাছ থেকে ফল পারলেই রাশি রাশি চকলেট তার মধ্যে পাওয়া যাবে তাদের কিন্তু আরও বেশ কিছু অপেক্ষা করতে হবে। কারণ ঐ চকলেট গাছ থুড়ি ক্যাকাও গাছ থেকে সবুজ রঙের ১০ থেকে ১২ ইঞ্চি ক্যাপসুল বের হয় যেটা পাকলে কমলালেবুর মতো রঙ হয়, ঐ ক্যাপসুলের ভিতরে পঁচিশ থেকে পঞ্চাশটা বীজ পাওয়া যায় যেগুলিকে আট থেকে দশদিন ধরে গেঁজানো হয়। এই সময় একটা তীব্র গন্ধ বের হয়। গেজানোর পরে বীজগুলিকে ধুয়ে শুকিয়ে সেদ্ধ করা হয়। এরপরে শক্ত খোলটা ছাড়িয়ে পিষে তরল করা হয়। এই তরল চকলেট ঠাণ্ডা হয়ে গেলে শক্ত মেটে রঙের হয়ে যায়। এরপরে এর মধ্যে দুধ চিনি বাদাম ইত্যাদি মিশিয়ে যন্ত্রের সাহায্যে বিভিন্ন ধরণের চকলেট বানানো হয়। আর তারপরের গল্প তো তোমাদের জানা। চকচকে প্যাকেটে করে সোজা তোমাদের হাতে তাই না ?

তোমাদের হাতে এত লোভনীয় জিনিষটা পৌছে দেওয়ার জন্যে প্রথম কে উদ্যোগ নিয়েছিল জানো ? হ্যাঁ ঠিকই ধরেছ। সেই ক্রিস্টোফার কলম্বাস। যে আমেরিকা আবিস্কার করেছিল।

কলম্বাস লক্ষ্য করেছিলেন যে আমেরিকার বর্বর অধিবাসীরা গাছ থেকে ক্যাকাও ফল পাড়ে তার থেকে শাঁস বের করে সূর্যের তাপে শুকিয়ে নেয়। তার পর মজা করে খায়। আমেরিকা থেকে দেশে ফেরার সময় কলম্বাস বেশ কিছু ক্যাকাও ফল পকেটে করে নিয়ে এসেছিল। আর তারপর ! বর্বর নিগ্রোদের সেই খাদ্য রাতারাতি বনেদী ডাইনিং টেবিলে উঠে পড়ল। ইংল্যাণ্ডের রাজা দ্বিতীয় চার্লসের সময় থেকেই চকলেট ও কোকো সেখানকার ঘরে ঘরে সমাদর লাভ করে। আর আজ ! "যে কথা মুখে বলা যায়না তা কেবল চকলেটই বলতে পারে।" তবে চকলেটও যে কখনও কখনও বিস্বাদ হয়ে পড়ে তা সম্প্রতি টের পাওয়া গেছে লখনউ এর একটি রিসার্চ ল্যাবরেটরীর প্রকাশিত তথ্যে। এনভায়রণমেণ্টাল রিসার্চ ল্যাবরেটরীর প্রকাশিত রিপোর্টে বলা হয়েছে যে তাদের গবেষণাগারে বিশ্লেষিত নমুনার মধ্যে অতিরিক্ত পরিমাণে নিকেল পাওয়া গেছে। এই নিকেল কিন্তু তোমাদের মতো শিশুদের বেড়ে উঠতে বাধা দেয়। তাছাড়া ক্যানসার সৃষ্টি করতেও এর জুড়ি নেই। তাই যতদিন সরকার চকলেটে নিকেল কমানোর জন্যে কোন ব্যবস্থা নিচ্ছে না ততদিন নিজেদের স্বার্থেই চকলেট না খাওয়াটা বুদ্ধিমানের কাজ নয় কি ?

আকাশ-পাড়ায়, আলো-ইশারায়

শ্যামল বন্দ্যোপাধ্যায়

গ্রহ, তারা আর ধূমকেতু নিয়ে ভেবে, কাটে তার বেলা,
কেউ বলে, তিনি করছেন কাজ ; কেউ বলে, – ছেলে-খেলা !
যে, যা-ই বলুক, যান নাকো রেগে,
কাজ করে যান, দিন-রাত জেগে ;
দূরবীণে, ঠায় আকাশ-পাড়ায়, চোখ দুটো থাকে মেলা !

গবেষণাগারে বিবর্তন

গোপাল ভট্টাচার্য

ডারউইনের বিবর্তনবাদ তিনটি বিষয়ের ওপর প্রতিষ্ঠিত ঃ নির্বাচন, বিবর্ধন এবং পরিব্যক্তি। নির্বাচনের মাধ্যমে জীবের পক্ষে কোন নির্দিষ্ট পরিবেশে বংশবৃদ্ধির সময়সীমা পর্যন্ত ভালোভাবে টিকে থাকা সম্ভব হয়। প্রাকৃতিক নির্বাচনে যারা সফল হয় তারা যথেষ্ট বেশি সংখ্যায় বংশবৃদ্ধি করে। তাদের বংশধরদের মধ্যে বিভিন্নতার উদ্ভব হয় পরিব্যক্তির (মিউটেসান) দ্বারা। পরিব্যক্তির মাধ্যমেই মূলতঃ নতুন প্রজন্মের মধ্যে বিভিন্নতা দেখা যায়।

ক্যালিফোর্নিয়ার লা জোলায় স্ক্রিপস্ রিসার্চ ইন্‌স্টিট্যুটে জেরাল্ড জয়েস তাঁর গবেষণাগারে ডারউনের বিবর্তনের ধারা প্রত্যক্ষ করেছেন। সাঁইত্রিশ বছরের প্রাণরসায়নবিদ জয়েস অবশ্য কোন জীব নিয়ে পর্যবেক্ষণ করেন নি। তাঁর পরীক্ষা হল রাইবো নিউক্লিয়িক অ্যাসিড অর্থাৎ R N A নিয়ে। প্রকৃতিতে বিবর্তনের যাত্রা হয়েছে চার বিলিয়ন বছর আগে থেকে। বিপুল সংখ্যক উদ্ভিদ ও প্রাণীর মধ্যে বিবর্তনের গতি আজো অব্যাহত। কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন ধারায়।

জয়েস প্রদর্শিত টেষ্টটিউবে বিবর্তনের ধারা কেবলমাত্র বিবর্তনের সময়ে জিনগত কৌশলই দেখায় না। চিকিৎসার কাজে ব্যবহারের উপযোগী নতুন ওষুধ উদ্‌ভাবনার পথ দেখাচ্ছে এই পরীক্ষা। এরই মধ্যে প্রায় ডজনখানেক বায়োটেক কোম্পানী এ ব্যাপারে হাত বাড়িয়েছে।

১৯৮২ সালে সান ডিয়েগোতে ক্যালিফোর্ণিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে ডক্টরেট ও মেডিকেল ডিগ্রির জন্য যখন জয়েস ব্যস্ত সেই সময় হাজার মাইল দূরে কলেরোডো বিশ্ববিদ্যালয়ে টমাস কেক R N A সম্পর্কে একটি বিস্ময়কর তথ্য আবিস্কার করলেন। এতদিন জানা ছিল R N A হল D N A-র পরিপূরক অণু। বরং বলা ভালো D N A শৃংখলের অ্যাডেনিন, গুয়ানিন, সাইটোসিন ও থাইমিনের (সংক্ষেপে A. G. C. T) পরিপূরক বেস হিসেবে R N A শৃংখলে থাকে যথাক্রমে ইউরাসিল, সাইটোসিন, গুয়ানিন ও অ্যাডেনিন (U, C, G, A)। R N A-র মূল কাজ হল D N A-র জেনেটিক সংকেত বহন করে রাইবোজোমে নিয়ে এসে সেখানে সেই সংকেত অনুযায়ী পর পর নির্দিষ্ট অ্যামিনো অ্যাসিডযুক্ত প্রোটিন তৈরি করা। কিন্তু কেক দেখলেন কয়েকটি ক্ষেত্রে R N A এনজাইমের মতো কাজ করছে। এ পর্যন্ত জানা ছিল জীবদেহে অনুঘটকের কাজ করে কেবলমাত্র এনজাইম। এরা প্রোটিন। আর এন এ-র এই ধরনের ভূমিকার কথা ভাবাই যায় নি। কেক তাঁর নতুন আবিষ্কৃত (আর এন এ) এনজাইমের নাম দিলেন রাইবোজাইম।

ডি এন এ-র মধ্যে যেমন বংশগতি সম্পর্কে যাবতীয় তথ্য রয়েছে আর এন এ-র মধ্যেও সেই তথ্যের প্রতিলিপি বর্তমান। একটি ডি এন এ অনু যেমন বিশেষ ক্ষমতায় একটি থেকে দুটিতে পরিণত হয়, আর এন এ-র বেলায়ও তেমনটি হতে পারে। অবশ্য জীবদেহে খুব কমই এমন অবস্থার সৃষ্টি হয়। এ পর্যন্ত জানা কিছু ভাইরাসের মধ্যেই এই রকম ঘটনা সীমাবদ্ধ। বিবর্তনের মাধ্যমে প্রোটিনের যেমন প্রকারভেদ দেখা যায়, আর এন এ-র বেলায়ও সে রকম হওয়া খুবই স্বাভাবিক।

এই ধরনের চিন্তা ভাবনার মধ্য দিয়ে জয়েস তাঁর গবেষণা সুরু করলেন। ১৯৯০ সালে কেকের প্রধান

রাইবোজোমকে ছাঁচ হিসেবে ব্যবহার করে প্রায় $১০^{১৩}$ কপি তৈরি হয়। মূল রাইবোজোম অনু সংগ্রহ করা হয়েছিল একটি প্রোটোজোয়া থেকে। মূল রাইবোজোম আর এন এ কে কাটতে পারে এবং তারপর তাকে পুনর্বিন্যস্ত করতে পারে। কিন্তু ডি এন এ-র বেলায় এই আর এন এ নিষ্ক্রিয়।

জয়েসের চেষ্টা হল টেস্ট টিউবে বিবর্তনের মধ্য দিয়ে এই আর এন এ-কে এমন অবস্থায় নিয়ে আসা যাতে সে ডি এন এ-কেও কাটতে পারে। এইভাবে পরিবর্তিত রাইবোজাইম যদি ডি এন এ-কে ভেঙে দিতে সমর্থ হয় তাহলে সেই রাইবোজাইমকে ক্ষতিকারক ডি এন এ ভাইরাসের বিরুদ্ধে কাজে লাগানো যায়। অর্থাৎ বায়োটেকনোলজির মাধ্যমে নতুন ওষুধ পাওয়া যাবে। এই কারণেই বিভিন্ন বায়োটেক কোম্পানির জয়েসের কাজের গুরুত্ব দিচ্ছে।

রাইবোজাইম ভর্তি টেস্টটিউবে জয়েস ডি এন এ নিক্ষেপ করলেন। অধিকাংশ রাইবোজাইমই স্বাভাবিক কারণেই ডি এন এ-র উপস্থিতি গ্রাহ্যের মধ্যে আনল না। কিন্তু বিস্ময়ের কথা হল দুচারটে রাইবোজাইম অনু ডি এন এ-র একত্রিত দুটি শৃংখল থেকে একটু আংশ আলাদা করে কেটে নিল। দশ লক্ষের মধ্যে একটি আর এন এ (রাইবোজাইম) এভাবে ডি এন এর ভাঙন ধরাতে সমর্থ হল। যে সব আর এন এ অনু ডি এন একে কাটকে পারছে তাদের সঙ্গে ডি এন এ-র একটু অংশ লেগে থাকায় একটা বাড়তি সুবিধে হয়ে গেল তাদের আলাদা করার কাজে। জয়েসের কাছে এই অনুগুলিই 'নির্বাচনে' জয়ী হল। এর পরের কাজ হল নির্বাচিতের সংখ্যা বৃদ্ধি করা। জীবজগতে এই কাজটি হয় জননক্রিয়ার মাধ্যমে। আর এন এ বা রাইবোজাইমের বেলায় ধাত্রীর কাজ করলেন জয়েস। তিনি 'নির্বাচিত' আর এন এ-র সঙ্গে দুরকম প্রাইমার অনু (যারা আর এন এ কে কপি করার কাজে প্রস্তুত করে) এবং দুরকম এনজাইম যাদের সাহায্যে দ্রুত আর এন এ-র সংখ্যা বৃদ্ধি পায় যোগ করলেন। ঘণ্টা খানেকের মধ্যে একটি আর এন এ অনু থেকে দশ লক্ষ আর এন এ অনু তৈরি হল।

পরের কাজ হল অপত্য রাইবোজাইমের মধ্যে পরিব্যক্তি ঘটানো। এজন্য তিনি এদের সংখ্যাবৃদ্ধির জন্য একটি ঢিলেঢালা ধরনের এনজাইমের সাহায্য নিলেন। এর ফলে রাইবোজাইমের বিপুল সংখ্যায় প্রতিলিপি সৃষ্টি হলেও কিছু কিছু ভুল অর্থাৎ নিউক্লিওটাইডের পর্যায়ক্রমের পরিবর্তন ঘটল। অর্থাৎ অপত্য রাইবোজাইমের মধ্যে বিভিন্ন ধরণের পরিব্যক্তি দেখা গেল।

এভাবে জয়েস নির্বাচন, বৃদ্ধি ও পরিব্যক্তির চক্রের পুনরাবৃত্তি করতে থাকলেন। সবচেয়ে কার্যকরী আর এন এ অনুগুলিকে পরবর্তী প্রজন্মের জনক হিসেবে ব্যবহার করা হল। এইভাবে দুবছরে সাতাশটি চক্রের সমাপ্তি ঘটালেন জয়েস। শুধু তাই নয় এই সাতাশটি চক্রের প্রতিটি প্রজন্মের আর এন এ বা রাইবোজাইমকে তিনি হিমায়িত করে সংরক্ষিত করে রেখেছেন। তার ফলে যে কোন প্রজন্মের আর এন এ-র সঙ্গে তার আগের বা পরের প্রজন্মের আর এন এ-র তুলনামূলক পর্যবেক্ষণ করা যেতে পারে যখন খুশি। অর্থাৎ বিবর্তনের পথটিকে স্পষ্টভাবে বোঝা এবং চিহ্নিত করা খুবই সহজ হল। A, G, C ও U এই চার রকমের বেস যুক্ত ৩৯৩টি নিউক্লিওটাইড (প্রতিটি নিউক্লিওটাইডেএকটি বেস, রাইবোজ সুগার ও ফসফেট থাকে) দিয়ে গঠিত। সংখ্যা বৃদ্ধি বা বংশবৃদ্ধির সময় কিছু কিছু নিউক্লিওটাইডের পরিবর্তন ঘটে (যেমন G এর বদলে A কিংবা C এর বদলে U)। এই ধরণের পরিব্যক্তির ফলে রাইবোজাইমের ক্রিয়ারও পরিবর্তন ঘটে। তার ফলে

জেরাল্ড জয়েস। সঙ্গে বরফে সংরক্ষিত সাতাশ প্রজন্মের রাইবোজাইম বা আর এন এ।

পরিব্যক্ত অনুগুলির মধ্যে ডারউইনের মতবাদ অনুযায়ী টিকে থাকার প্রতিযোগিতা চলে। যোগ্যতমই টিকে থাকে। রাইবোজাইমের ৩১৩ নম্বর নিউক্লিওট্রাইডের G এর জায়গায় U এবং ৩১৪ নম্বরের A এর জায়গায় G যুক্ত হলে ডি এন এ কাটার ক্ষমতা অনেক বৃদ্ধি পায়। যদি এই পরিবর্তন একটি নিউক্লিওটাইডের ক্ষেত্রে হয় তাহলে কিন্তু কোন সুবিধে হয় না। ৩১২ নম্বরে G এর বদলে A প্রতিস্থাপিত হলেও ডি এন এ কাটার ক্ষমতা কিছু বাড়ে। মজার কথা হল একই সঙ্গে ৩১৪ ও ৩১৩ নম্বরে পরিব্যক্তি এবং ৩১২ নম্বরে পরিব্যক্তি কখনই ঘটে না। বিবর্তনের সুরুতে ৩১২ নম্বরে পরিব্যক্তি প্রাধান্য পেয়েছিল। তারপর ৩১৩ ও ৩১৪ নম্বরে যুগ্ম পরিব্যক্তি প্রাধান্য পেল। অষ্টম প্রজন্মের প্রতিযোগিতায় ৩১২ নম্বরে পরিব্যক্ত আর এন এ সফল। কিন্তু সাতাশতম প্রজন্মে সে কিন্তু হেরে গেল। তার বদলে কেবলমাত্র ৩১৩ নম্বরে অন্যরকম পরিব্যক্তি ঘটল যার ফলে সেই থাকল এগিয়ে। বিবর্তনের পথে আজ যে জয়ী কাল সে পরাজিত। আজ যে পরাজিত সে চিরতরে হারিয়ে যেতে পারে। এর কারন পরিবেশের ক্রমশঃ পরিবর্তন। একটা কথা বলা দরকার নির্বাচন, বিবর্ধন (অর্থাৎ সংখ্যাবৃদ্ধি) এবং পরিব্যক্তি সম্বলিত সম্পূর্ণ চক্রটির সাতাশবার পুনরাবৃত্তির সময় প্রতিবারেই তার আগেরবারে যারা ছিল যোগ্যতম তাদের দিয়েই ডি এন এ কাটতে পারে এমন শক্তিশালী রাইবোজাইম পাওয়া গেল। এবার বুঝুন বায়োটেক কোম্পানীগুলি জয়েসের দিকে ঝাঁপিয়ে পড়বে না কেন ?

যে রাইবোজাইম দিয়ে জয়েস গবেষণা সুরু করেছিলেন বংশবৃদ্ধি বা সংখ্যাবৃদ্ধির জন্য তার দরকার ছিল দুটি প্রাইমার ও দুটি এনজাইম। একটি এনজাইম বাদ দিয়ে এটি সম্ভব কিনা সে সম্পর্কে তিনি পরীক্ষা সুরু করলেন। পরীক্ষা চলাকালে হঠাৎ একটি ছোট রাইবোজাইমের দেখা পেলেন। পরবর্তী প্রজন্মগুলিতে একটি কখনো একটু বড় বা কখনো একটু ছোট হতে থাকল। তাহলে কোন প্রাইমার ও এনজাইম ছাড়াই কি কোন রাইবোজাইমের বংশবৃদ্ধি সম্ভব ? তাহলে তো সেই রাইবোজাইম একটি জীবের মতোই কাজ করবে, জয়েসের বিবর্তিত অনু পুরোপুরি সজীব না হলেও বিবর্তনের পথে সে কিন্তু সেদিকেই এগিয়ে চলেছে।

ঝগড়াঝাটি

ত পো ম য় ঘো ষ

'হাইলা' নামক গেছো ব্যাঙকে
'পাইলা' নামক শামুক
ঝগড়া করে বললে রেগে,
'গাছ থেকে ও নামুক !"

'জানিস' বলে ধমক দিয়ে
'ক্যানিস' নামক কুকুর
নামলেই বা করবি কি তুই ?
তোর কি বাপের পুকুর ?

'হবেও' বলে ধান দিল যেই
হাওয়ায় আওয়াজ 'হুই'
'লেবিও' নামক রুই বলল
তোর কি বাপের ভুঁই ?"

চকচকে গাছপালা

দিবাকর সেন

আমাদের এই পৃথিবীতে প্রাণসৃষ্টির আদিযুগে জীবজগতের ধাত্রীভূমি ছিল প্রকৃতির গাছপালা। তাই প্রাচীনকালে গাছপালাকে উর্বরতার প্রতীক হিসেবে মনে করা হতো। ফলে হয়তো সভ্যতার ক্রমবিকাশের সঙ্গে তালে তাল রেখে মানুষ এই গাছগাছালির নানা বৈচিত্রও লক্ষ্য করতে শিখেছে।

আজ আমরা প্রকৃতির দিকে তাকালে দেখি বিশাল এই উদ্ভিদ জগতে কোন কোন গাছের পাতা বা কাণ্ড খসখসে। আবার অনেক গাছের পাতায় বা কাণ্ডে খুব চকচকে ভাব লক্ষ্য করা যায়। আপাতদৃষ্টিতে এইসব চকচকে ভাব দেখে মনে হতে পারে, প্রকৃতি যেন গাছগুলোতে চকচকে "ভার্ণিস" লাগিয়ে রেখেছে। এইসব গাছপালা সব পরিবেশেই দেখা যায়। তবে গাছের এই চকচকে ভাবের সম্পর্কে সঠিকভাবে আলোকপাত করতে গেলে প্রথমেই বলতে হয়, এই চকচকে ভাবটি বিশেষ এক রাসায়নিক উপাদানের উপস্থিতির জন্য হয়ে থাকে। এ ব্যাপারে অনুসন্ধান করতে গিয়ে বিজ্ঞানীরা দেখেছেন ধান, বার্লি, ভুট্টা পুঁই শাক ইত্যাদি আরোও নানা গাছপালার মধ্যে এই রাসায়নিক উপাদান বর্তমান রয়েছে। এই রাসায়নিক উপাদানটির নাম এপিকিউটিকুলার ওয়াক্সেস (Epicuticular Waxes)। পাতা বা কাণ্ডের একেবারে বাইরের ত্বকটিকে বলে কিউটিক্যাল (cuticule)। আর এই বর্হিত্বকের উপরেই রাসায়নিক পদার্থটি থাকে বলে বিজ্ঞানীরা এর নাম দিয়েছেন এপিকিউটিকুলার ওয়াক্সেস। এ প্রসঙ্গে একটি কথা এখানে বলা প্রয়োজন। তা হলো, উদ্ভিদের উপরিতলে যে চকচকে ওয়াক্স বা মোমজাতীয় পদার্থ তৈরী হয় নির্দিষ্ট উৎসেচকের উপস্থিতিতে ষ্টিরিওস্পেসিফিক বিক্রিয়ায় উচ্চ আণবিক ভরসম্পন্ন পলিহাইড্রিক অ্যালকোহল ও ফ্যাটি এসিডের মিশ্রণে।

জীবজগতে বেঁচে থাকার সাধারণ শর্ত হ'ল নিজের অস্থিত্বকে টিকিয়ে রাখার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করা।

প্রকৃতিতে বিভিন্ন ধরণের কিছু কিছু ছত্রাক আছে যা বিভিন্ন গাছে বসে গাছের ক্ষতি করে থাকে। কিন্তু যেসব গাছে এই এপিকিউটিকুলার ওয়াক্সেস বর্তমান থাকে, সে সব গাছে ছত্রাকগুলো সহজে পাতা বা কাণ্ডের ক্ষতি করতে পারে না। বিজ্ঞানীরা পরীক্ষা করে দেখেছেন মোমযুক্ত ত্বক বা চকচকে ত্বকে এপিকিউটিকুলার ওয়াক্সেস থাকার ফলে গাছের প্রস্বেদন নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে। দৃষ্টিনন্দন শাপলা গাছ জলে জন্মায়। শাপলা পাতা জলে ভাসে। শাপলা পাতায় জল দাঁড়ায় না। পদ্ম পাতায় ও জল দাঁড়ায় না। যদি জল দাঁড়াত তা হ'লে এ জাতীয় গাছের পাতা শুকনো চকচকে দেখা যেত না। কারণ গাছগুলোর মূল ও কাণ্ড থাকে জলের নীচে। পাতার বিপরীত দিকও জলে ভাসে। ডাঙ্গার কচু পাতায়ও জল পিছলে পড়তে দেখা যায়। এ ব্যাপারটি সম্ভব হয় গাছগুলোতে এপিকিউটিকুলার ওয়াক্সেস থাকার ফলে। তাছাড়া গাছের এই চকচকে ভাব ঝোড়ো বাতাসজনিত ক্ষয় থেকেও গাছকে রক্ষা করে থাকে। এইসব চকচকে গাছগুলোতে স্বাভাবিক কারণেই ধুলোবালির আস্তরণ বেশি জমতে পারে না। ফলে গাছগুলোর পক্ষে সূর্যালোক থেকে বাধাহীনভাবে সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়া চালাতে সুবিধে হয়। তাছাড়া গাছগুলোতে চকচকে ভাব থাকার ফলে গাছ সূর্যের প্রখর আলো ও তাপকে প্রতিফলিত করার একটি স্বাভাবিক ক্ষমতা রাখে। ফলে অন্যান্য গাছের তুলনায় এইসব গাছের নীচের ছায়া সুশীতল হয়ে থাকে। গাছের পাতাও সহজে শুকনো হয়ে ঝড়ে পড়ে না।

আর্কিমিডিস

শংকর চক্রবর্তী

আজ থেকে আড়াই হাজার বছর আগেকার কথা। ইয়োরোপের গ্রীস দেশে জ্ঞান বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এক আশ্চর্য বিকাশ ঘটে। সে বিকাশ ঘটেছিল বহু মণীষির অবদানের মধ্য দিয়ে।

দর্শনের ক্ষেত্রে আমরা পাই সক্রেটিস, প্লেটো এবং অ্যারিষ্টটলকে। বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে যে কয়েকটি নাম সে যুগে উজ্জ্বলভাবে ভেসে ওঠে, তাঁদের মধ্যে ছিলেন থেলিস, পিথাগোরাস, ডেমক্রিটাস, ইবাটস্থেনিস, অ্যারিষ্টার্কাস ও আরো অনেকে। গ্রীসের রাজধানী এথেন্স শহর হয়ে উঠেছিল তখনকার পৃথিবীর জ্ঞান বিজ্ঞান চর্চার এক শ্রেষ্ঠ কেন্দ্র।

এই এথেন্সেই আবার এমন একদল পণ্ডিতের সংখ্যা ক্রমেই বেড়ে উঠছিল, যারা ছিল পরীক্ষামূলক বিজ্ঞানের বিরোধী। অংকের সাহায্যে কোন বস্তুর পরিমাপ করার কাজ তাদের মতে দোকানদার ও ছুতোরদের জন্যেই নির্দিষ্ট থাকা উচিত।

এদিকে আফ্রিকা ভূখণ্ডে তখন আলেকজান্দ্রিয়া শহরের পত্তন হয়েছে। ঐ নগরীর স্থপতি এথেন্সের নতুন চিন্তার ধারক ও বাহকদের কাছে শহরের নাগরিকত্ব গ্রহণের জন্য সাদর আমন্ত্রণ জানালেন। নতুন একদল মানুষের জ্ঞানচর্চার কেন্দ্র হয়ে দাঁড়াল আলেকজান্দ্রিয়া।

এই আলেকজান্দ্রিয়াতেই আমরা পরিচিত হই জ্যামিতি বিদ্যার জনক ইউক্লিডের সঙ্গে। ইউক্লিডের ছাত্র সেনন। সেননের ছাত্র আমাদের আলোচনার নায়ক আর্কিমিডিস।

ইয়োরোপের ইটালী দেশের দক্ষিণে সিসিলি দ্বীপ। সিসিলির সিরাকিউজ শহরে খ্রীষ্টপূর্ব ২৮৭ সালে আর্কিমিডিসের জন্ম। সিরাকিউজ ছিল সে যুগের গ্রীক সভ্যতারই আর একটি বড় কেন্দ্র।

আর্কিমিডিসের বাবা ফিডিয়াস ছিলেন একজন জ্যোতির্বিদ। সিরাকিউজের রাজ পরিবারের সঙ্গে সম্ভবত আর্কিমিডিস বংশের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল।

আর্কিমিডিস অংকবিজ্ঞানের ছাত্র হয়ে এলেন আলেকজান্দ্রিয়ার মিউজিয়ামে। সেখানে ইউক্লিডের জ্যামিতি ও গণিতের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ঘটল।

পথের সন্ধানে

আর্কিমিডিস অংকবিজ্ঞানের চর্চা ও গবেষণার মধ্যেই নিজেকে পুরোপুরিভাবে নিয়োগ করতে চেয়েছিলেন। এ ব্যাপারে ইউক্লিডকেই তিনি আদর্শ মেনেছিলেন। ইউক্লিডের বক্তব্য ছিল — "জ্ঞানের জন্যেই জ্ঞানচর্চা। বৈজ্ঞানিক গবেষণার ব্যবহারিক প্রয়োগ — ও নিয়ে বিজ্ঞানীর মাথা ঘামাবার প্রয়োজন নেই।

এ প্রসঙ্গে একটি কাহিনী প্রচলিত আছে। একবার ইউক্লিডের একটি ছাত্র জ্যামিতির প্রথম উপপাদ্যটি শেখার পর তাঁকে প্রশ্ন করে — "শ্রদ্ধেয় মহাশয়, জ্যামিতি শেখার ব্যবহারিক সুবিধাটা কি ?" ইউক্লিড তখন তাঁর ভৃত্যকে ডেকে বললেন, "গ্রুমিন, এই শ্রীমানকে একটি ডলার দিয়ে দাও তো। ও টাকা ছাড়া কিছু শিখতে পারে না।"

আর্কিমিডিস আলেকজান্দ্রিয়াতে ছাত্রজীবন শেষ করে ফিরে এলেন সিরাকিউজে। একজন দার্শনিক ও অংকবিদরূপে নিজেকে গড়ে তোলার কাজ শুরু করতে চাইলেন তিনি। কিন্তু আর্কিমিডিসের এই আকাংখা পূরণ হল না। সিরাকিউজের রাজা হিয়েরোর যেমন তিনি ছিলেন একজন প্রজা, তেমনি সভাসদ ও ব্যক্তিগত বন্ধুও বটে।

বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার

রাজা হিয়েরোর নির্দেশে আর্কিমিডিসকে প্রযুক্তি বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে নানাবিধ আবিষ্কারের কাজে হাত দিতে হল। প্রায় চল্লিশটির মত আবিষ্কার তিনি করেছিলেন।

এদের মধ্যে কয়েকটির ছিল ব্যবহারিক উপযোগিতা। কিন্তু বেশির ভাগেরই উপযোগিতা ছিল যুদ্ধাস্ত্ররূপে।

আর্কিমিডিসের সবচেয়ে চকমপ্রদ ব্যবহারিক আবিষ্কারটি হল 'আর্কিমিডিসের স্ক্রু'। যন্ত্রটির নকসাটা হল এরকম — এক আনত তলের ওপর একটি ফাঁপা কর্কস্ক্রু বসানো আছে 'যার একটি প্রান্তভাগ একপাত্র জলে ডোবানো।'

কর্ক -স্ক্রুর কুণ্ডলিটিকে বাঁ দিক থেকে ডান দিকে ঘোরালেই নীচ থেকে জল সরাসরি ওর মধ্য দিয়ে ওপরে উঠে এসে ফোয়ারার মত ছড়িয়ে যায়। এই স্ক্রুর সাহায্যে সে যুগে জমিতে সেচ কাজের বিশেষ সুবিধে হয়েছিল। খনি থেকে জল তোলা এবং জাহাজের খোলের ভেতর থেকে জল বাইরে বার করার ব্যাপারেও এই স্ক্রুর এককালে ব্যাপক প্রচলন ছিল।

আর্কিমিডিসের সূত্র

আর্কিমিডিসের সূত্র হল বিজ্ঞানীর এমন একটি আবিষ্কার, যা থেকে পদার্থের আপেক্ষিক গুরুত্বের ধারণা আমরা অর্জন করতে পেরেছি। আর্কিমিডিসের এই আবিষ্কারটির সঙ্গে একটি গল্প প্রচলিত রয়েছে, যার যাথার্থ্য নিয়ে বিশেষজ্ঞদের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে আজও।

সিরাকিউজরাজ হিয়েরো একবার একটি স্বর্ণমুকুট তৈরি করান। কিন্তু তাঁর সন্দেহ হয় যে স্বর্ণকার সোনার মুকুটের সঙ্গে রূপোর খাদ মিশিয়েছে। মুকুটটিকে না ভেঙ্গে, যথার্থই খাদ মেশানো হয়েছে কিনা, তা জানার জন্যে তিনি আর্কিমিডিসের পরামর্শ চেয়ে পাঠান। এক বিরাট সমস্যার মুখোমুখি হলেন আর্কিমিডিস। মুকুটটিকে না গলিয়ে সমস্যার সমাধান কিভাবে সম্ভবপর হতে পারে।

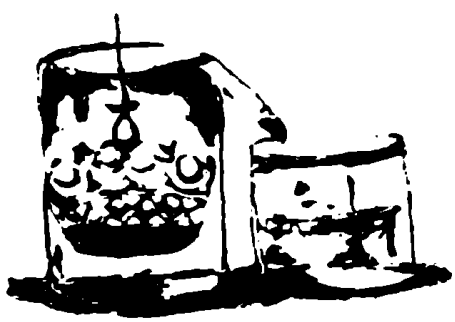

মুকুটের বিশুদ্ধতা পরীক্ষা।

আর্কিমিডিস একদিন কানায় কানায় জলপূর্ণ স্নানের টবে নাবতে গিয়ে লক্ষ্য করলেন, খানিকটা জল উপচে পড়ল। তক্ষুণি মাথায় এল, উপচে পড়া জলের আয়তন যদি মাপা যায়, দেখা যাবে, তার শরীরের জলে নিমজ্জিত অংশের আয়তনের সমান হবে তা।

আর্কিমিডিস এবারে সোনার মুকুটটির সমান ওজনের একখণ্ড খাটি সোনা নিলেন। সোনার মুকুটটি যদি নিখাদ সোনার তৈরি হয়, তাহলে তার আয়তন স্বর্ণখণ্ডটির আয়তনের সমান হবেই। এবারে তিনি সোনার মুকুটটিকে কানায় কানায় ভর্তি একপাত্র জলের মধ্যে ডোবালেন। যে পরিমাণ জল উপচে পড়ল, তার আয়তন মাপা হল, দেখা গেল, এ সোনার মুকুটটির আয়তনের সমান।

একই পরীক্ষা করা হল স্বর্ণ খণ্ডটিকে নিয়ে। জলপূর্ণ পাত্র থেকে যে পরিমাণ জল এবারে উপচে পড়ল, তার আয়তনও স্বর্ণ খণ্ডটির আয়তনের সমান হতে দেখা গেল। দুটি পরীক্ষায় উপচে পড়া জলের আয়তনের মাপের মধ্যে তফাৎ পাওয়া গেল। এমনটা হবার কথা ছিল না, যদি সোনার মুকুটটি খাটি সোনা দিয়ে তৈরি করা হত।

আর্কিমিডিস তাঁর পরীক্ষালব্ধ সিদ্ধান্তের কথা সিরাকিউজরাজকে জানাবার পর প্রতারক স্বর্ণকারের পরিণতি কি হয়েছিল, তা আমরা সহজেই অনুমান করতে পারি।

তার এই পরীক্ষা থেকে আর্কিমিডিস একটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তেও পৌছতে পেরেছিলেন। তা হল এই, একটি বস্তুকে যদি আংশিক বা পরিপূর্ণভাবে কোন তরল পদার্থের মধ্যে ডোবানো যায়, তাহলে সেই বস্তুর ওজন কমে আসে। এই ওজন কমার পরিমাণ হল, যে পরিমাণ তরল পদার্থকে বস্তুটি অপসারিত করছে, তার ওজনের সমান। এটিই হল 'আর্কিমিডিসের সূত্র'।

জাহাজ যে জলে ভেসে থাকে, তার কারণ হল, জলের উর্ধমুখী ঘাত আর জাহাজের নিমজ্জিত অংশের ওজন –

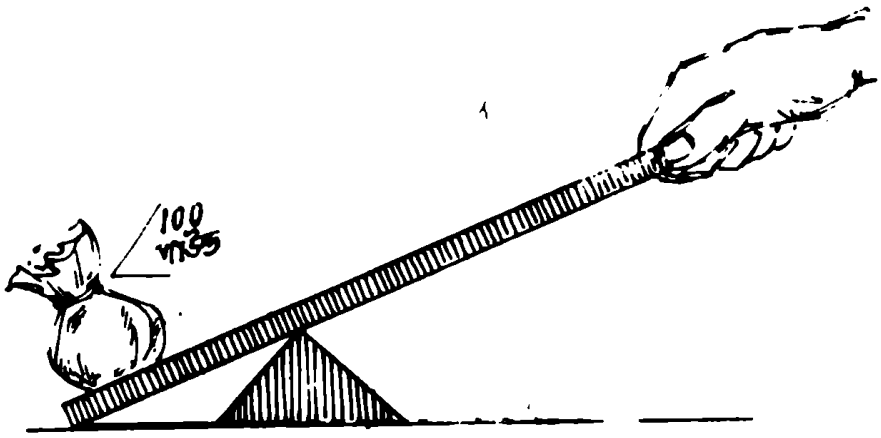

লিভারের নীতি অনুসরণ করে পাঁচফুট দণ্ডের সাহায্যে ১০০ পাউণ্ডের ভর তোলা হচ্ছে।

এরা পরস্পরের সমান। জলের এই উর্ধমুখী ঘাতকেই আমরা বলি প্লবতা।

আরো কিছু আবিষ্কার

এছাড়াও আর্কিমিডিস লিভারের ব্যবহারের আংকিক সূত্র উদ্ভাবন করেছিলেন। মানুষ যখন হাতের সাহায্যে লোহার একটি ভারী জিনিষকে তুলতে অক্ষম হচ্ছে, তখন লিভাররূপী দণ্ডের সাহায্যে সে কাজটা অনায়াসেই করতে পারছে।

ঠাট্টা নয়, যথেষ্ট গুরুত্বের সঙ্গেই আর্কিমিডিস বলেছিলেন, "পৃথিবীর বাইরে দাঁড়াবার মত কোন জায়গা যদি পেতাম, তাহলে গোটা পৃথিবীটাকেই আমি নড়াতে পারতাম।

আর্কিমিডিসের অন্যান্য তাত্ত্বিক কাজের মধ্যে ছিল একটি বৃত্তের সঙ্গে তার পরিধির মাপের আনুপাতিক সম্পর্ক, বৃত্তাকার এবং বর্তুলাকৃতি বস্তুদের আয়তন ও ক্ষেত্রফল নির্ণয়ের সূত্রের আবিষ্কার।

এছাড়া একই ব্যাসবিশিষ্ট একটি গোলক এবং বেলন (সিলিণ্ডার) তৈরি করে বেলনের মধ্যে গোলকটিকে বসিয়ে তিনি প্রমাণ করেছিলেন যে, এদের আয়তনের অনুপাত হল ২ ঃ ৩। আর্কিমিডিস এই কাজটিকে তাঁর জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার হিসেবে গণ্য করেছিলেন।

সাগরের বেলাভূমিতে মোট বালুকণার সংখ্যা নির্ণয়ের একটি পদ্ধতির উদ্ভাবন — এও ছিল আর্কিমিডিসের আর একটি বিস্ময়জনক কাজ। আধুনিক অংকপাতন পদ্ধতি এবং শূন্যের আবিষ্কার তখনো ঘটে নি। বড় মাপের একটি সংখ্যা প্রকাশ করার কাজটি ছিল তাই খুবই জটিল। গ্রীকরাও এই সমস্যা থেকে মুক্ত ছিল না। এই সীমাবদ্ধতা সম্বন্ধে আর্কিমিডিস খুবই সচেতন ছিলেন। তৎসত্ত্বেও তিনি বলছেন, "কেউ কেউ মনে করেন, বালুকণারা অগণিত ও অসংখ্য। শুধু সিসিলি ও সিরাকিউজে নয়, গোটা পৃথিবী এবং ব্রহ্মাণ্ডকে বালুরাশির দ্বারা ভরাট করতে হলে যত বালুকণা প্রয়োজন, তার থেকেও বৃহত্তর সংখ্যার ধারণা আমি করতে পেরেছি এবং তার আংকিক সূত্রও উদ্ভাবন করেছি।" একথা বলার অধিকার সেযুগে একমাত্র আর্কিমিডিসেরই ছিল।

যুদ্ধাস্ত্রের উদ্ভাবক

আর্কিমিডিসের আবিষ্কারের মধ্যে ব্যবহারিক উপাদানগুলোর তুলনায় তাঁর যুদ্ধাস্ত্রগুলো ছিল অনেক বেশি বিস্ময়জনক।

রোমান সেনাপতি মার্সেলাস তিন বছর সিরাকিউজকে অবরুদ্ধ করে রেখেও জয় করতে পারেন নি। এর মূলে ছিল আর্কিমিডিসের বৈজ্ঞানিক প্রতিভা। রাজা হিয়েরোর অনুরোধে তিনি আবিষ্কার করেন পাথর ছোড়ার ক্যাটাপুল্ট্ যন্ত্র। এই যন্ত্রটিকে দুর্গের প্রাচীরের ওপর বসিয়ে ছিদ্রপথ দিয়ে বাইরের দিকে প্রসারিত করা হত এবং ভেতর থেকে লিভারের সাহায্যে চালনা করে রীতিমত ভারী সব প্রস্তর খণ্ড শত্রুর উদ্দেশ্যে বিভিন্ন দূরত্বে ছোঁড়া যেত।

আর্কিমিডিসের এইসব রণকৌশলের বিরুদ্ধে আতঙ্কে হতবুদ্ধি হয়ে রোমান সেনাবাহিনী অনেকবারই সিরাকিউজের অবরোধ পরিত্যাগ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল।

আর্কিমিডিস সাগরের উপকূলে বড় বড় আয়নার সারি বসিয়ে সূর্যের শক্তিকে জোরালোভাবে কেন্দ্রীভূত করে রোমান নৌবাহিনীর জাহাজগুলিকে নাকি জ্বালিয়ে দিয়েছিলেন, এই মর্মে যে কাহিনী প্রচলিত আছে, তা অতিরঞ্জিত বলেই ধারণা। তাঁর কোন প্রামাণ্য জীবনীকারের গ্রন্থে এই ঘটনার উল্লেখ নেই।

বিজ্ঞানী আইজাক নিউটন অবশ্য বলেছিলেন, ঘটনাটা বাস্তবে রূপায়িত করা একেবারে অসম্ভব নয়।

আর্কিমিডিসের মৃত্যু

রোমান সেনাবাহিনীর দ্বারা দীর্ঘ তিন বছর অবরোধের পর সিরাকিউজের পতন ঘটে খ্রীষ্টপূর্ব ২১২ সালে। পতনের পর সিরাকিউজ শহরটি জুড়ে যে বিশৃঙ্খলা ও হত্যাকাণ্ড শুরু হয়, তাতে আর্কিমিডিস এক রোমক সৈন্যের হাতে নিহত হন, কিন্তু রোমান সেনাপতি মার্সেলিউস তাঁর সৈন্যদের নির্দেশ দিয়েছিলেন, আর্কমিডিসের যেন কোন শারীরিক ক্ষতিসাধন না করা হয়। এই অনন্য সাধারণ জ্যামিতিবিদ বিজ্ঞানীকে তিনি সম্মানিত অতিথির মর্য্যাদা দিতে চেয়েছিলেন।

আর্কিমিডিসের মৃত্যুর সঠিক বিবরণ পাওয়া যায় নি। কারো মতে, রোমান সেনাপতি মার্সেলিউসের কাছে তাঁকে যখন অবিলম্বে যেতে বলা হয়, তখন তিনি নাকি বলেন, তাঁর আরব্ধ জ্যামিতিক অংকনের কাজ শেষ না করে তিনি উঠবেন না। এই মনোভাব প্রকাশ করায় একটি রোমক সৈন্য তাঁকে হত্যা করে।

আবার আর একটি মত হল, সিরাকিউজ পতনের সংবাদ পাওয়ার পর আর্কিমিডিস মার্সেলিউসের কাছে তাঁর উদ্ভাবিত সূর্যবলয়, গোলক, কোণ – নির্দেশক যন্ত্রাদি বয়ে নিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি লুকিয়ে সোনা নিয়ে যাচ্ছেন, এই সন্দেহে পথে কোন রোমান সৈনিক তাঁকে হত্যা করে।

তবে বেশিরভাগ বিশেষজ্ঞের মত হল —

সিরাকিউজ শহরে রোমান সেনাবাহিনী যখন প্রবেশ করে, আর্কিমিডিস তখন নগরের এক প্রান্তভাগে বসে বালুর ওপর একটি জ্যামিতিক রেখাচিত্র আঁকছিলেন। সৈনিকেরা তাঁকে পথ ছাড়ার নির্দেশ দেয়। আর্কিমিডিস তাদের অনুরোধ করেন, তাঁর জ্যামিতিক ছকটা শেষ করার মত সময় যেন ওরা দেয় এবং ছকটাকে যেন মুছে না ফেলে। তাঁর এই বক্তব্য ঔদ্ধত্যপূর্ণ মনে হওয়ায় রোমান সৈনিকেরা তাকে হত্যা করে।

রোমান সেনাপতি মার্সেলিউস অবশ্য যথাযোগ্য মর্য্যাদার সঙ্গে আর্কিমিডিসকে কবরস্থ করার ব্যবস্থা করেন। তিনি আর্কিমিডিসের সমাধি ফলকের ওপর বিজ্ঞানীর বিচারে তার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কারের আংকিক সূত্রটিকে খোদাই করে দেন।

আর্কিমিডিসের জীবন থেকে আমরা দেখি, দু'হাজার বছর আগেও দেশ রক্ষার ব্যাপারে রাষ্ট্র শাসকেরা বিজ্ঞানীর শরণাপন্ন হয়েছেন অথবা বিজ্ঞানী স্বেচ্ছায় তাঁর বিদ্যা ও অভিজ্ঞতা বিপদের সময় দেশের সেবায় নিয়োজিত করেছেন।

আর্কিমিডিস জ্যামিতি বিদ্যাসংক্রান্ত বহু বই লিখেছিলেন। কিন্তু তাঁর সমগ্র বৈজ্ঞানিক রচনা প্রবহমান কালস্রোতে হারিয়ে যায়। আরব দেশের পণ্ডিতেরা তাঁর রচনাবলীকে উদ্ধার করেন খ্রীষ্টীয় অষ্টম ও নবম শতাব্দীতে। এদের মাধ্যমেই আবার ইয়োরোপীয় পণ্ডিতেরা আর্কিমিডিসের বৈজ্ঞানিক অবদানের সঙ্গে পরিচিত হন। এর জন্যে আরব পণ্ডিতদের কাছে আমরা বিশেষভাবে ঋণী।

কলাগাছের জীবনকথা

ক ম ল চ ক্র ব র্তী

কলা খেতে ভাল লাগে। সবার ভাল লাগে কিনা জানি না, তবে আমার লাগে। কলা আবার দু'রকম — পাকাকলা আর কাঁচাকলা। পাকাকলা নানা নামের এবং জাতেরও। কেউ চাঁপা, কেউ কাঁঠালী, কেউ মর্তমান, কেউ সিঙ্গাপুরী এইসব নাম নিয়ে বাজারে বিক্রি হচ্ছে। আমি এর মধ্যে কাঁঠালী আর মর্তমানকেই বেশি পছন্দ করি। সহজে পাওয়া যায়, পুষ্টিকর অথচ দাম নাগালের মধ্যে এমন কিছু কিছু ফলের মধ্যে একটি অবশ্যই কলা। বিভিন্ন পাকা কলার মধ্যে কোন্ জাতের কলা বেশি পুষ্টিকর তা বিচার করা সবসময় ঠিক নয়। তবে মোটামুটিভাবে সব কলারই পুষ্টিগুণ প্রায় একই রকম। দামে সস্তা, মাপে বড় এমন টাটকা সতেজ কলা কেনাই বুদ্ধিমানের কাজ হবে। তবে রুচির ব্যাপারটাকে প্রাধান্য দিতে হবে। কারো কারো মতে চাঁপাকলা থেকে অম্ল হয় বেশি। হয়ত হয়, কিন্তু সেটা অনেকটা মানসিক। কারো কারো আবার সিঙ্গাপুরী কলা খেলেও অম্ল হয়। কিন্তু অম্ল বা অম্বল হবার অভিযোগ কম দেখা যায় মর্তমান আর কাঁঠালী কলার ক্ষেত্রে।

অনেকের মতে কলা খেলে নাকি ঠাণ্ডা লাগে। ফলটি শ্লেষ্মাবর্দ্ধক। কিন্তু এর কোন বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নেই। তবে ফ্রিজ থেকে বের করে তখনই কলা খাওয়া ঠিক নয়, তাতে ঠাণ্ডা লাগতে পারে। তা কলার ক্ষেত্রে কেন যে কোন খাদ্যের ক্ষেত্রেই তা ঘটতে পারে। যাদের কলায় অ্যালার্জি আছে, তাঁদের কলা খাওয়া ঠিক নয়। যার যে খাদ্যে অ্যালার্জি দেখা যায়, তার সেই খাদ্য না খাওয়াই উচিত। কেউ কেউ বলেন, কলা খেলে কৃমি হয়, এ ধারণাটাও ঠিক নয়।

কলা ফল হিসেবে সুস্বাদু এবং পুষ্টিকর। নানান জাতের যেসব কলা আছে, সেগুলির মধ্যে কয়েকজাতের কলা পশ্চিমবঙ্গে জন্মায়। বাকী জাতের কলা অন্যরাজ্য থেকে আমদানী করা হয়। কলাগাছ ভারতেই প্রথম দেখা যায়। পরে তা নানাদেশে ছড়িয়ে পড়ে। সাধারণতঃ উষ্ণ এবং নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলে কলাগাছ জন্মায়। ভারত ছাড়া মেক্সিকো, পানামা, ব্রাজিল, কলম্বো, আফ্রিকার বিভিন্ন অঞ্চল থাইল্যাণ্ড এবং ভিয়েতনামে কলার চাষ হয়। এখন দেখা যাক ভারতের কোন্ কোন্ রাজ্যে কলার চাষ হয়। মূলত পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, বিহার, উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, তামিলনাড়ু, মহারাষ্ট্র, অন্ধ্রপ্রদেশ, কেরালা, কর্ণাটক, গুজরাট প্রভৃতি রাজ্যে কলার চাষ হয়। উষ্ণ এবং নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলে কলা চাষ করা হয়। তবে বেশি উষ্ণ অঞ্চলে চাষ ভাল হয় না। তাই যেসব অঞ্চলে উষ্ণভাব বেশিদিন স্থায়ী নয়, সে সব স্থানে কলাচাষ ভাল হয়। বৃষ্টিপাতও মোটামুটি হওয়া চাই। কলাগাছ একবার মাত্র ফল দেয়। তাই এর আর এক নাম ওষধি। বন্যায় এবং ঝড়ে কলা গাছের খুব ক্ষতি হয়। কলা কাটার সঙ্গে সঙ্গে ঐ গাছের গোড়া তুলে ফেলতে হয় নতুবা গোড়াপচে সমস্ত কলাগাছের ঝাড় নষ্ট হয়ে যায়। পশ্চিমবঙ্গের বহু অঞ্চলের উষ্ণতা সাধারণতঃ 20-30°C এর মধ্যেই থাকে বছরের বেশির ভাগ সময়ে। এই উষ্ণতার মধ্যে কলার চাষ ভাল হয়। 20°C এর নিচে এবং 35°C এর উপরে কলার উৎপাদন কমে যায়। কাদামাটি বা বালিমাটিতে চাষ ভালই হয়। উর্বর এবং ক্ষার মাটিতে ভাল ফল হয়। মাটির লবণাক্ততা কলার আকার এবং সুগন্ধ বাড়ায়। পলিযুক্ত দোঁয়াশমাটিতে চাষ ভাল হয়।

কলার বৈজ্ঞানিক নাম মিউসা। কলাগাছের বিভিন্ন প্রজাতি আছে। ব্যাপক চাষ হয় কেরালা, কর্ণাটক, তামিলনাড়ু এবং মহারাষ্ট্রে। উন্নত মানের গাছে নিষেক ছাড়াই গর্ভাশয় পরিপক্ক এবং পরিণত হয়। উৎপন্ন ফলে বীজ থাকে না। ফলটি রসাল। শাখাবিহীন বীরুৎ, লম্বা পাতা। ভারতের কয়েকটি বিশেষ প্রজাতি হলো —

(i) মিউসা আকুসিনাটা। এগুলি তিন আকারের হয়। লম্বা, মাঝারি এবং ছোট। (ii) মিউসা বালবিসিয়ানা। আসাম এবং সিকিম অঞ্চলে এর ফলন বেশি। মোচা আর কাঁচাকলা হিসেবে এর সমাদর। (iii) মিউসা প্যারাডাইসিয়াকা। আগের দুটি প্রজাতির মিশ্রণে তৈরী এক সংকর প্রজাতি। চাঁপা, সবরি, মর্তমান প্রভৃতি এর উদাহরণ।

কলা গাছের ফলন কিভাবে হবে? এর জন্য চাই কর্ষিত মাটি। কলাগাছ লাগানোর কয়েকদিন আগে গর্ত খুঁড়ে সেই গর্তে মাটির সঙ্গে গোবর সার, সুপার ফসফেট উপযুক্ত পরিমাণে মিশিয়ে মিশ্রণটি দিতে হবে। মাটি ভালভাবে তৈরি হলে গর্তের মাঝামাঝি চারাগাছ পুঁতে দিতে হবে। এরপর মাঝেমধ্যে প্রয়োজনমত জলও দিতে হবে। বর্ষাকালে নতুন গাছ (যাকে তেউড় বলে) লাগানো হয়। বর্ষার সঙ্গে সঙ্গে গাছের গোড়া থেকে নতুন গাছের মুখ দেখা যায়। সারের ওপরেই নির্ভর করে ভালভাবে বেড়ে ওঠা। কলাচাষের জন্য প্রয়োজন জৈবসার। জৈবসার বলতে বোঝায় কম্পোষ্ট সার, পচা গোবর, পচা গাছপালা ইত্যাদি। তবে অজৈব সারেররও প্রয়োজন হয় মাঝে মধ্যে। নাইট্রোজেন, ফসফরাস এবং পটাসিয়াম এই তিন মৌলের সার উপযুক্ত পরিমাণে ব্যবহার করা হয়। নদীর পলিমাটি এবং পুকুরের পাঁক জমিতে মেশালে ফসল ভাল হয়। চারাগাছ লাগিয়ে হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকলে চলবে না, কিছুটা দেখা শোনাও করতে হবে মাঝে মধ্যে। তার জন্য অতিরিক্ত চারাগাছকে তুলে ফেলতে হবে। একটি প্রধানগাছ থেকে বেশ কয়েকটি তেউড় বেরতে পারে। কয়েকমাস পরে গাছে ফুল ফুটতে শুরু করে। কলাফুলকে মোচা বলে। এর থেকে ফল বেরয়।

যে সব কলাগাছে অল্প সময়ের মধ্যে ফলন দেখা দেয়, সে সব গাছে ছ'মাসের মধ্যে ফুল ফোটা শুরু হয়। সেই ফুল থেকে ফল হয় এবং পাকতে সময় নেয় আর প্রায় তিন মাস। যে সব গাছে ফলন দেরীতে হয় সে সব গাছে কলা পুষ্ট হতে সময় লাগে একটি বছর বা তার বেশি। কলা পাকার ঠিক আগেই কলার কাঁন্দকে গাছ থেকে কেটে আনা হয়। ব্যবসা বাণিজ্যের ক্ষেত্রে পাকা কলা ব্যবহার করা যায় না। গাছ থেকে কলা কেটে আনার পর তা পাকানো হয়, এবং তা করার নানা উপায় আছে। একটি উপায় হচ্ছে – কলার কাঁন্দকে সবুজ পাতায় জড়িয়ে খড়ের গাদায় রেখে সূর্যের তাপ দেওয়া। দুই থেকে তিনদিনের মধ্যে কলা পেকে যায়। আজকাল কার্বাইড বা ইথিলিন গ্যাস দিয়েও কলা পাকানো হয়। কাঁচা অবস্থায় কলার রঙ সবুজ থাকে এবং পাকলে তার রঙ হলুদ বর্ণের হয়। ব্যতিক্রম হল সিঙ্গাপুরী কলা। পাকলেও এর রঙ খুব একটা বদলায় না। তবে বেশি গরমে এর রঙ কিছুটা হলুদ হয়। সবুজ পাকাকলা চেনা যায় তার গন্ধ থেকে। কলা দূরে কোথাও পাঠাতে হলে কলার কাঁন্দকে পলিথিন ব্যাগে পুরে কম উষ্ণতায় রাখতে হয়।

কলার ব্যবহার নানাভাবে হয়। পূজোপার্বনে – নানা অনুষ্ঠানে কলা এবং কলাগাছ দুয়েরই খুব প্রয়োজন। কাঁঠালী কলা এদিক দিয়ে এক ধাপ এগিয়ে। এই কলা বেশ মিষ্টি এবং এর স্বাদে এক বৈচিত্র্য আছে। কলার ফুল বা মোচার কথা আগেই বলা হয়েছে। মোচা একটি উৎকৃষ্ট খাদ্য, অবশ্য ঠিকভাবে তা রান্না করতে হবে। মোচার ঘন্ট, মোচার চপ যে কি সুস্বাদের খাদ্য, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। মোচা আবার এক ভেষজ ওষুধও বটে। কাঁচকলা বা কাঁচাকলা সব্জী হিসেবে ব্যবহৃত হয়। এই কলা পেটের পক্ষে ভাল। অনেকে বলেন, গ্যাস্ট্রিক ক্ষতে কাঁচকলা উপকারী। কাঁচকলা শুকিয়ে তাকে গুঁড়ো করে চকোলেট এবং বিস্কুটে ব্যবহার করা হয়। ক্যালরি মানের দিক দিয়ে কাঁচাকলা আর পাকাকলার খাদ্যগুণ এক নয়। কাঁচাকলার প্রতি ১০০ গ্রামে যেখানে ৬৪-৬৫ ক্যালরি খাদ্যগুণ, সেখানে পাকা কলার খাদ্যগুণ প্রায় দ্বিগুণ অর্থাৎ ১১৫-১২০ ক্যালরি। কাঁচকলায় কার্বহাইড্রেটের পরিমাণ যেখানে ১৪ গ্রাম, পাকাকলায় সেখানে প্রায় ২৪ গ্রাম, অর্থাৎ দ্বিগুণ। ভিটামিন সি-এর

অনেকের মতে কলা খেলে নাকি ঠাণ্ডা লাগে। ফলটি শ্লেষ্মাবর্দ্ধক। কিন্তু এর কোন বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নেই। তবে ফ্রিজ থেকে বের করে তখনই কলা খাওয়া ঠিক নয়, তাতে ঠাণ্ডা লাগতে পারে। তা কলার ক্ষেত্রে কেন যে কোন খাদ্যের ক্ষেত্রেই তা ঘটতে পারে। যাদের কলায় অ্যালার্জি আছে, তাঁদের কলা খাওয়া ঠিক নয়। যার যে খাদ্যে অ্যালার্জি দেখা যায়, তার সেই খাদ্য না খাওয়াই উচিত। কেউ কেউ বলেন, কলা খেলে কৃমি হয়, এ ধারণাটাও ঠিক নয়।

পরিমাণ কাঁচকলায় বেশি, কাঁচকলায় ২৪ মিলিগ্রাম, পাকাকলায় ৮ মিলিগ্রাম। পাকাকলার যে বিশেষ মিষ্টি গন্ধ তার মূলে আছে রাইবোফ্লাভিন। কাঁচাকলায় এটি যে পরিমাণ থাকে, পাকাকলায় থাকে তার ৪ গুণ। কলাগাছ গরু, মোষ, হাতি প্রভৃতির প্রিয় খাদ্য। কলাগাছের পাতা ডাঁটা শুকিয়ে গেলে জ্বালানী হিসেবে কাজে আসে। কলায় বিভিন্ন ধরনের ধাতব মৌল থাকে। সব থেকে বেশি থাকে ম্যাগনেসিয়াম, তারপরে সোডিয়াম এবং তারপরে পটাসিয়ামের স্থান। অল্প পরিমাণে ম্যাঙ্গানিজ এবং তামাও থাকে। অধাতব মৌলের মধ্যে ফসফরাস, সিলিকন, আয়োডিন, সালফার প্রভৃতি থাকে। তবে কলাতে প্রোটিন এবং ফ্যাট খুব অল্প পরিমাণে থাকে। তাই স্থূলকায় ব্যক্তিরাও কলা খেতে পারেন। কাঁচা কলার সারবস্তু হচ্ছে শ্বেতসার। পাকার সঙ্গে সঙ্গে এটি শর্করাতে পরিণত হয়। কাঁচা অবস্থায় চিনির পরিমাণ থাকে ১-২% এবং পেকে তা হয়ে দাঁড়ায় ১৫-২০%। চিনি বলতে বোঝায় গ্লুকোজ, ফ্রুকটোজ এবং সুক্রোজ। কাঁচাকলার খোসা থাকে সবুজ। পাকার সঙ্গে সঙ্গে ক্লোরোফিল নষ্ট হয়ে যায়। পরিবর্তনের সঙ্গে ফলের একটি মিষ্টি গন্ধ পাওয়া যায়। গন্ধের কারণ অ্যামাইল অ্যাসিটেটের গঠন। এই ফলে কিছু জৈব অ্যাসিড যেমন সাইট্রিক এবং অক্সালিক অ্যাসিডও পাওয়া যায়।

হিন্দুদের দেব পূজায়, পুণ্যঘাটে, বরণডালায়, স্ত্রী আচারে, হোমাগ্নি নেভাতে কলার প্রয়োজন। আয়ুর্বেদমতে কাঁচকলা, থোড়, মোচা প্রবৃতি পিত্তনাশক এবং বহুমূত্রে উপকারী। পাকাকলা রুচিকারক এবং কোষ্ঠবদ্ধতা দূর করে। কলা রক্তের পরিমাণ বাড়ায়। কাঁচাকলা- রক্ত-আমাশয়, অন্ত্রক্ষত, অজীর্ণতায় উপকারী। এই ফল নেফ্রাইটিস, ইউরেকিয়া, গেঁটে বাত, হৃদযন্ত্রের অসুস্থতা, উচ্চ রক্তচাপ প্রভৃতি রোগে ওষুধ হিসেবে কাজ করে। থোড় কৃমিনাশক।

কলা গাছের রোগের কথা এবার বলা যাক। কলাগাছ সুস্থ থাকলে ফলন ভাল হয়। সার পেলে ফলন আরও ভাল হয়। কিন্তু বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হলে তার ফলন ক্ষমতা কমে যায়। কাণ্ডের পচন হচ্ছে একটি বড় রোগ। এই রোগ সৃষ্টি হয় সেরাটোস্টোমিলা প্যারাডোক্স নামে কালো রঙের পোকার উপদ্রবে। আর এক বড় ধরনের রোগ হচ্ছে গাছ শুকিয়ে যাওয়া (wilt)। এই রোগের কারণ হচ্ছে এক ধরণের ফাঙ্গাস। নাম ফিউজারিয়াম অক্সিস্পোরাম। এই রোগ সাধারণত মূল অংশে দেখা যায়। জলের অভাব হলে গাছের পাতা এবং কাণ্ডের সামনের দিকটা ঝুঁকে পড়ে। মাটি পরিষ্কার করে এই রোগ দমন করা যায়। পাতার প্রধান ডাঁটার পচনের জন্য দায়ী বট্রিওডিপ্লোডিয়া এবং গ্লুকোস্পোরাম নামের ফাঙ্গাস। আক্রান্ত অংশকে বাদ দিলে এই ফাঙ্গাস বন্ধ হয় অথবা আক্রান্ত ডাঁটাকে একটি নির্দিষ্ট উষ্ণতায় (২০-২৫^{o}C) গরম করতে হয়। কলাগাছের ক্ষতিকারক পোকাগুলো হলো (i) কাণ্ডছেদকারী ওডিপোরাস লঙ্গিকোলিস পোকা এবং (ii) ঘুনকারী কস্‌মোপলিটিস সোডিডাস পোকা। ক্ষতিকারক পোকার হাত থেকে রক্ষা পেতে হলে আক্রান্ত গাছকে শেকড় সুদ্ধ তুলে ফেলতে হয় বা পুড়িয়ে ফেলতে হয়। নতুবা একটি গাছের পোকা থেকে সমস্ত কলার ঝাড় নষ্ট হয়ে যায়।

সুস্বাদু এবং উন্নতমানের কলা পাওয়ার জন্য এক আন্তর্জাতিক পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। এই পরিকল্পনাকে মদত দিচ্ছে বিশ্বব্যাঙ্ক। সুস্থ অর্থাৎ রোগবিহীন কলা পেতে যাঁরা যাঁরা কাজ করছেন তাঁদের মধ্যে আছেন প্রধানত অষ্ট্রেলিয়া, আমেরিকা আর বেলজিয়ামের বিজ্ঞানীরা। ভারতীয় বিজ্ঞানীরা এ ব্যাপারে এখনও ততটা এগিয়ে যান নি। অষ্ট্রেলিয়াতে যে কাজ হচ্ছে তার জন্য বিশ্ব ব্যাঙ্ক তার তহবিল থেকে বহু ডলার সাহায্য দিয়েছে অষ্ট্রেলিয়ার গবেষকদের। এর পরিমাণ তিন বছরের জন্য দু'লক্ষ ডলার। এই কাজে হাত দিয়েছেন কুইন্সল্যাণ্ড কারিগরিক বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক জেমস্ ডেল। তিনি এর আগে ব্যানানা বাঞ্চি টপ নামে এমন এক ধ্বংসাত্মক ভাইরাসের খোঁজ পেয়েছেন যা বহু সংখ্যক কলাকে ধ্বংস করে দিয়েছে। ভাইরাসগুলি শুধু তার দেশে নয়। সারা বিশ্বের কলাতেও দেখা দিচ্ছে। ব্যানানা ব্র্যাক্ট মোজেইক নামে এক ধরনের ভাইরাস দেখা যায় শুধুমাত্র ফিলিপিনস এবং ভারতে। QUT প্রকাশিত এক পত্রিকায় অধ্যাপক ডেল বলেছেন, ব্যানানা বাঞ্চ টপ এবং ব্যানানা ব্র্যাক্ট মোজেইক, এই নামের ভাইরাস জনিত রোগের জন্য কলার উৎপাদন কমে গেছে। কোথাও কমেছে শতকরা ২০ ভাগ আবার কোথাও বা তার অনেক বেশি। অধ্যাপক ডেল বলেন, তিনি এবং তাঁর বিশ্ববিদ্যালয়ের দশজন সহযোগী এই রোগদুটির বিরুদ্ধে অভিযান চালাচ্ছেন এবং তার জন্য তাঁরা কলাতে ভাইরাসরোধী জিন প্রয়োগ করছেন। তিনি আশা রাখেন যে জেনেটিক প্রযুক্তি বিদ্যার প্রয়োগের দ্বারা রোগদুটিকে মোকাবিলা করা যাবে। আর পৃথিবীর সব থেকে বেশি উৎপাদিত ফল বলে কলার যে পরিচিতি আছে, তা অক্ষুণ্ণ থাকবে। রোগহীন কলা আমরা নিশ্চিন্তে খেতে পারব। পেট ভরাতে পারব এবং সেই সঙ্গে নিতে পারব কলার মধ্যের ভিটামিনগুলি যা শরীরকে তরতাজা রাখে।

ম্যালেরিয়া ফাইলেরিয়া

সুভাষ বন্দ্যোপাধ্যায়

সারা জীবনে অন্তত একবারও মশার কামড় খাননি এমন লোক পৃথিবীতে বিরল। মোটামুটি একটা হিসাবে দেখা গেছে একজন মানুষকে বছরে ৫৫,০০০ মশা কামড়ায়। অর্থাৎ প্রতিদিন গড়ে ১৫১টা। তারমধ্যে ১৭৭টি কামড় থেকেই কোন না কোন রোগের সংক্রমণ হতে পারে। মশার কামড় থেকেই যে নানা ধরনের অসুখ হয় একথা সকলেই জানো। বিশেষ করে ম্যালেরিয়ার কথা বোধহয় না বললেও চলে। এক সময় ম্যালেরিয়ার দাপট এত বেশি ছিল যে সাহিত্যেও ম্যালেরিয়া জায়গা করে নিয়েছিল। পরবর্তীকালে তার রমরমা একটু কমলেও ইদানীং সে আবার সগৌরবে ফিরে এসেছে। বর্তমানে ম্যালেরিয়ার দাপটে সবাই নাজেহাল আর সেই সঙ্গে মশাবাহিত অন্যান্য রোগগুলির দিকে আর কারও বেশি নজর নেই। বিশেষ করে ম্যালেরিয়ার পরেই যে রোগটিতে সর্বাধিক মানুষ আক্রান্ত হন সেই ফাইলেরিয়া এই মুহূর্তে দারুণভাবে অবহেলিত। যেহেতু ফাইলেরিয়া আক্রান্ত মানুষের তাৎক্ষণিক জীবন হানির কোন আশঙ্কা থাকে না, সেহেতু এর প্রচারও অনেক কম। অথচ কিছুদিন আগে কলকাতা ও তৎপার্শ্ববর্তী এলাকায় এক সমীক্ষা চালিয়ে কলকাতার স্কুল অব ট্রপিক্যাল মেডিসিনের বিজ্ঞানীরা দেখেছিলেন মহানগরীতে ফাইলেরিয়া আক্রান্তর হার যথাক্রমে ২.৬ (২৭.১০৯১) ও ৬.১ (৬৭.১০৯১)। এই ফলাফল যে যথেষ্ট 'অ্যালার্মিং' তা বলাই বাহুল্য।

'ফাইলেরিয়া'-র জন্য দায়ী মশার বিজ্ঞানসম্মত নাম কিউলেক্স কুইনকুই ফ্যাসিয়েটাস। নালা নর্দমা, খানাখন্দ, ডোবা, খাল, উন্মুক্ত কাঁচাপাকা ড্রেন, পুকুর, চৌবাচ্চা সহ যে কোন কৃত্রিম বা প্রাকৃতিক জায়গায় দীর্ঘদিন ধরে জমে থাকা নোংরা জলে এই মশা একসঙ্গে ৫০-১২০টি ডিম পাড়ে। ডিম ফুটে বেরয় শূককীট, শূককীট থেকে মূককীট, মূককীট থেকে পূর্ণাঙ্গ মশা। রাত্রে সাধারণত যে মশা কামড়ায় তার শতকরা ৯৭ ভাগই হল এই মশা। ছোট আকারের, কালচে রঙের এবং বেশ চালাক চতুর এই মশা মূলত রাতে কামড়ালেও আলো বাতাস হীন স্যাঁতসেঁতে ঘরে দিনেও কামড়ায়। ঘরের মধ্যে কামড়ানোর প্রবণতাই বেশি। তবে বাইরেও কামড়ায়। সাদা সরু সুতোর মতো দেখতে দুধরণের প্যারাসাইট থেকে ফাইলেরিয়া ছড়ায়। প্রথমটির নাম ব্যানক্রফটিয়াম ফাইলেরিয়া, এর জন্য দায়ী কৃমির নাম উচেরিয়া ব্যানক্রফটাই। দ্বিতীয়টির নাম ব্রুগিয়ান ফাইলেরিয়াসিস, দায়ী ব্রুগিয়া মালরী প্যারাসাইট। প্রথমটি ছড়ায় কিউলেক্স কুইনকুই ফ্যাসিয়েটাস আর দ্বিতীয়টি ছড়ায় ম্যানশোনিয়া অ্যানুলিফেরা। বিশেষজ্ঞদের মত হল আমাদের দেশে উচেরিয়া ব্যানক্রফটাই জনিত ফাইলেরিয়া ক্রমশ বাড়ছে। এ রোগে সচরাচর কেউ মরেনা ঠিকই কিন্তু সময়ে চিকিৎসা না হলে সারা জীবন ভুগতে হয়। নয়াদিল্লির ম্যালেরিয়া রিসার্চ সেন্টারের বিজ্ঞানীদের মতে ভারতে ফাইলেরিয়ায় আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা আছে এমন মানুষের সংখ্যা প্রায় ৩৬ কোটি, আর সারা বিশ্বে নব্বই কোটি ছিয়াশি লক্ষ।

ভারতে বেশির ভাগ ফাইলেরিয়াই হল উচেরিয়া ব্যানক্রফটাই জনিত। এর মূল বাহক হল কিউলেক্স কুইনকুই ফ্যাসিয়েটাস। এখন কীভাবে এই উচেরিয়া ব্যানক্রফটাই এর সংক্রমণ ঘটে সেটা দেখা যাক। কিউলেক্স কুইনকুই ফ্যাসিয়েটাস কোন ফাইলেরিয়ার রোগীকে কামড়ালে রক্তের সঙ্গে মাইক্রোফাইলেরিয়া ঢোকে মশার

পাকস্থলীতে। সেখানে মোটামুটি ঘণ্টাখানেকের মধ্যে এদের শরীরের আবরণ খসে যায়। তারপর মশার পাকস্থলীর পাতলা প্রাচীর ভেদ করে মাইক্রোফাইলেরিয়াগুলি মশার বুকের পেশী এবং উড়ান পেশী তন্তুর ভাঁজে আশ্রয় নেয়। পাকস্থলী থেকে আশ্রয়স্থলে আসতে এদের সময় লাগে প্রায় বারো ঘন্টা। আশ্রয়স্থলে এরা পরপর তিনটে ধাপে নিজের দেহের গঠন পালটে ফেলে পরিণত হয় সংক্রামক শূককীটে। বিজ্ঞানের পরিভাষায় এর নাম তৃতীয় দশার সংক্রামক শূককীট। একটি মাইক্রোফাইলেরিয়া থেকে একটি শূককীট হতে সময় লাগে ১০-১৪ দিন। শীতকালে হলে প্রায় ৪২ দিন। এই সংক্রামক শূককীট থেকেই মানুষের ফাইলেরিয়া হয়। সংক্রামক শূককীট তার ঘরবাড়ি ছেড়ে এরপর এসে পৌছয় মশার মাথায়। সেখান থেকে আসে শুঁড়ে। শুঁড়ে থাকাকালীন মশা কোন সুস্থ মানুষকে কামড়ালে যে সূক্ষ্ম ক্ষত তৈরি হয় সেই পথ দিয়ে শূককীট ঢোকে মানুষের রক্তে।

রক্তের স্রোতে ভাসতে ভাসতে গিয়ে পৌছয় মানুষের লসিকানালী ও লসিকা গ্রন্থিতে। বিশেষ করে শরীরের নীচের অংশে। সাদা রঙের সরু সুতোর মতো দেখতে এই শূককীটগুলি স্ত্রী পুরুষ একসঙ্গে কুণ্ডলী পাকিয়ে থাকে। পুরুষদের দৈর্ঘ্য ৪ সেন্টিমিটার × ০.১ মিলিমিটার। আর স্ত্রী শূককীট লম্বায় ৬.৫ সেন্টিমিটার ও চওড়ায় ০.২-২.৮ মিলিমিটার। লসিকা গ্রন্থিতে এরা একটানা ১০-১৮ বছর পর্যন্ত বেঁচে থাকতে পারে। অবশ্য তার দরকার হয় না। সাধারণত ৩-১২ মাসের মধ্যে স্ত্রী শূককীট ডিম দেয়। সেই ডিম থেকেই বের হয় মাইক্রোফাইলেরিয়া। জন্মানোর সময় এদের দেহ একটি পাতলা পর্দায় মোড়ানো থাকে। শূককীট সুস্থ মানুষের শরীরে ঢোকার ৬ থেকে ১২ মাস পর রক্তে মাইক্রোফাইলেরিয়া পাওয়া যায়। তবে এদের পাওয়ার সব থেকে ভাল সময় রাত ১২টা থেকে দুটোর মধ্যে। দিনের বেলা এরা লুকিয়ে থাকে ফুসফুসের উপধমনীতে। ফলে দিনের বেলা বা প্রথম রাতে হাজার চেষ্টা করলেও এদের পাওয়া মুশকিল। এসম্বন্ধে বিজ্ঞানীদের দু রকম মত আছে। একদলের বক্তব্য হল গভীর রাতে ফাইলেরিয়ার বাহিকা মশা বেশি কামড়াতে আসে সেজন্য মশার শরীরে ঢোকার উদ্দেশ্যে এই সময় মাইক্রোফাইলেরিয়ারা রক্তে বেশি আসে। অপর দলের মত হল রাতে এদের বেশি পাওয়া যাওয়ার কারণ শিরা ও ধমনীর রক্তে অক্সিজেনের চাপের তারতম্য। সে যাই হোক না কেন এভাবেই মশা থেকে মানুষে ফাইলেরিয়া ছড়ায়। ১৮৭৮ সালে বিজ্ঞানী ম্যানসন মশার দেশে উচেরিয়া ব্যানক্রফটাই এর জীবনচক্রের পূর্ণাঙ্গ বিজ্ঞান ভিত্তিক ব্যাখ্যা দেন।

ফাইলেরিয়া নিয়ন্ত্রণের প্রধান উপায় হল, ফাইলেরিয়া হয়েছে সন্দেহ হলেই ডাক্তার দেখিয়ে রক্ত পরীক্ষা করাতে হবে। রোগ ধরা পড়লে ওষুধ খেতে হবে। এ ব্যাপারে কোন গাফিলতি চলবেনা। কারণ তাহলে রোগ সারানো কঠিন হবে এবং ভুগতে হবে আজীবন। তাছাড়া একের থেকে অন্যের শরীরে রোগ ছড়াবে। ফাইলেরিয়া পুরনো হলে পা ফুলে হাতির পায়ের মতো হবে। এজন্যই ফাইলেরিয়ার অপর নাম এলিফ্যান্টিয়াসিস। বাংলায় গোদ। এতে কাজ করার ক্ষমতা কমে। মানসিক অবসাদ দেখা দেয়।

দ্বিতীয় উপায় হল কৃত্রিম বা প্রাকৃতিক জায়গায় জমা নোংরা জলে কিউলেক্স কুইনকুই ফ্যাসিয়েটাসের শূককীট যাতে না জন্মাতে পারে সেজন্য ফেনাথিয়ন (বেটেক্স) ছড়াতে হবে। অর্গানো ফসফরাস জাতের এই কীটনাশকটিই কিউলেক্স এর বংশ ধ্বংস করতে বেশি কার্যকরী। তবে ইদানীংকালে দেখা যাচ্ছে কিউলেক্স কুইনকুই ফ্যাসিয়েটাস এই কীটনাশক অনেক সময় হজম করে ফেলছে। সেজন্য এখন বিজ্ঞানীরা অন্য দুটি উপায়ের কথা বলেছেন। যার প্রথমটি হল মশা মারতে ব্যাকটেরিয়ার ব্যবহার। একাজে এখন পর্যন্ত যে দুটি প্রজাতির ব্যাকটেরিয়া নিয়ে পরীক্ষা চালিয়ে সন্তোষজনক ফল পাওয়া গিয়েছে তাদের নাম ব্যাসিলাস স্ফেরিকাস ও ব্যাসিলাস ফুরিন জিয়েনসিস (H-14 serotype)। এরমধ্যে ব্যাসিলাস থুরিনজিয়েনসিস মশা দমনে তুলনামূলক বেশি সক্রিয়। এ ব্যাপারে বিশেষজ্ঞদের মত হল কীটনাশক এর বদলে ব্যাকটেরিয়া ব্যবহার করলে পরিবেশ দূষণের ঝক্কি কম আর মানুষেরও তেমন কোন ক্ষতি হয়না। অথচ কাজের কাজ অর্থাৎ মশক নিধন খুব ভালভাবেই হয়।

ব্যাকটেরিয়া ছাড়াও মাছ চাষ করে মশা নিয়ন্ত্রণের কথাও ভাবা যেতে পারে বলে বিজ্ঞানীরা বলছেন। কিছু কিছু মাছ আছে যারা মশার শূককীট খায়। যেমন গাপ্পি

(পয়সিলিয়া রেটিকিউলাটা) গাম্বুশিয়া (গাম্বুসিয়া অ্যাফিনিস) তেচোখা (প্যানচক্স প্যানচক্স) ল্যাটা (চানা পাঙ্কটেটাস) চ্যাঙ (চানা মারুলিয়াস) কই (অ্যানাবাস টেস্টিউডিনিয়াস) মাগুর (ক্লরিয়াস বাট্রাকাস) তেলাপিয়া (তিলাপিয়া মোসাম্বিকা) প্রভৃতি। বাড়ির পাতকুয়ো, চৌবাচ্চা, বড় জলাশয় প্রভৃতি যেখানে নোংরা জল জমা হতে পারে সেখানেই এই মাছের চাষ করা যেতে পারে। মাছের সাহায্যে মশার নিয়ন্ত্রণের সব থেকে ভাল দিক হল এতে পরিবেশ দূষণের কোন সম্ভাবনা নেই এবং প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে ওঠারও উপায় নেই। ফলে সারা পৃথিবীতে মশার জৈবিক নিয়ন্ত্রণ বা 'বায়োলজিক্যাল কন্ট্রোল' এর হাতিয়ার হিসাবে মাছ এবং ব্যাকটিরিয়ার কদর ক্রমশ বাড়ছে।

সবশেষে যেটা না বললেই নয় তা হল ম্যালেরিয়া নিয়ে যেভাবে হৈ হৈ চলছে যেমন এ বছর ১৫ জুন সারা দেশে ম্যালেরিয়া প্রতিরোধ সপ্তাহ পালিত হল। তা চলুক। পাশাপাশি মশা বাহিত অন্য রোগগুলিকে যেন অবহেলা না করা হয়। কারণ তাতে একজনের অপসারণ ঘটলেও অন্যরা জাঁকিয়ে বসবে বা বসার সুযোগ পাবে।

With Best Compliments From :—

RAMKRISHNA & COMPANY

❀ ❀ ❀ ❀
❀ ❀ ❀
❀ ❀
❀

CONTRACTOR & GENERAL ORDER SUPPLIERS.

43, D. N. GHOSH ROAD.
BUDGE-BUDGE
24-PARGANAS (S)

মাত্র দু'ঘণ্টার জন্যে !

অসিত দত্ত

ফিলিপ রেইজ থাকেন জার্মানির ফ্রাঙ্কফুর্ট শহরে। ফ্রেডরিখগডর্ফ স্কুলে পদার্থবিদ্যা পড়ান। শোনা যায় কারণে-অকারণে ছাত্রদের কান টানাটানি করার তার বেশ উৎসাহ ছিল। হয়তো এরই ফলে শ্রবণ যন্ত্রের ক্রিয়াকলাপ নিয়ে তিনি বিশেষ ভাবে পড়াশোনা আরম্ভ করেন।

২৬শে অক্টোবর ১৮৬১ সালে হঠাৎ ফ্রাঙ্কফুর্টের সোসাইটি অফ ফিজিক্সে তিনি তার উদ্ভাবিত একটি যন্ত্রের কার্য প্রণালী হাতে কলমে করে দেখান। বিয়ার ক্যানের উপর গরুর চামড়াকে টেনে লম্বা করে পাতলা একটি শঙ্কু আকৃতির 'কান' তৈরী করেন। কানটির তলায় মোম দিয়ে একটি ধাতব পাত আঁটকে দেন। ধাতব পাতের তলায়, পাতটি স্পর্শ না করে একটি সরু তার উলম্বভাবে রাখেন। এরপর তার ও ধাতব পাতের দুই প্রান্তে একটি বৈদ্যুতিক ব্যাটারী সংযোগ করে দেন।

এখন রেইজের তৈরী এই 'কানে'র সামনে কোন শব্দ করলে ধাতব পাতটি কাঁপতে থাকত। ঐ স্পন্দন অনুসারে ধাতব পাত ও তারের মধ্যে সংযোগ হয়ে তড়িৎ প্রবাহিত হোত। এই বিদ্যুৎবর্তনী বেশ কিছুটা দূরে রাখা তামার তারের কুণ্ডলী দ্বারা সম্পূর্ণ করা হোত। বিদ্যুৎ প্রবাহের সঙ্গে সঙ্গে কুণ্ডলীর মধ্যে রাখা একটি বোনার সূচ কম্পিত হোত। এই কম্পন উদ্ভূত শব্দ একটি খালি বাক্সের মধ্যে প্রতিধ্বনিত হোত।

অর্থাৎ কানের সামনে ধ্বনিত শব্দ বেশ দূরে তারের মধ্য দিয়ে বহন করে নিয়ে যাওয়ার পদ্ধতি রেইজ হাতে কলমে করে দেখান আজ থেকে একশ পঁয়ত্রিশ বৎসর আগে।

রেইজ এই শব্দ প্রেরণ ও গ্রহণ যন্ত্রের নাম দেন টেলিফোন।

মনে রাখতে হবে টেলিগ্রাফ পদ্ধতি আবিস্কৃত হয়েছে রেইজের এই যন্ত্রের মাত্র বছর দশেক আগে। রেইজের এই যন্ত্রটিকে আজকের টেলিফোন গ্রাহক ও প্রেরক যন্ত্রের আদি ও প্রথম সংস্করণ বলা হয়।

রেইজের যন্ত্রটিতে অবশ্য অনেক ত্রুটি ছিল। যন্ত্রটি পিয়ানো বা এই জাতীয় বাদ্য যন্ত্রের ধ্বনি ছাড়া মানুষের কথা বা গান প্রেরণ বা গ্রহণ করতে পারত না। ফলে বিজ্ঞানীরা রেইজের এই যন্ত্রে বিশেষ উৎসাহ দেখান নি এবং এই যন্ত্রটিও আর ব্যবহার করা হয় নি।

শব্দ প্রেরক ও গ্রাহক আবিষ্কারক হিসাবে রেইজের নাম উল্লেখ করলেও আমরা 'আলেকজাণ্ডার গ্রাহাম বেল'কেই টেলিফোন যন্ত্রের আইনগত আবিষ্কারক হিসাবে স্বীকৃতি দিই।

বেল স্কটল্যাণ্ডের এডিনবার্গে ১৮৪৭ সালে জন্ম গ্রহণ করেন। ১৮৭১ সালে কানাডায় কিছুদিন থাকার পর

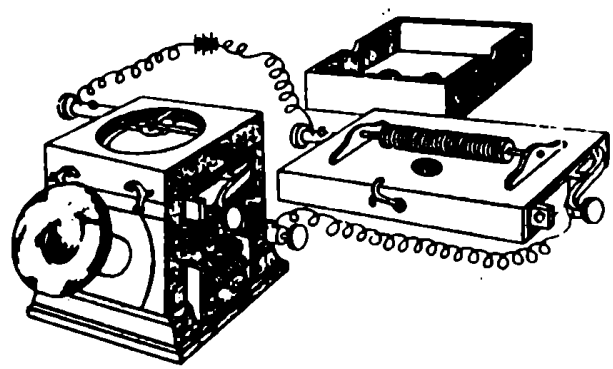

রেইজের টেলিফোন যন্ত্র

আলেকজাণ্ডার গ্রাহাম বেল (১৮৪৭-১৯২২)

আমেরিকার বোস্টন শহরে বসবাস আরম্ভ করেন। পরের বছর বেল মূক ও বধিরদের জন্যে একটি স্কুল স্থাপন করে সেখানে পড়াতে থাকেন। এই সময়ে মূক ও বধিরদের শেখানর পদ্ধতি নিয়ে তিনি চর্চা আরম্ভ করেন। সম্ভবতঃ কানে শোনা ও কথা বলার ব্যাপারে বেলের এই আগ্রহ পরে তৎকালীন প্রচলিত নতুন টেলিগ্রাফ যন্ত্রকে উন্নত করার ব্যাপারে উৎসাহী করে তোলে।

অবশ্য এর অনেক আগে চার্লস গ্রাফটন পেজ নামে একজন পদার্থ বিজ্ঞানী 'গ্যালভানিক মিউজিক' নামে এই ধরনের একটি যন্ত্র আবিস্কার করে ছিলেন।

এই যন্ত্রে গ্যালভানিক তড়িৎ কোষের বিদ্যুৎ প্রবাহের সংযোগ ছেদ ও যুক্ত করে একটি বিদ্যুৎ চুম্বকের সাহায্যে পিয়ানোর রিড কম্পিত করে শব্দ উৎপন্ন করা যেত। বেল ঐ পদ্ধতিকে কাজে লাগিয়ে তার নিজস্ব হারমোনিক টেলিগ্রাফের প্রভূত উন্নতি করেন।

এই যন্ত্রের মূল উদ্দেশ্য ছিল যে একটি তারের মধ্য দিয়ে দুই বা ততোধিক টেলিগ্রাফ সংকেত প্রেরণ করা।

বেল অবশ্য তার হারমোনিক টেলিগ্রাফ তৈরী করতে সফল হন নি। তবে এই যন্ত্র তৈরী করার সময় বেলের মাথায় আর একটি যন্ত্রের পরিকল্পনা এসেছিল। বিভিন্ন সুরের ও লয়ের শব্দ প্রেরণের জন্য বেল কম্পমান ষ্টীলের বিভিন্ন আকৃতির পাত ব্যবহার করার চেষ্টা করছিলেন। এই ষ্টীলের পাতগুলির কম্পাঙ্ক এক একটি সুরের সঙ্গে মেলান ছিল এবং পাতগুলি কম্পিত হলে বিভিন্ন বিদ্যুৎ বর্তনী সম্পূর্ণ করে তারের মধ্যে তড়িৎ প্রবাহিত হত। এইভাবে প্রেরণ যন্ত্রে শব্দ তড়িৎ সংকেতে রূপান্তরিত করা যেত। এই তড়িৎ প্রবাহ আবার গ্রাহক যন্ত্রের তড়িৎ চুম্বকের চৌম্বকত্বে হ্রাসবৃদ্ধি নিয়ন্ত্রিত করত। এর প্রভাবে তড়িৎ চুম্বকের ওপর একসারি কম্পমান ষ্টীলের পাত স্পন্দিত হয়ে শব্দ উৎপন্ন করত।

বেলের এই যন্ত্রে তখনও মাত্র কয়েকটি কম্পাঙ্কের

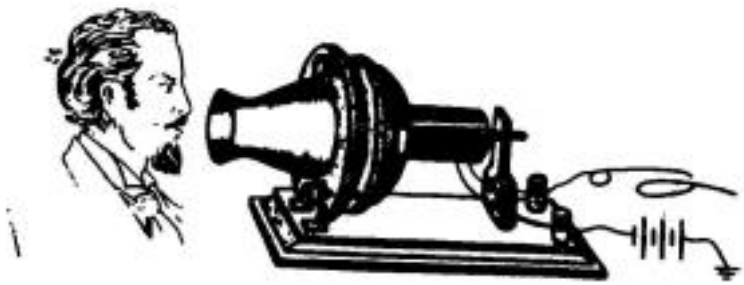

বেলের শব্দ প্রেরক যন্ত্র

১৮৭৩ সালে বেল বোস্টন বিশ্ববিদ্যালয়ে শব্দ সক্রান্ত শারীরবিদ্যার অধ্যাপক হন। অধ্যাপনার সঙ্গে সঙ্গে তিনি 'হারমোনিক টেলিগ্রাফ' নামে একটি যন্ত্র উদ্ভাবনের চেষ্টা চালিয়ে যেতে থাকেন।

শব্দ প্রেরণ ও গ্রহণ করা যেত। মানুষের কথাবার্তা আদান প্রদানের ক্ষেত্রে এই যন্ত্রটি একেবারেই অকেজো ছিল।

এই যন্ত্রটির তৈরীর সময় খুব সম্ভবতঃ ১৮৭৫ সালের ২রা জুন বেলের সহকারী টমাস ওয়াটসন লক্ষ্য করেন যে

গ্রাহক যন্ত্রের একটি পাত কোনভাবে বিদ্যুৎচুম্বকে আটকে রয়েছে। এই অবস্থায় প্রেরক যন্ত্র উদ্ভূত শব্দ খুব ক্ষীণ অবস্থায় গ্রাহক যন্ত্রে শোনা যাচ্ছে।

বিজ্ঞানের অনেক যুগান্তকারী আবিষ্কার যেমন হঠাৎ ঘটে যায়, তেমনিই ওয়াটসনের এই হঠাৎ পর্য্যবেক্ষণ টেলিফোন যন্ত্র তৈরীর ক্ষেত্রে একটি অমূল্য পদক্ষেপ হয়ে রইল। একটি ত্রুটি যন্ত্রটির সমগ্র চিন্তাভাবনা অন্যদিকে চালিত করল এবং এই ত্রুটিই আধুনিক টেলিফোন যন্ত্রের জন্মমূহুর্ত।

তবে মনে রাখতে হবে এই আটকে থাকা পাতই রেইজের গরুর চামড়ার পর্দার উন্নত প্রতিরূপ। বর্তমানের টেলিফোন গ্রাহক ও প্রেরক যন্ত্রে কথা বলা ও শোনার জন্য বিদ্যুৎচুম্বকের উপর ধাতুর পাতলা চাকতি লাগান থাকে। শব্দ তরঙ্গের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ঐ পাতলা চাকতি কম্পিত হয়ে বিদ্যুৎ বর্তনীতে তড়িৎ প্রবাহের হ্রাস বৃদ্ধি ঘটায়। বিদ্যুৎ প্রবাহের এই পরিবর্তন আবার গ্রাহক যন্ত্রাংশে ধাতুর পাতলা চাকতি কম্পিত করে শব্দ তরঙ্গে রূপান্তরিত হয়।

প্রায় ন'মাস ধরে বেল, ওয়াটসনের ঐ পর্যবেক্ষণের কারণ অনুসন্ধান করেন ও তার যন্ত্রের উন্নতি সাধন করতে আবিষ্কার করার চেষ্টা করে যাচ্ছিলেন। তিনি কতটা সফল হয়েছিলেন তার কোন নথিপত্র অবশ্য আজ নেই। তবে তার ধ্যানধারণা প্রায় সঠিক পথেই ছিল – এ রকম প্রমাণ পাওয়া গেছে।

বেলের আবেদন জমা পরার মাত্র দুঘণ্টা পরে এলিসা গ্রে একটি হলফনামা পেশ করেন। হলফনামায় গ্রে তার কল্পনার রূপ বর্ণনা করতে গিয়ে লেখেন যে তার যন্ত্র 'টেলিগ্রাফ পদ্ধতিতে মানুষের কথাবার্তা আদান-প্রদান করতে পারবে'।

বেলের মত অবশ্য গ্রের প্রস্তাবে বিদ্যুৎ চুম্বকের ব্যবহার ছিল না। পরিবর্তে প্রেরণ যন্ত্রে তরল পদার্থে ভর্তি একটি পাত্রের ওপর একটি পাতলা আস্তরণ লাগানর প্রস্তাব ছিল। এই আস্তরণের তলায় একটি লোহার দণ্ড শব্দের সঙ্গে সঙ্গে উঠানামা করার ব্যবস্থা ছিল। এই উঠানামা বিদ্যুৎ প্রবাহের মাত্রা নিয়ন্ত্রণ করত। গ্রাহক যন্ত্রেও প্রায় একই রকম ভাবে কাজ করার কথা ভাবা হয়ে ছিল।

তবে বলে রাখা দরকার যে গ্রে ও এই যন্ত্র তৈরী করেন নি। তার এই হলফনামা পেশ করার উদ্দেশ্য ছিল যে অন্য আর কেউ যেন এই পদ্ধতিতে কথাবার্তা প্রেরণের যন্ত্র তৈরী

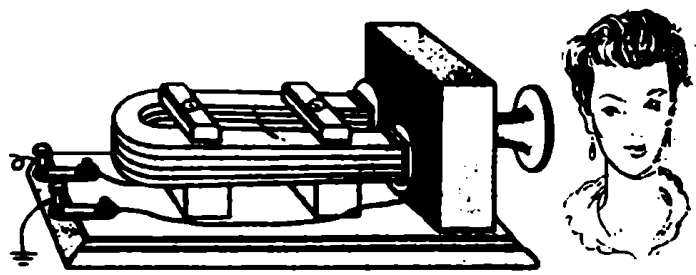

বেলের শব্দ গ্রাহক যন্ত্র

থাকেন। ১৮৭৬ সালের ১৪ ফেব্রুয়ারী বেল ওয়াসিংটনের পেটেন্ট অফিসে তার আবিষ্কারের পেটেন্ট পাওয়ার জন্যে আবেদন করেন। আবেদন পত্রে তিনি তাঁর যন্ত্রকে 'মানুষের কথাবার্তা প্রেরণের একটি টেলিগ্রাফ যন্ত্র' বলে উল্লেখ করেন।

প্রায় এই সময়েই এলিসা গ্রে নামে একজন আমেরিকান ব্যবসায়ী শব্দ আদান-প্রদান করার যন্ত্র করতে না পারে। গ্রে এই প্রস্তাব পেশ করতে বেলের তুলনায় মাত্র দুঘণ্টা দেরী করে ফেলেছিলেন। লক্ষ্য করার বিষয় যে বেল ও গ্রের মূল পদ্ধতির বিশেষ তারতম্য ছিল না এবং দু'জনেই তাদের যন্ত্রটির ব্যাপারে কিছু কল্পনার আশ্রয় নিয়েছিলেন। তবে বেলের পরীক্ষা নিরীক্ষা গ্রের চেয়ে অনেক এগিয়ে ছিল এবং গ্রের যন্ত্রটি ছিল কাল্পনিক রূপরেখার মধ্যে সীমাবদ্ধ।

এ কথা উল্লেখ করতেই হবে যে যদি গ্রে তার হলফনামা মাত্র দু'ঘণ্টা আগে পেশ করতেন তবে সূক্ষ্ম আইনগত কারণে টেলিফোনের আবিষ্কারক হিসেবে এলিজা গ্রের নামই স্বীকৃত হত।

গ্রে ছিলেন আমেরিকার নাগরিক, তাই তিনি তৎকালীন আইন অনুযায়ী কোন আবিষ্কার হলফনামার মাধ্যমে লিপিবদ্ধ করতে পারতেন।

অন্যদিকে বেল তখনও আমেরিকায় বসবাসকারী বৃটিশ নাগরিক ছিলেন। তাই তার হলফনামা বেশ করার অধিকার ছিল না।

যেহেতু গ্রের রূপরেখা বাস্তবে রূপান্তরিত করা যেত তাই তার হলফনামা গ্রাহ্য হয়েছিল কিন্তু বেলের পেটেন্টের আবেদন দু'ঘণ্টা আগে করার জন্য বেলই টেলিফোনের আবিষ্কারক হিসেবে আইনতঃ স্বীকৃত হন। পরে অবশ্য বেল নিজেই বলেছিলেন যে গ্রে এই ব্যাপারে কোন বিরোধ করেন নি। বেল ৭ই মার্চ ১৮৭৬ সালে তার যন্ত্রের পেটেন্ট নং ১৭৪৪৬৫ লাভ করেন। আইনবিদরা এখনও মনে করেন যে যদি গ্রে দু'ঘণ্টা আগে তার হলফনামা পেশ করতেন তবে টেলিফোন যন্ত্র তৈরী হোক বা না হোক বেল ঐ পেটেন্ট পেতেন না।

এই পেটেন্ট পাওয়ার মাত্র তিন দিন পরে ১০ই মার্চ বেল তার পরীক্ষাগার ও পড়ার ঘরের মধ্যে ১২ মিটার তারের দুই প্রান্তে সংযুক্ত প্রেরক ও গ্রাহক যন্ত্রে মানুষের কথাবার্তা আদান-প্রদানে সফল হন। বেল তার সহকারী ওয়াটসনকে প্রেরক যন্ত্রের মাধ্যমে ডেকে পাঠান "মিষ্টার ওয়াটসন, এখানে আসুন আপনাকে আমার দরকার" ওয়াটসন গ্রাহক যন্ত্রের সাহায্যে শুনলেন এবং তার প্রেরক যন্ত্রের মাধ্যমে উত্তর দিলেন "মিষ্টার বেল আমি আপনার প্রতিটি কথাই পরিস্কার শুনতে পাচ্ছি"। টেলিফোনে কথোপকথন ঐ বাক্য দুটি দিয়েই প্রথম সুরু হোল।

এরপর ২৬শে জুন ১৮৭৬ সালে বেল তার টেলিফোন যন্ত্রটি ফিলাডেলফিয়ার সেন্টিনাল প্রদর্শনীতে প্রথম জন সমক্ষে নিয়ে আসেন। এর অন্যতম দর্শক ছিলেন লর্ড কেলভিন। তিনি বলেছিলেন "এই যন্ত্র আমেরিকার সর্বশ্রেষ্ঠ আবিষ্কার এবং টেলিগ্রাফ সংক্রান্ত যন্ত্রের মধ্যে একটি অত্যাশ্চর্য বিষয়।

এর পরের বছর তিন কিলোমিটার লম্বা টেলিফোন লাইন দিয়ে বোষ্টনের মেয়রের অফিস ও বাড়ীর মধ্যে সংযোগ স্থাপন করা হয়। ইতিহাসে এটিই প্রথম টেলিফোন লাইন এবং বোষ্টনের মেয়রই প্রথম টেলিফোন গ্রাহক।

২৫ জানুয়ারী ১৮৭৮ সালে বেল নিজেই কেনেকটিকাডের নিউ হেভেনে একটি কোম্পানী খোলেন। এই টেলিফোন কোম্পানীর গ্রাহক সংখ্যা ছিল মাত্র একুশজন। সেই সময় বেল বলেছিলেন যে "এমনদিন আর বেশীদূরে নয়, যখন প্রতিটি শহর গ্রাম টেলিফোন লাইন দিয়ে সংযুক্ত হবে। যে কোন শহরের যে কোন লোক দূরের অন্য শহরের অন্য লোকের সঙ্গে মুখেরকথা (word of mouth) আদান প্রদান করতে পারবে"। বেলের ভবিষ্যদবাণী অক্ষরে অক্ষরে মিলে গেছে।

With Best Compliments From :

KALYAN KUMAR DEY

GOVERNMENT CONTRACTOR

60, BANAMALI NASKAR ROAD
CALCUTTA-700 060

শব্দোত্তর অণুবীক্ষণ

সন্তোষকুমার ঘোড়ই

আলোক তরংগ ব্যবহার করে সচরাচর সব অণুবীক্ষণ যন্ত্র তৈরি করা হয়। আলোক তরংগ হল তড়িৎচুম্বকীয় তরংগ। শব্দ তরংগ কিংবা শব্দোত্তর তরংগ হল যান্ত্রিক তরংগ। আলট্রাসনিক বা শব্দোত্তর তরংগ ব্যবহার করে উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন অণুবীক্ষণ তৈরি করা হয়েছে। শব্দোত্তর তরংগ ব্যবহার করে কেমনভাবে প্রতিবিম্ব তৈরি করা হয় — কেমন করে আলট্রাসনিক মাইক্রোস্কোপ গড়ে উঠল — সে বিষয় নিয়ে এই নিবন্ধে আলোচনা করা হয়েছে।

ছোট জিনসকে বড় করে দেখার যন্ত্রের নাম অণুবীক্ষণ বা মাইক্রোস্কোপ। খালি চোখে যা দেখা যায় না তাকে অণুবীক্ষণ দিয়ে দেখা যায়। আলোকীয় অণুবীক্ষণ যন্ত্র আলো আর লেন্স-ব্যবস্থা গ্রহণ করে গড়ে ওঠে। পরবর্তীকালে ইলেকট্রনের তরংগধর্ম অর্থাৎ বস্তুতরংগের ব্যবহার করে গড়ে উঠেছে ইলেকট্রন-মাইক্রোস্কোপ। তড়িৎ-চুম্বকীয় তরংগ, বস্তু তরংগ ইত্যাদি ব্যবহার করে যদি অণুবীক্ষণ যন্ত্র গড়ে তোলা যায়, তাহলে কেনই বা যান্ত্রিক শব্দ-তরংগ ব্যবহার করে অণুবীক্ষণ যন্ত্র তৈরি করা যাবে না ? কেন শব্দতরংগের সাহায্যে কোন বস্তুর প্রতিবিম্ব গড়ে তোলার ব্যবস্থা করা যাবে না ?

শব্দ একটি যান্ত্রিক তরংগ। বস্তুর কম্পনে শব্দের সৃষ্টি। মাধ্যম ছাড়া শব্দ চলাচল করতে পারেনা। ২০ থেকে ২০,০০০ হার্ৎজ কম্পাঙ্ক বিশিষ্ট শব্দ আমাদের শ্রুতি গোচর হয়। কম্পাঙ্ক ২০,০০০ হার্ৎজ-এর বেশি হলে সেই শব্দ আমাদের শ্রুতিগোচর হয় না। সেই শব্দ-তরংগকে বলা হয় শব্দোত্তর তরংগ বা 'আলট্রাসনিক ওয়েভ'। সাধারণভাবে শব্দোত্তর তরংগের কম্পাক ২০,০০০ হার্ৎজ থেকে ১০০,০০০ হার্ৎজ-এর মধ্যে থাকে। বর্তমানে $১০^{১০}$ (একের পরে দশটি শূন্য) হার্ৎজ কম্পাঙ্কের শব্দোত্তর-তরংগ সৃষ্টি করা সম্ভব হয়েছে। শ্রুতিগোচর শব্দের মতোই শব্দোত্তর তরংগ, মাধ্যমে ক্রমান্বয়ে সংকোচন এবং প্রসারণ সৃষ্টি করে সঞ্চালিত হয়। কম্পাংক খুব বেশি হওয়ার কারণে মাধ্যমের অণু বা পরমাণুগুলি অতি উচ্চ কম্পাংকে আন্দোলিত হয়। শব্দোত্তর তরংগের কম্পাংক খুব বেশি হওয়ার জন্য তার তরংগ-দৈর্ঘ্য খুব ছোট। এক্ষেত্রে তরংগদৈর্ঘ্য এক্সরশ্মির তরংগদৈর্ঘ্যের প্রায় কাছাকাছি। কম্পাংক প্রয়োজনমত ব্যবহার করে দৃশ্য আলোর তরংগদৈর্ঘ্যের ($\sim 10^{-6}$ মি) প্রায় সমান তরংগদৈর্ঘ্যের শব্দোত্তর তরংগ সৃষ্টি করা যায়। শব্দোত্তর তরংগের সাহায্যে অণুবীক্ষণ তৈরি করার সুবিধা হল — অপেক্ষাকৃত অনেক কম কম্পাঙ্কে খুব ছোট তরংগ দৈর্ঘ্য সৃষ্টি করা সম্ভব। তরংগদৈর্ঘ্য যত ছোট হবে তত পরিষ্কারভাবে ক্ষুদ্রতর বস্তুকে দেখতে পাওয়া যাবে।

শব্দতরংগের প্রতিফলন এবং প্রতিসরণ দুইই ঘটে। আলোক তরংগের বেগ ঘনমাধ্যমে কম, লঘু মাধ্যমে বেশি — আর শূন্যে আলোর বেগ সর্বোচ্চমান লাভ করে। শব্দ তরংগের ক্ষেত্রে ব্যাপারটা ঠিক উল্টো। শূন্যে অর্থাৎ কোন মাধ্যম না থাকলে শব্দ সঞ্চালিত হয় না। অর্থাৎ শূন্যে শব্দের বেগের মান শূন্য। লঘুতর মাধ্যম অপেক্ষা ঘনতর মাধ্যমে শব্দের বেগ, বায়ু বা তরল মাধ্যমে শব্দের বেগ অপেক্ষা অনেক বেশি। আলোর ক্ষেত্রে কোন মাধ্যমের পরম প্রতিসরাংক বলতে বোঝায় শূন্যে আলোর বেগ এবং ঐ মাধ্যমে আলোর বেগের অনুপাত। যেহেতু শূন্যে আলোর

বেগের মান সর্বোচ্চ তাই কোন মাধ্যমের প্রতিসরাংক ১-এর চেয়ে বেশি। শব্দতরংগের ক্ষেত্রে এই সংজ্ঞা খাটে না। কারণ শূন্য মাধ্যমে শব্দের বেগ শূন্য, তাই এক্ষেত্রে আলোক তরংগের মতো প্রতিসরাংগের সংজ্ঞা দেওয়া সম্ভব নয়। প্রতিসরাংকের বদলে তাই শব্দ তরংগের ক্ষেত্রে গ্রহণ করা হয়, শব্দ প্রতিবাধা (acoustic impedance)। শব্দ প্রতিবাধা হল শব্দ তরংগের বেগ এবং মাধ্যমের ঘনত্বের গুণফল। কাজেই এটি মাধ্যমের প্রকৃতির উপর নির্ভরশীল। শব্দ-প্রতিবাধা এবং প্রতিসরাংক পারস্পরিকভাবে একে অন্যের বিপরীত রাশি। মাধ্যমে আলোর বেগ যত বেশি হবে প্রতিসরাংকের মান তত কমে যাবে ; কিন্তু শব্দের ক্ষেত্রে বেগ বাড়লে প্রতিবাধা বাড়ে। শব্দের প্রতিসরণের ফলে শব্দের বেগের দিক পরিবর্তিত হয়। এই প্রতিসরণ ধর্মকে কাজে লাগিয়ে শব্দ-তরংগের জন্য লেন্স তৈরি করা হয়েছে। ১নং চিত্রে শব্দ-তরংগের জন্য একটি লেন্স ব্যবস্থা দেখানো হল।

একদিকে প্রত্যাবর্তী ভোল্টেজ প্রয়োগ করা যায় তাহলে লম্বভাবে অন্যতলের দোলন বা কম্পন ঘটবে। এই ধর্মকে কাজে লাগিয়ে উপযুক্ত মাত্রার কম্পন সৃষ্টি করলে শব্দোত্তর তরংগ সৃষ্টি হবে। এই তরংগ একটি রডের ভিতর দিয়ে পাঠানো হয়। এই রড মাধ্যমটিকে বলা 'বাফার' (buffer)। বাফারের জন্য সাধারণত কোয়ার্জ পদার্থটি ব্যবহার করা হয়। বাফার রডের অন্য প্রান্তটিকে গোল বাটির মতো একটি অবতল গর্ত কাটা থাকে। এই প্রান্তটি জলের তলের উপর এমনভাবে রাখা হয় যাতে রডের এই প্রান্তে জলের তলটিকে উত্তল লেন্সের মতো পেট মোটা দেখায়। অর্থাৎ কোয়ার্জ-রডের প্রান্তে বাটির মতো গর্তটিতে জল ঢুকে জলের তল বাটির তলের আকার ধারণ করে। এই তলটি শব্দ তরংগের জন্য উত্তল লেন্সের কাজ করবে। শব্দোত্তর তরংগ কোয়ার্জ মাধ্যম থেকে যখন জলের উত্তল তলের ভিতর দিয়ে জল-মাধ্যমে প্রবেশ করবে তখন এই শব্দ রশ্মি (তরংগের দিক) বেঁকে যাবে এবং একটি বিন্দুতে মিলিত

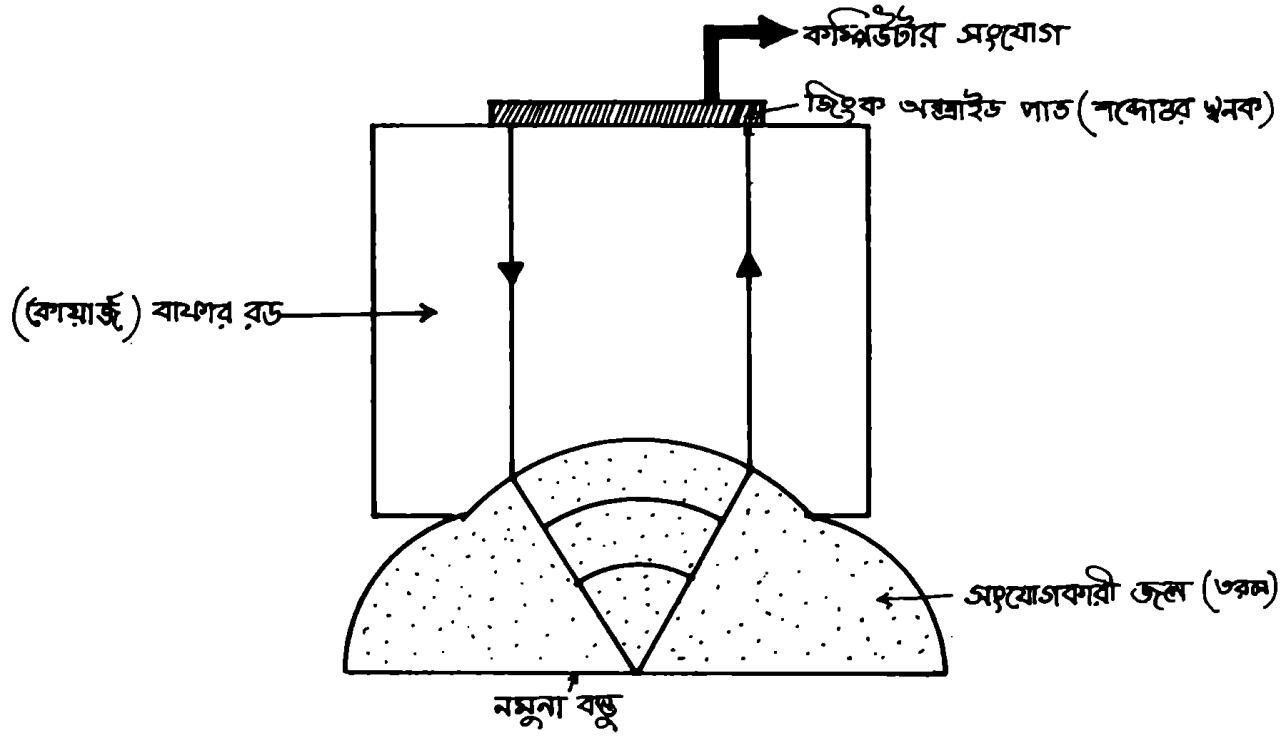

শব্দোত্তর লেন্স

চিত্রে জিংক-অক্সাইডের পাত ব্যবহার করে শব্দোত্তর তরংগ সৃষ্টি করা হয়। যদি এই অক্সাইড পাত বা কেলাসের

হবে। কোয়ার্জ মাধ্যমে শব্দের বেগ, জল মাধ্যমে শব্দের বেগের প্রায় চারগুণ। এখানে জল মাধ্যমের তল উত্তল

লেন্সের মতো কাজ করে। এবার দেখা যাক শব্দোত্তর তরংগ দিয়ে কেমন করে ছবি তোলা সম্ভব হল।

যদি একটি জিংক অক্সাইডের প্লেট নিয়ে তা দিয়ে শব্দোত্তর তরংগের সৃষ্টি করা যায়, তাহলে সেই তরংগকে সমতলীয় তরংগ বলা যায়। প্রথমে ছায়া (shadow) পদ্ধতিতে কেমন করে শব্দোত্তর তরংগের সাহায্যে ফটো তোলা হয় — সে বিষয়ে একটু আলোচনা করি। এই পদ্ধতির নাম 'সংযোগী ছাপা পদ্ধতি' (contact printing process) (২ নং ছবিতে পদ্ধতিটির রূপরেখা দেখানো হল) জলকোষের দেওয়ালের উচ্চতা বেশি নয়। এই জলপূর্ণ কোষে যে জিনিষটি বা নমুনাটি দেখতে চাই সেই নমুনাটি রেখে তার মুখটি একটি ঢাকনা দিয়ে ঢেকে দেওয়া হয়। পাতলা ঢাকনাটি বা পর্দাটি 'মাইলার' নামক এক প্রকার পলিমার দিয়ে তৈরি। সমতল শব্দোত্তর তরংগ যখন জলের ভিতরে নমুনাটির ভিতর দিয়ে যাবে তখন নমুনাটির বিভিন্ন অংশ বিভিন্ন পরিমাণ শব্দশক্তি শোষণ করে নেয়। পাতলা মাইলার পর্দার উপর খুব ছোট ছোট হালকা 'পলিষ্ট্রিন' দানা (ব্যাস ১ মাইক্রোমিটার মতো) সমানভাবে ছড়ানো থাকে।

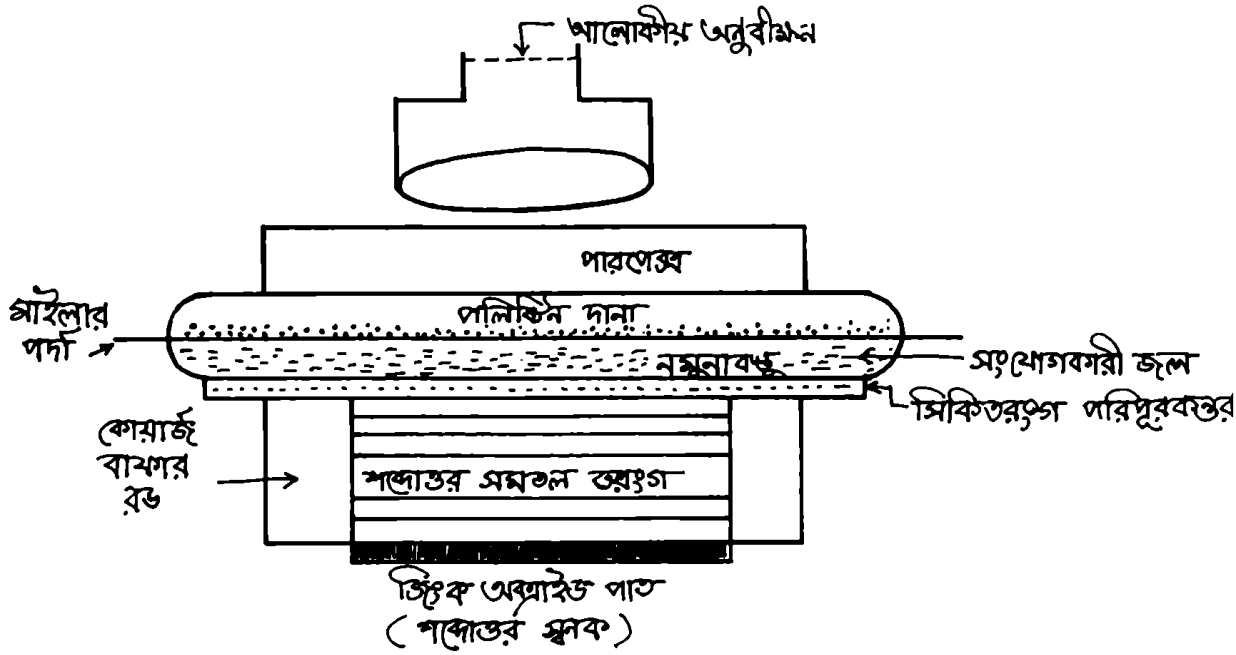

২ নং চিত্র – কন্ট্যাক্ট প্রিন্টিং পদ্ধতি

'সংযোগী ছাপা' ব্যবস্থায় জিংক অক্সাইডের একটি আয়তাকৃতি পাত নিয়ে তার দুই প্রান্তে উপযুক্ত কম্পাংকের প্রত্যাবর্তী ভোল্টেজ প্রয়োগ করা হয়। তার ফলে শব্দোত্তর সমতল তরংগের সৃষ্টি হয়। সমতল তরংগ কোয়ার্জ বাফার ব্লকের ভিতর দিয়ে পাঠানো হয়। একটি পাত্রে বা কোষে জল নিয়ে সেই জলের ভিতর যে জিনিসটির ছবি পেতে চাই, সেই জিনিসটিকে ডুবিয়ে রাখা হয়। ২নং চিত্রে সবার নিচে জিংক অক্সাইড প্লেট (শব্দোত্তর স্বনক) ; তার উপর কোয়ার্জ ব্লক যার নাম বাফার ; তার উপর জলের কোষ। শব্দোত্তর তরংগ জলে নমুনা বস্তুর ভিতর ভেদ করে গিয়ে পলিষ্ট্রিন দানা ছড়ানো মাইলার পর্দায় গিয়ে পড়ে। যে যে জায়গায় শব্দোত্তর তরংগের বিস্তার বেশি হয়, সেই সেই জায়গায় দানাগুলো লাফিয়ে সরে যায়। শব্দোত্তর তরংগ যখন নমুনা বস্তুটির ভিতর দিয়ে যায়, তখন বস্তুটির বিভিন্ন জায়গায় তরংগশক্তির শোষণ বিভিন্নরকম হয়। এই শোষণমাত্রা নির্ভর করে নমুনা বস্তুটির বিভিন্ন অংশের বেধ এবং ঘনত্বের তারতম্যের উপর। কাজেই নমুনা বস্তুটির অপরদিকে যে তরংগ বেরিয়ে আসে, সেই তরংগের বিস্তার

ভিন্ন ভিন্ন অংশে ভিন্ন ভিন্ন হয়। যেখানে তরংগের শক্তি বেশি, সেখানে তরংগের বিস্তারও বেশি। ফলশ্রুতি হিসেবে মাইলার পর্দায় সেই অংশের কম্পন-বিস্তারও বেশি হয়। মাইলার পর্দায় পলিষ্ট্রিন দানাগুলি কম্পনের বিস্তার অনুসারে কোথাও সরে গিয়ে, কোথাও বা জড়ো হয়ে একটি নক্সা তৈরি করে। এই নক্সাটি নমুনা বস্তুটির একটি অবয়বরূপেই মাইলার পর্দায় প্রতিভাত হয়। একটি আলোকীয় অণুবীক্ষণের সাহায্যে এই অবয়ব প্রত্যক্ষ করা যায় বা ক্যামেরার সাহায্য নিয়ে ফটো তোলা যায়। এভাবে 'শব্দজাত ছায়াসৃষ্টি' পদ্ধতি গ্রহণ করে টিস্যুজাতীয় পদার্থের সুন্দর ছবি তোলা যায়। সবচেয়ে বড়ো কথা হল — এধরনের যন্ত্র তৈরি করা সহজসাধ্য।

এবার ক্রমবীক্ষণ বা স্ক্যানিং পদ্ধতিতে কম্পিউটারের পর্দায় কীভাবে ছবি গড়ে তোলা যায় তার কথা বলা যাক। শব্দোত্তর লেন্স-এর বিষয়টি কিছু আগে বলা হয়েছে। এখন দেখা যাক, এই লেন্স ব্যবহার করে কেমন করে শব্দোত্তর অণুবীক্ষণ তৈরি করা হয়। এখানে জিংক-অক্সাইডপাত ব্যবহার করে শব্দোত্তর সমতলীয় তরংগের সংকেত বা পালস সৃষ্টি করা হয়। এই সংকেত কোয়ার্জ রডের ভিতর দিয়ে গিয়ে জল-লেন্সে ঢোকে এবং লেন্সের ফোকাসে একটি বিন্দুতে মিলিত হয়। এই ফোকাসে যে নমুনা বস্তুটির ছবি চাই সেই বস্তুটিকে রাখা হয়। নমুনাটির গা থেকে শব্দোত্তোর তরংগ প্রতিফলিত হয় ; এবং ফিরে গিয়ে জিংক অক্সাইড পাতের উপরেই পড়ে। এরূপ প্রতিফলিত তরংগ জিংক অক্সাইড পাতের উপর পড়ার ফলে সেখানে একটি তড়িৎ-বিভবের সৃষ্টি হয় (চিত্র-১)। এই সংকেত বিন্দু দিয়ে অতিদ্রুত বস্তুটির তলকে স্ক্যান করা হয় এবং প্রতিফলিত তরংগকে তড়িৎ-বিভব সংকেতে রূপান্তরিক করা হয়। এই তড়িত-সংকেতগুলি কম্পিউটারে পাঠানো হয়। কম্পিউটারের পর্দায় নমুনাবস্তুটির একটি সুন্দর ছবি ফুটে ওঠে। এক্ষেত্রে জিংক অক্সাইড পাতটি শব্দোত্তর তরংগ সৃষ্টি এবং নমুনা বস্তু থেকে প্রতিফলিত তরংগ-গ্রহণ দুটো কাজই করে। প্রথম ক্ষেত্রে পরিবর্তী তড়িত-বিভব প্রয়োগ করে শব্দোত্তর তরংগ সৃষ্টি করা হয় ; দ্বিতীয় ক্ষেত্রে শব্দোত্তর তরংগ যখন প্রতিফলিত হয়ে ফিরে এসে জিংক অক্সাইড পাতে চাপ দেয়, তখন পাতটিতে তড়িৎ বিভব বা তড়িৎ-সংকেতের সৃষ্টি হয়।

শেষকথা বলে বিজ্ঞানে কিছু হয় না। সময়ের সংগে তুলনামূলকভাবে যন্ত্রের সুবিধা বা অসুবিধার কথা বলা যায় মাত্র। ইলেকট্রন অণুবীক্ষণ যন্ত্রের চেয়ে শব্দোত্তর অণুবীক্ষণ যন্ত্রটির সুবিধা হিসেবে বলা যায় — দ্বিতীয় ক্ষেত্রে সজীব বা জীবন্ত নমুনার ছবি তোলা যায় যা ইলেকট্রন অণুবীক্ষণের ক্ষেত্রে সম্ভব নয়। ইলেকট্রন অণুবীক্ষণ যন্ত্রে শক্তিশালী ইলেকট্রনগুচ্ছের আঘাতে পরীক্ষাধীন কোন সজীব নমুনাই জীবিত থাকতে পারে না।

With Best Compliments From :—

M/S HUICON

GOVT. CIVIL CONTRACTOR.

9/58, NETAJI NAGAR
REGENT ESTATE
CALCUTTA-700 092
PHONE : 471-1094

বিজ্ঞানের পাঁচ পাঁচালি

ভ বা নী প্র সা দ ম জু ম দা র

(এক)

'শুমেকার লেভি' আছড়ে পড়লো বৃহস্পতির বুকে
ভাবলো অনেকে ঃ হবে কুপোকাত, মরবে মলিন মুখে !
হলো না কিছুই, শুধু বুকে-পিঠে
কয়েকটা দাগ, মানে কালশিটে
সেরে গেছে ব্যথা, তুঙ্গে এখনও রয়েছেন তিনি সুখে !!

(দুই)

তেড়ে এলো ধুমকেতু 'শুমেকার লেভি – ৯'
বৃহস্পতিকে নাকি দেখাবে সে খুব ভয় !
হেসে গ্রহ হো-হো ক'রে
যেই ঘুঁষি দিলো জোরে
'শুমেকার' খেয়ে মার নিজে শেষে হলো লয় !!

(তিন)

জুরাসিক পার্কেতে ছিল দু'টো 'ডাইনো'
সেথায় বেড়াতে গেল গোটা-চার 'রাইনো' !
ডাইনোরা বলে, ভাগ
রাইনোর সে-কী রাগ
তারপরে ঘটলো কি ? খুকু বলে, আই নো !!

(চার)

বিদঘুটে এক বিজ্ঞানী যাঁর নিবাস এখন ইম্ফলে
মাটিতে ডিম পুঁতেই খোয়াব দ্যাখেন, গাছে ডিম ফলে !
নিয়েই পাতা নিম-শিম
খান্ তিনি খুব হিমসিম
ভাত-রুটি নয়, দিন কাটে তাঁর শিম-বীচি আর নিম-ফলে !!

(পাঁচ)

স্বনামধন্য গবেষক এক থাকে জাপানের ওসাকায়
ফল না খেয়ে দিন-রাত রোজ শুধুই ফলের খোসা খায় !
দেখেই এসব দৃশ্য
বলে হেসে তার শিষ্য
খোসার চেয়েও বেশি ভিটামিন মেলে স্যার শাখা-প্রশাখায় !!

ভৃগু-কিরো, সবাই জিরো

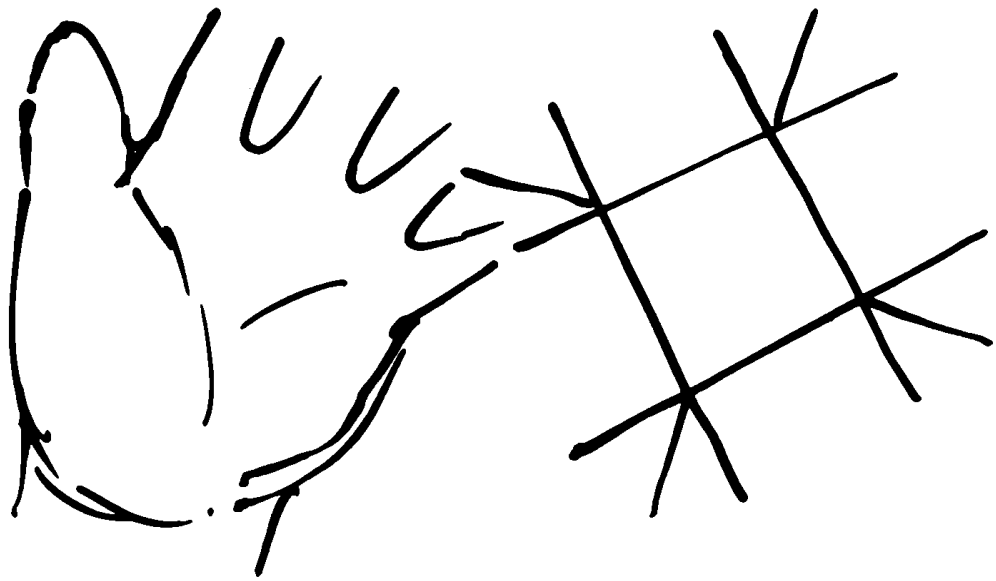

"বরাত খারপ ! বরাত খারাপ !" চেঁচাস্ মিছেই রাগে
বরাত দিয়েই বরাত্ ফেরাই মাত্র ন'রাত জেগে !
থাকেই যদি খারাপ কিছু হাতের চেটোয় লেখা
পারবো না কি পাল্টে দিতে ? বদ্লে দেবোই রেখা !!

'চাকুপাংচার' নাম শুনেছিস্ ? সেরেফ্ চাকুর খেল্
বৃথাই কেন নবগ্রহের পায়ে দিস্ রোজ তেল ?
পলা-নীলা-গোমেদ প'রেই ভাবিস্ বুঝি তুই
লোহা ছুঁলেই সোনা হবে আর পুঁটি ধরলেই রুই ?

গণ্ডা-দশেক তাবিজ-কবচ আর মাদুলির জোরে
ভেবেছিস কি, গ্রহদের তুই রাখিবি বেঁধে ধ'রে ?
মার্ গুলি সব ফালতু কথায়, বুজরুকি-কা-বাত্
লোক-ঠকানো কথার প্যাঁচে মিছেই হলি কাত্ !!

দ্যাখ্রে আমার 'চাকুপাংচার', চাকুর কেরামত
চাকুর জোরেই ভাগ্য সবার করবো মেরামত !

চালাই চাকু আঁকুপাঁকু, হোস্ না ভয়েই সারা
ঘুচিয়ে দেবো শনির দশা, মুছিয়ে দেবোই ফাঁড়া !!

'বেস্পতি'কে হেঁচড়ে-টেনেই তুঙ্গে তুলে দেবো
'শাট্ আপ্' রাহু, পাকড়ে বাহু তোকেও একহাত নেবো !
ক্ষয়-ক্ষতি-যোগ, রোগ-শোক-ভোগ, মিছে দুর্ভোগ রাশি
বিলকুল সব উড়িয়ে দেবো, ফুটবে মুখে হাসি !!

বুধ-শুক্র-কেতু বক্র ? ডোণ্ট নার্ভাস্ দাদা
চাকুর টানেই করবো সোজা, দূর হবে সব বাধা !
ভাগ্যরেখা, অর্থরেখা, লম্বা লাইফ-লাইন
যাক্ না বুজে, চাকুর টানেই ফুটিয়ে দেবো ফাইন !!

গোটা-দশেক প্রাপ্তিযোগের চিহ্ন এঁকেও দেবো
'চাকুপাংচার' বাবদ মাত্র সাতশো টাকা নেবো !
থাক্ না যতই খারাপ লেখা কপালে বা হাতে
'চাকুপাংচার' আছেই যখন ভাবনা কিসের তাতে !!

হাঁচি থেকে হার্টফেল,
কাশি থেকে ক্যান্সার

বিজ্ঞানী কালু রায়, বাড়ি যার কালনায়
তরকারি রেঁধে রাতে বেঁধে ছাতে আলনায় .....
ভোরে বলে চেলে নিয়ে সব আটা-চালনায়
'ফুড-ভ্যালু' বেড়ে গেছে ঝালে-ঝোলে-ডালনায় !!

গুরু তার হাওড়ার হরিহর কুণ্ডু
যাকে-তাকে ধ'রে জোরে দ্যাখে নেড়ে মুণ্ডু !
তারপরে ফিতে দিয়ে মাপ নেয় মগজের
মগজটা ক'গজের ? ছ'গজ, না ন'গজের !!

মাপগুলো চটপট লিখে রাখে খাতাতেই
বলে, যতো ঝঞ্ঝাট সব এই মাথাতেই !
হাঁচি থেকে হার্টফেল, কাশি থেকে ক্যান্সার
কিভাবেতে কেন হয়, দেবে বলে অ্যান্সার !!

পর পর বিশবার ওঠে যদি হেঁচকি
খেতে হবে কুড়ি-কেজি ডুমুরের ছেঁচকি !
ঘন-ঘন 'হাই' যদি ওঠে, তবে শঙ্কা
গুনে-গুনে ন'হাজার খেতে হবে লঙ্কা !!

হেঁচকি ও হাই থেকে হতে পারে আমাশা
হরিহর কুণ্ডুর সাথে নয় তামাশা !
আগাগোড়া গুলে খাওয়া ওর সব বিজ্ঞান
তবু লোকে বলে ওকে, নেই নাকি ঠিক জ্ঞান !!

আসলেতে গেঁয়ো-যোগী পায় নাতো ভিক্ষা
বিদেশীরা ওর কাছে নিতে আসে শিক্ষা !
পারো যদি ওর সাথে যোগ দিও ফিস্টে
নাম ওর লেখা আছে 'নোবেল'-এর লিস্টে !!

হারানো স্বর

তরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়

বাংলা সঙ্গীত জগতে গায়ক এবং সুরকার কিরণকুমার দারুণ জনপ্রিয়। শিল্পীর কণ্ঠে নতুন কোনো ক্যাসেট বেরুলে কাড়াকাড়ি পড়ে যায়। কোনো সঙ্গীত আসরে বসলে তো কথাই নেই। এই অবস্থায় কিছুদিন যাবত শিল্পী যেন নিরুদ্দেশ। শিল্পীর গলায় নতুন গানও শুনতে পাওয়া যাচ্ছে না, কোনো ক্যাসেটও বেরুচ্ছে না। বাজারে নানারকম গুজব।

অথচ সাংবাদিকরা যকন কিরণকুমারের ফ্ল্যাটে গেছেন, শিল্পী সবার সঙ্গেই হাসিমুখে কথা বলেছেন, চা-বিস্কুট খাইয়েছেন। কিন্তু কেন তিনি গান বন্ধ করেছেন, সে প্রশ্নের উত্তরটা সযত্নে এড়িয়ে গেছেন।

কিরণকুমারের যোধপুর পার্কের ফ্ল্যাটটা বেশ বড়-সড়। তার মধ্যে হরেক বাদ্যযন্ত্রে সাজানো একটা ঘর তাঁর সঙ্গীত সাধনার জন্য নির্দিষ্ট। ইদানীং প্রায়ই সেই ঘরে মাঝরাত্তিরে চোখের জল ফেলছেন কিরণকুমার। পাড়া নিশুতি হয়ে গেলে ঘরের জানলা দরজা বন্ধ করে হারমোনিয়ামটা টেনে নিয়ে বসেন। নিজেরই একটা পুরনো জনপ্রিয় গান গাইতে চেষ্টা করেন। না, হচ্ছে না। কিছুতেই আর গলাটাকে আগের মত খেলাতে পারছেন না। ওপর দিকে গলাটা তুলতে গেলেই ক্র্যাচ করে যাচ্ছে।

ঘটনার সূত্রপাত কিছুদিন আগে।

ভোরে ঘুম থেকে উঠে রেওয়াজ করা শিল্পীর বহুদিনের অভ্যেস। সেদিন সকালে একটা গান তুলতে গিয়ে গলাটা হঠাৎ শুকিয়ে গেল। প্রথমে ভেবেছিলেন ঠাণ্ডা লেগেছে। অনেকক্ষণ ধরে গরম জলে গার্গল করলেন। আদা লবঙ্গ চিবুলেন। কিন্তু কিছুতেই কিছু হলো না। এক নামকরা এম. ডি. ডাক্তার কিরণকুমারের হাউস ফিজিসিয়ান। বিকেলের

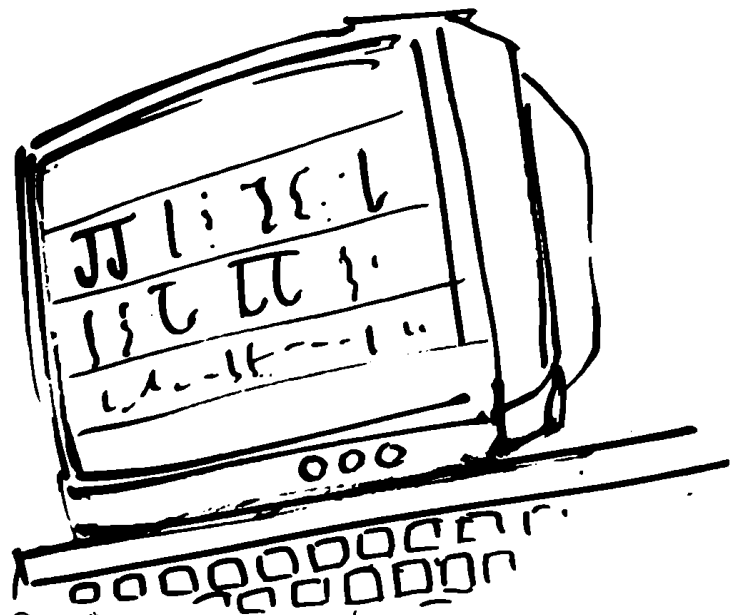

দিকে তাঁকে ফোনে ডেকে পাঠালেন। ডাক্তারবাবু গলা পরীক্ষা করে ওষুধপত্র লিখে দিলেন, ভেপার নিতে বললেন।

কিন্তু পাঁচ দিনেও যখন গলা আগের মত হলো না, তখন কিছুটা ভয় পেয়ে গেলেন কিরণকুমার। যোগাযোগ করলেন কলকাতার বিশিষ্ট ই. এন. টি স্পেশালিস্ট ডাক্তার সুবীর বোসের সঙ্গে। ঠিক হলো, ক'দিন কিরণকুমারকে বেলভিউ নার্সিং হোমে থাকতে হবে। চিকিৎসাবিজ্ঞানের কয়েকটি অত্যাধুনিক পরীক্ষার প্রয়োজন।

সেই মত দিন দশেক পরীক্ষা-নিরীক্ষা আর ওষুধ-ইন্‌জেকশনের পর ডাক্তার বোস বললেন, — আপনার গলায় যে গণ্ডগোলটা হয়েছে সেটা কোনো অসুখের পর্যায়ে পড়ে না। খুবই অ্যাবনরমাল কেস।

কিরণকুমার হতাশ গলায় জিজ্ঞেস করলেন, — তার মানে আমি আর আগের মত গান গাইতে পারবো না ?

ডাক্তার বোস সান্ত্বনার সুরে বললেন, — সোজাসুজি কি করে উত্তর দিই বলুন ! বিদেশে চিকিৎসা এখন অনেক দূর এগিয়ে গেছে। আপনি যদি বলেন ওখানকার কোনো ডাক্তারের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারি।

'ভেবে দেখি' বলে কিরণকুমার নার্সিংহোম থেকে বাড়ি ফিরে এসেছেন। ইচ্ছে করেই ডাক্তার বোসের সঙ্গে আর যোগাযোগ করেন নি। ভবিতব্যকেই মেনে নিয়েছেন। ঠিক করেছেন আর গাইবেন না। সুর সৃষ্টি করেই বাকি জীবনটা কাটিয়ে দেবেন।

অরুণাভ কিরণকুমারের অভিন্ন-হৃদয় বন্ধু। বর্তমানে অন্টারিওতে। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কম্পুটার সায়েন্সে ডিগ্রি নিয়ে আমেরিকায় চলে যায়। বছর দুয়েক আগে কিরণকুমার একবার অন্টারিও থেকে ঘুরেও এসেছেন। ওখানকার বেঙ্গলি ক্লাবে একটা গানের আসরের ব্যবস্থা করেছিল অরুণাভ।

তা এই দুঃখজনক ঘটনার কথা অরুণাভ জানতেন না। কিরণকুমারও ইচ্ছে করেই বন্ধুকে কিছু জানান নি।

তবে অরুণাভ জেনে গেলেন। একটা প্রবাসী বাংলা পত্রিকায় খবরটা ক্লিপিং করেছিল রঙ চাপিয়ে।

সেদিনই অরুণাভ বন্ধুকে ফোন করলেন অন্টারিও থেকে, — হ্যাঁরে, কীসব পড়লুম কাগজে ! তোর নাকি গলা নষ্ট হয়ে গেছে ? তুই নাকি আর আগের মত গান গাইতে পারবি না ?

প্রথমটা গাঁই গুই করলেও শেষ পর্যন্ত কিরণকুমার সবকিছু খুলে বললেন বন্ধুকে।

ফোনের মধ্যেই দীর্ঘশ্বাস ফেললেন অরুণাভ, — মনটা ভীষণ খারাপ হয়ে গেল। আমি তো ভাবতেই পারছি না !

কিরণকুমার সহজ গলায় বললেন, — খারাপ লাগার কি আছে ? নাই বা গাইলুম ! আমি এখন নতুন নতুন সুর সৃষ্টি করছি। অধিকাংশ সুরকারই তো নিজেরা গায় না !

এর কিছুদিন পর অরুণাভ ফের একদিন রাতের দিকে ফোন করলেন কিরণকুমারকে। উচ্ছ্বসিত গলায় জিজ্ঞেস করলেন, — কিরে, কি করছিলি ?

— এই একটু আগে ভি. ডি. ও 'তে একটা সিনেমা দেখলুম। পুরনো বই।

— নিশ্চয়ই ওটাতে তোর মিউজিক ?

— হ্যাঁ, বইটাতে ছ'খানা গান আছে আমার গলায়। ছ'টাই দারুণ ক্লিক্ করেছিল।

— তার মানে ঐ গানগুলোর টানেই তুই সিনেমাটা দেখলি। . . . . তোর বুকের চাপা কষ্টটা প্রতি মুহূর্তে আমি অনুভব করি।

কিরণকুমার চুপ করে রইলেন।

কয়েক সেকেণ্ড পর হঠাৎ অরুণাভ সুর পাল্টে বললেন, — তবে তোকে আর বেশিদিন এই কষ্ট সহ্য করতে হবে না।

কিরণকুমার অবাক হলেন, — কি বলছিস আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না।

অরুণাভ রহস্য জিইয়ে রেখে বললেন, — সময় মত সব বুঝতে পারবি। তার আগে শোন, আগামী শুক্রবার আমি কলকাতায় যাচ্ছি। সকাল ন'টা নাগাদ এয়ারপোর্টে চলে আসবি। আমার সঙ্গে কিছু বাড়তি লাগেজ থাকবে, তুই গাড়িটা নিয়ে আসবি।

নির্দিষ্ট দিনে নির্দিষ্ট সময়ের কিছু আগেই কিরণকুমার এয়ারপোর্টে গিয়েছিলেন। বাড়তি লাগেজ বলতে কয়েকটা থার্মোকোলের প্যাকিং-বক্স। কাগজপত্র দেখাতে সামান্য কিছু ডিউটি নিয়ে কাস্টমস ক্লিয়ারিং সার্টিফিকেট দিয়ে দিলো।

গাড়িতে আসবার সময় একথা সেকথার পর অরুণাভ বন্ধুকে জিজ্ঞেস করলেন, — তারপর, তোর সুরসৃষ্টি কেমন চলছে বল।

কিরণকুমার নড়েচড়ে বসলেন, — সেদিন তোকে বলা হয়নি। ছায়াবাণী পিকচার্সের আগামী ছবিতে আমি মিউজিক দিচ্ছি। আমার গলা নষ্ট হয়ে যাবার পর এই প্রথম নতুন ছবিতে সাইন করলুম। তিনটে গানের সুরও কম্পোজ করা হয়ে গেছে। ভাবছি অরূপ ঘোষালকে দিয়ে গাওয়াবো।

অরুণাভ নরম গলায় বন্ধুকে ধমক দেয়, — ওসব অরূপ-টরূপ ছাড়, গানগুলো তুই-ই গাইবি।

— আমি ! গানের কয়েক জায়গায় যেরকম টান আছে — ওখানে আমার গলা উঠবেই না !

— আলবৎ উঠবে। ওঠাবার জন্যেই তো এত কাঠ-খড় পুড়িয়ে অত দূর থেকে এলুম। আবার আগের মত মুগ্ধ হয়ে লোক তোর গান শুনবে।

যোধপুর পার্কের ফ্ল্যাটে দুপুরে খাওয়া-দাওয়ার পর অরুণাভ কিরণকুমারের গানবাজনার ঘরে গিয়ে হাজির হলো। একটা প্লাগ পয়েন্টের নিচে বিদেশ থেকে আনা প্যাকিং-বক্সগুলো খুললো। একটা যন্ত্র টেপ রেকর্ডারের মত। একটা যন্ত্রের গায়ে টেলিভিসনের মত স্বচ্ছ পর্দা। আর একটা যন্ত্রের ওপরে পিয়ানোর মত একসারি রিড্।

যন্ত্রগুলো একটার সঙ্গে একটা লাগানোর ফাঁকে অরুণাভ নিজের মনে বলে যাচ্ছিল, — এই অডিও সিস্টেমটা আমাদের কোম্পানীর লেটেস্ট ইনভেনসান। দীর্ঘদিন আমরা এই নিয়ে গবেষণা চালিয়েছি।

কিরণকুমার কৌতূহলী চোখে সবকিছু দেখছিলেন।

মিনিট পনেরো পর স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে অরুণাভ বললেন, — হয়ে গেছে ! এবার তোর পুরনো গানের কয়েকটা ক্যাসেট দে। তোর গলার বিশেষত্বগুলো কম্পুটার থেকে দেখে নিই। যে বিশেষত্বগুলোর জন্যে আমরা একজনের গলা শুনলে বুঝতে পারি কার গলা।

একটা ক্যাসেট টেপরেকর্ডারের মতো যন্ত্রটার এক জায়গায় ঢুকিয়ে কয়েকটা বোতাম টিপতেই স্বচ্ছ পর্দা জুড়ে আঁকাবাঁকা রেখা ফুটে উঠলো। অরুণাভ একদৃষ্টে সেদিকে তাকিয়ে ছিলেন, আর মাঝে মাঝে খাতায় নোট করছিলেন।

পর্যবেক্ষণপর্ব শেষ হতে ক্যাসেটটা যন্ত্র থেকে বের করে অরুণাভ মিষ্টি মুখে বললেন, — ঠিক আছে, দেখে নিয়েছি। এবার নতুন সিনেমার যে গানগুলো তুই কম্পোজ করেছিস, অন্য কাকে দিয়ে গাওয়াবি ভেবেছিস, তার মধ্যে একটা তুই নিজের গলায় গা। .... কোথায় গলা বসে যাচ্ছে, ভেঙে যাচ্ছে — এসব একদম মনে আনবি না। বেশি বয়সে সবার গলা কি একরকম থাকে ? ধর সেইরকম হয়েছে ঘটনাটা।

কিরণকুমার গম্ভীর মুখে বলেন, — ওসব মন ভোলানো কথা ছাড় ! .... তাছাড়া গানগুলোর সুরে যথেষ্ট ভেরিয়েশান আছে — আমি সেভাবে গলা খেলাতেই পারবো না।

অরুণাভ জোর দিয়ে বলেন, আরেঃ, তুই তোর মত গা না ! তারপর দ্যাখ আমি কি করি।

শেষ পর্যন্ত কিরণকুমার হারমোনিয়াম আর স্বরলিপির খাতা নিয়ে বসলেন। একভাবে খাতার দিকে চোখ রেখে গেয়ে গেলেন। গান শেষ হবার পরও মাথা তুললেন না।

অরুণাভ বুঝতে পারলেন বন্ধুর মনের অবস্থাটা। পিঠে হাত রেখে বলেন, — ডোন্ট বি ইমোশানাল কিরণ !

কিরণকুমার চোখ মোছেন রুমালে, — আমি কি এই গানের স্বরলিপি তৈরি করেছি ? আমি ভাবতেই পারছি না, এটা আমার গলা !

আরে, অত ঘাবড়াচ্ছিস কেন ? — অরুণাভ সান্ত্বনা দেয় ঃ এখন তোর গানটা আমি রিউইণ্ড করে শোনাচ্ছি। তুই শুধু আমাকে বল, গানটাতে কোথায় কিরকম পরিবর্তন চাস তুই। মানে কিরকম হলে সেটা তোর মনের মত হবে। আমি সেই অনুযায়ী গানটাকে রেক্টিফাই করবো।

এরপর আধঘণ্টা পঁয়তাল্লিশ মিনিট ধরে চললো সঙ্গীত আর আধুনিক প্রযুক্তির মধ্যে টানাপোড়ন।

কি-বোর্ডে অনেকক্ষণ ধরে নানারকম সুইচ টেপাটেপির পর একসময় অরুণাভ বন্ধুকে বললেন, — এবার শোন, তোর গানটা বাজিয়ে শোনাচ্ছি। দ্যাখ, তুই যেরকম চাইছিলি সেরকম হয়েছে কিনা। সেইসঙ্গে তোর আগের গলা ফিরে এসেছে কিনা।

গানটা শেষ হলে কিরণকুমারের সারা মুখ খুশিতে দুলে উঠলো, — একি ! এ তো হুবহু আমার আগের গলা ! ঠিক আমি যেরকম চাই, সেরকমই হয়েছে গলাটা।

অরুণাভর কাছে ঘটনাটা যেন কিছুই নয়। অন্যমনস্কভাবে বললেন, — নষ্ট হয়ে যাওয়া গানকে পুনরুদ্ধার করা, বা কোনো শব্দতরঙ্গের ফ্রিকোয়েন্সিকে মড্যুলেট করাই এই অডিও সিস্টেমের কাজ।

এরপর ঐ নতুন সিনেমার আরো তিনটে গান কিরণকুমারের গলাতে কম্পিউটারে তোলা হলো। সেগুলোও রেক্টিফাই করা হলো কিরণকুমারের মর্জি মতো।

কাজ শেষ হলে অরুণাভ সুইচ অফ্ করে বললেন, — এর পরের স্টেজ, গানগুলোর সঙ্গে ব্যাকগ্রাউণ্ড মিউজিক জুড়ে দেওয়া। ওটা তোর কাজ। হয়ে গেলে আমি গানের সঙ্গে জুড়ে দেবো। .... আর একটা কথা ! ইতিমধ্যে ছবির প্রডিউসার ডিরেক্টরকে ফোনে জানিয়ে দে — অন্য কেউ নয়, সিনেমার গানগুলো তুই নিজেই গাইছিস।

কিরণকুমার কাঁচুমাচু মুখে বললেন, — ওরা যদি সেই গান শুনতে চায় ?

আমিও তো সেটাই চাইছি ! — অরুণাভ জোর দিয়ে বলেন ঃ ওরা শুনতে চাওয়ার আগে তুই নিজেই ওদের ডেকে

শোনাবি। সেইসঙ্গে প্রেসের লোককে ডাক, তোর ক্যাসেট যারা বের করে — সেই কোম্পানীর কর্তাব্যক্তিদের ডাক। আমি নিজে ওঁদের গান শোনানোর ব্যবস্থা করবো।

কিরণকুমারের গান-বাজনার ঘরটাতেই একদিকে আমন্ত্রিতদের বসানো হয়েছে। অরুণাভর প্ল্যান অনুযায়ী একটা চমক দেওয়া হবে। আমন্ত্রিতদের মুখের সামনে দু'-তিন ফুট দূরে একটা ভারি পর্দা ঝোলানো হয়েছে। তার ওপারে সবার চোখের আড়ালে গান গাইবেন কিরণকুমার। নতুন সিনেমার গান।

ঘোষণা শোনার পর আমন্ত্রিতরা নড়ে চড়ে বসলো। এ আবার কেমন ব্যবস্থা ! সবাই ভেবেছিল ভারি পর্দা সরে যাবে, অনেকদিন পর শিল্পীকে গান গাইতে দেখবে চোখের সামনে !

তবে গান শুরু হতেই সব কৌতূহল ধুয়ে মুছে সাফ।

মিনিট কুড়ি সবাই যেন মন্ত্রমুগ্ধ। তারপরই শুরু হয়ে গেল গুঞ্জন। 'হ্যাঁ, এ তো কিরণকুমারেরই সেই পরিচিত গলা !', 'কি অসাধারণ গানের কম্পোজিসন !'

গুঞ্জন মিলিয়ে যেতেই ভারি পর্দা আস্তে আস্তে একপাশে সরে গেল। দেখা গেল একটা নিচু টেবিলের ওপর চকচক করছে অরুণাভর বিদেশ থেকে আনা যন্ত্রগুলো। পেছনে হাত জোর করে হাসি হাসি মুখে দাঁড়িয়ে আছেন জনপ্রিয় সঙ্গীতশিল্পী।

কয়েক সেকেণ্ড পর ডান হাতটা যন্ত্রের ওপর রেখে কিরণকুমার বললেন, — আপনাদের শুভাকাঙ্খা আর এই যন্ত্রের দৌলতেই আমি আবার সঙ্গীত জগতে ফিরে এসেছি। .... বুঝতেই পারছেন, কেন এই নাটকটুকুর দরকার ছিল ! কারণ আপনাদের চোখের সামনে বসে গান গাওয়া আমার পক্ষে আর সম্ভব নয়। তবে আগের মত গলাতেই ফের আমার গান শুনতে পাবেন — যেমন আজ শুনলেন।

আরো দু'-চার কথা বলার পর কিরণকুমার হাত নেড়ে অরুণাভকে পাশে ডাকলেন, — এ হচ্ছে আমার বন্ধু অরুণাভ চক্রবর্তী। অণ্টারিওতে একটা অডিও কোম্পানীর রিসার্চ সায়েন্টিস্ট। আমার বুকের ওপর থেকে দুঃখের পাথরটাকে ওই নামিয়ে দিয়েছে।

বন্ধুর কথা শেষ হলে অরুণাভ ধীরে ধীরে বললেন, — আপনাদের মত আমিও কিরণের গানের প্রচণ্ড ভক্ত। আমিও চাই ও আগের মত গানে গানে ভুবন ভরিয়ে দিক। আর সেটা সম্ভব বিজ্ঞানের এই আধুনিক প্রযুক্তিতে। আসলে যদি কোনো দুর্ঘটনা না-ও ঘটে, তাহলেও একজন শিল্পীর গলা বয়স হয়ে গেলে আর আগের মত থাকে না। এটা বয়সেরই ধর্ম। কিন্তু আমার চাই, শিল্পী আজীবন একই গলায় গান গাক। বিজ্ঞান আজ এই সমস্যাটার সমাধান করে দিয়েছে। .... আমি আর বেশি কিছু বলবো না। শুধু এটুকু আপনাদের বলতে পারি, কোনো সঙ্গীত-আসরে কিরণকুমারকে আর দেখতে না পেলেও ওর গান আপনারা আগের মতই শুনতে পাবেন। নতুন নতুন গান।

With Best Compliments From :—

PHONE : 350-2718

M/S. GHOSH BOSE & CO.

CABINET MAKERS. LABORATORY FURNISHERS & ORDER SUPPLIERS.
W. B. S TAX REGD. No. SL/2306A

132A & 132B, KESHAB CHANDRA SEN STREET,
CALCUTTA-700 009

Time : – Morning : 10.00 A. M. – 11.30 A.M.
Afternoon : 4.00 P. M. – 7.00 P. M

নিম

চন্দন কর

বর্তমান কৃষিকার্যে যে সমস্ত চিরাচরিত সংশ্লেষিত (Synthetic) রাসায়নিক কীটনাশক ব্যবহার করা হচ্ছে তার ক্ষতিকর পার্শ্ব প্রতিক্রিয়ার শিকার জীবকুলসহ সারা পরিবেশ। এখন আবার অনেক কীট পতঙ্গ ও শস্য-বিনষ্টকারী-পোকা ঐ সমস্ত রাসায়নিক কীটনাশকের উপর প্রতিরোধ গড়ে তুলেছে ; ফলে দুদিন আগেও যে সমস্ত কীটনাশক সক্রিয়তার সঙ্গে কাজ করে চলেছিল আজ তারা ঠিকমত পোকাদের মোকাবিলা করতে পারছে না। তাই আজ এমন এক ধরনের 'বায়ো-র‍্যাশোনাল' (Bio-rational) কীটনাশক উৎপাদনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে যা কীটপতঙ্গ নিধন করবে অথচ পরিবেশকে ক্ষতিগ্রস্ত করবে না। এ বিষয়ে নিরাপদ কীটনাশকরূপে উদ্ভিদজাত প্রাকৃতিক জৈব রাসায়নিক পদার্থ খুব ভাল কাজ করতে পারে। ঐ সমস্ত নতুন নিরাপদ প্রাকৃতিক কীটনাশকের খোঁজে গবেষকরা প্রকৃতির গাছ-গাছড়ার উপর নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। তারা লক্ষ্য করেছেন — প্রকৃতিতে এমন কিছু উদ্ভিদ রয়েছে যারা রাসায়নিক পদ্ধতির মাধ্যমে বিভিন্ন ক্ষতির হাত থেকে নিজেদের রক্ষা করে চলেছে। বিভিন্ন পরীক্ষায় দেখা গেছে উদ্ভিদ দেহে এমন কিছু আভ্যন্তরীন রাসায়নিক পদার্থ গঠিত হয় যারা বিভিন্ন উপায়ে ক্ষতিকর কীটপতঙ্গদের দূরে সরিয়ে রাখে। যেমন

এক. কিছু রাসায়নিক পদার্থের উপস্থিতিতে উদ্ভিদের বিভিন্ন অংশের স্বাদ এমন কটু হ'য়ে থাকে যে কীটপতঙ্গ তাদের সরাসরি প্রত্যাখান করে।

দুই. বিশেষ কিছু উদ্ভিদ কোষের রাসায়নিক উপাদান আবার পোকামাকড়দের জননচক্রে বাধা সৃষ্টি করে, ফলে ডিম পাড়া থেকে বিরত থেকে বংশবৃদ্ধি রোধ করে।

তিন. কিছু উদ্ভিদ কোষের আভ্যন্তরীন রাসায়নিক উপাদান ক্ষতিকর ব্যাক্টেরিয়াকে নিধন করে এবং ছত্রাকের রেনুর অঙ্কুরোদ্গমে বাধা দিয়ে তাদের হাত থেকে নিজেদের রক্ষা করে।

উপরিউক্ত কোষ আভ্যন্তরীণ শক্তিশালী রাসায়নিক পদার্থগুলোর পরিচয় জানার জন্য বিভিন্ন পরীক্ষা নিরীক্ষার আশ্রয় নিয়ে দেখা গেছে — উদ্ভিদ ভিন্ন প্রকৃতির যে সমস্ত গৌণ বিপাকজাত পদার্থ উৎপন্ন করে তারাই উদ্ভিদের রক্ষণাত্মক অস্ত্র হিসাবে কাজ করে। সেগুলি হল — উপক্ষার, সায়ানোজেনিক ও ট্রাইটারপিন গ্লাইকোসাইডস্, অপ্রোটিন অ্যামাইনো অ্যাসিড, ফেনল এবং ফ্ল্যাভোনয়েডস্ ইত্যাদি।

যদিও অনেক গাছের সাংগঠনিক রাসায়নিক উপাদান নিরাপদ কীটনাশক হিসাবে কাজ করতে সক্ষম, তবুও প্রাকৃতিক প্রতিরোধক হিসাবে নিম গাছের তুলনা নেই। এই উপ-উষ্ণ-অঞ্চলীয় উদ্ভিদটির বৈজ্ঞানিক নাম অ্যাজাডিরেচাটা ইণ্ডিকা (Azadirachta indica)। আদি বাস বার্মা। এখন ভারতবর্ষ ও পশ্চিম আফ্রিকায় প্রাচুর্য দেখা যায়। উষ্ণঅঞ্চলের সমস্ত রকম মাটিতে এমন কি কমপুষ্টিযুক্ত মাটিতেও নিম দ্রুত বৃদ্ধি পায়। নিমের বেশী তাপমাত্রা সহ্য করার ক্ষমতা অপরিসীম। তাই খরা প্রবল অঞ্চলেও অনায়াসে বাঁচতে পারে।

প্রাচীনকালেও নিমের যে সমাদর ছিল তার উল্লেখ পৌরানিক কাহিনীতে পাওয়া যায় —

স্বর্গের মধু অমৃত যখন পৃথিবীর বুক থেকে স্বর্গলোকের দেবতাদের কাছে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল তখন তার থেকে কয়েক ফোঁটা পড়েছিল নিমগাছের উপর। সেই থেকে নিমগাছের ঔষধি এবং কীটনাশক গুণাবলী সকলেরই জানা। অথচ প্রকৃতির ভাণ্ডারে এতগুণসম্পন্ন উদ্ভিদটির কদর আমরা আজও বোঝার চেষ্টা করি নি। ফলে তেমনভাবে গ্রহণ করতেও পারিনি। বলতে দ্বিধা নেই নিম মূল্যবান উদ্ভিদের অন্যতম হলেও আজও সবচেয়ে উপেক্ষার পাত্র। তা না হলে প্রধানতঃ জ্বালানী হিসাবেই তার অন্তিম পরিণতি দেখা যাবে কেন ?

নিম গাছ আজ কয়েক বছর আবার সংবাদের শিরোনামে। আধুনিক পাশ্চাত্য বিজ্ঞান নিম গাছকে পুণরায় আবিষ্কার করেছে অত্যন্ত মূল্যবান গাছ হিসাবে। পাশ্চাত্য দেশের কাছ থেকে নিমের গুণাবলীর কথা আমাদের কাছে ঢেউয়ের মত ভেসে আসতেই আমরা ভারতীয়রা হঠাৎ সচেতন হ'য়ে উঠলাম যে নিম এবং তার উৎপাদন বিদেশে পেটেন্ট করে নেওয়া হচ্ছে। পরিবেশ সংরক্ষক, কৃষি — উৎপাদন বৃদ্ধির সহায়ক, কীটনাশক ও রোগ নিরাময় করার ক্ষমতার জন্য এই বৃক্ষের জুড়ি নেই। অথচ মজার কথা হল নিমের প্রচলিত ঐতিহ্যময় গুণাবলী এবং বৈশিষ্ট্য আধুনিক বিজ্ঞানের সম্মতি লাভ করলেও এর জন্য সমস্ত কৃতিত্ব ভারতবর্ষকে হারাতে হচ্ছে বিদেশের কাছে।

এক. পরিবেশে সংরক্ষক হিসাবে নিম ঃ

ইণ্ডিয়ান টক্সিকোলজিক্যাল রিসার্চ ইনস্টিটিউট এবং ন্যাশানাল বোটানিকাল রিসার্চ ইনস্টটিউটের বিজ্ঞানীরা দাবী করেছেন যে নিমগাছ দূষিত পরিবেশ থেকে ধুলো এবং বিষাক্ত গ্যাস শোষণ করতে সক্ষম। তাই পরিবেশের বায়ু দূষণের কবল থেকে মুক্তি পেতে নিম গাছের প্রয়োজন অপরিসীম।

দুই. কৃষি-উৎপাদন বৃদ্ধিতে নিম ঃ

নিমের সবচেয়ে আকর্ষনীয় চরিত্র হচ্ছে যে তারা কৃষি অনুপোযুক্ত অনুর্বর মাটিকে শস্য সক্ষম উর্বর মাটিতে রূপান্তরিত করতে সক্ষম। নিমের দীর্ঘ প্রসারিত ও উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন মূলতন্ত্র মাটির গভীর থেকে পুষ্টি সংগ্রহ করে। ঐ পুষ্টিরস পরে আরও গুণসম্পন্ন হ'য়ে মাটিতে ফিরে আসে তখনই যখন নাইট্রোজেনযুক্ত নিমপাতা (PH 8.2) মাটিতে পড়ে পচে জৈব সার হিসাবে মিশে যায়।

তিন. কীটনাশক রূপে নিম ঃ

নিমের পাতা ও বীজে রয়েছে অ্যাজাডিরাচটিন (Azadirachtin) নামক এক বিশেষ জৈব রাসায়নিক পদার্থ যা বহু কীটপতঙ্গদের বৃদ্ধিকে ব্যাহত করে। বিভিন্ন পরীক্ষায় দেখা গেছে উক্ত জৈব রাসায়নিক পদার্থটির কোনরকম পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া নেই। এখন তাই বহু বিতর্কিত DDT-র পরিবর্তে অ্যাজাডিরাচটিনকে ব্যবহারের কথা বলা হচ্ছে। বিশ্বাসই করা যায় না যে মাত্র ০.১ পি পি এম ঘনত্বেও অ্যাজাডিরাচটিন দারুণভাবে কার্যকরী।

নিমের অন্তঃবীজে থায়োরিমোন (Thioremone) নামে আর এক ধরনের বিষহীন রাসায়নিক দ্রব্য পাওয়া যায় যার স্বাদ ও গন্ধ কীটপতঙ্গরা একেবারেই পছন্দ করে না। তাই থায়োরিমোন স্প্রে করে কীটপতঙ্গদের বিকর্ষিত করে শস্যাদি রক্ষা করা সম্ভব।

দাবী করা হচ্ছে নিমবীজ নিঃসৃত পদার্থ কমপক্ষে ১২৪ রকম খাদ্যশস্য বিনষ্টকারী পোকা নিধনে দারুণ সুফল পাওয়া গেছে। তাছাড়া লক্ষ্য করা গেছে যে নিম নিঃসৃত পদার্থকে বিভিন্ন প্রজাতির উদ্ভিদ চারার মধ্যে প্রবেশ ঘটিয়ে তাদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে।

চার. রোগ নিরাময়ে নিম ঃ

আযুর্বেদে নিম গাছের সামগ্রিক ভাবে নানা ভেষজগুণাবলির বর্ণনা আছে, নিমগাছের ফুল, বীজ, পাতা, ছাল, শিকড় — প্রতিটি অংশতেই কিছু না কিছু ঔষধ সংক্রান্ত বৈশিষ্ট্য আছে।

ম্যালেরিয়া, ভাইরাসজাত রোগ, অ্যালার্জি, একজিমা, স্ক্যার্বি, ফুলে যাওয়া, পাওরিয়া, ফাঙ্গাস, ব্যাক্টেরিয়া, কীট, লাভা উত্যাদি নানা রোগ এবং ক্ষতিকর জীবাণু প্রতিরোধের সহায়ক নিম।

পেটের অসুখের ক্ষেত্রে নিমপাতা উপকার দেয়। গ্রীষ্মের চর্মরোগ, ফোঁড়া ইত্যাদি থেকে রক্ষা পাওয়ার উপায় নিমপাতা ভেজানো জল। এছাড়া ডায়াবেটিস রোগের জন্য নিমপাতা অত্যন্ত উপকারি। দাঁত পরিষ্কারের কাজে নিম দাঁতনের ব্যবহার সর্বজনবিদিত। নিমবীজের তেলে অ্যান্টিসেপ্টিক গুণ থাকায় সেই তেল বিভিন্ন সাবান, টুথপেস্ট, বিভিন্ন প্রসাধনী নির্মানে ব্যবহার করা হয়।

আমাদের দেশে ৪০ মিলিয়ন নিমগাছ রয়েছে যা থেকে ২ মিলিয়ন টন বীজ উৎপাদন সম্ভব কিন্তু আমরা সম্ভাব্য পরিমাণের ১/৪র্থ অংশও সংগ্রহ করে উঠতে পারছি না এবং ৩/৪ অংশ নষ্ট হ'য়ে যাচ্ছে। এই মোট নষ্ট হ'য়ে যাওয়া বীজের পরিমাণ যদি যথাযথভাবে ব্যবহার করা যায় তাহলে এর থেকে আমরা ১ মিলিয়ন টন সার এবং ০.২ মিলিয়ন টন তেল ও প্রচুর পরিমাণের 'বায়োমাস' সংগ্রহ করতে পারি এবং বীজ সংগ্রহকারক হিসেবে বহু উপজাতি সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষের কর্ম সংস্থান করতে পারি। এছাড়া প্রসেসিং ইউনিটে কাজ করার সুযোগও তৈরী হবে।

সবশেষে একথা বলতে পারা যায়, হাজার হাজার বছর আগে আমাদের পূর্বপুরুষরা নিমের যে গুরুত্ব অনুধাবন করতে পারলেন আজ আমরা বিংশ শতাব্দীর মানুষ হয়েও নিমকে তেমনভাবে গ্রহণ করতে পারলাম না কেন ? নিমের বহুমুখী গুণাবলী থাকা সত্বেও আমরা কেন তাকে অবজ্ঞার রাজ্যে ফেলে রেখেছি ?

ধূমকেতু রহস্য ও হেইল্-বপ

অমলেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

এই বছর মানে ১৯৯৬ সালে, মার্চ মাসের একেবারে শেষের দিকে, তোমরা রাতের আকাশে কী একটা ধূমকেতু দেখেছিলে ? মার্চ মাসের ২৪, ২৫ ও ২৬ তারিখে, এই ধূমকেতুটিকে সন্ধ্যাবেলার খানিকটা পরে, উত্তর-পূর্ব আকাশে সপ্তর্ষিমণ্ডলের সামান্য উত্তর দিকে, খালি চোখেই দেখা সম্ভবপর হয়েছিল। সপ্তর্ষিমণ্ডলকে তোমরা আকাশে হয়তো অনেকেই চেন, কারণ সাতটি তারায় গঠিত এই মণ্ডলটি দেখতে একটি জিজ্ঞাসা চিহ্নের মতো। প্রাচীন ভারতের সাতজন ঋষির নাম অনুসারে সাতটি তারার নাম দেওয়া হয়েছিল, ক্রতু, পুলহ, পুলস্ত্য, অত্রি, অঙ্গিরা, বশিষ্ঠ ও মরীচি। ২৬ মার্চের পরে এই ধূমকেতুর ঔজ্জ্বল্য একটু একটু করে কমে গিয়েছিল, তাই কলকাতা বা শহরের আকাশে একে খালিচোখে দেখা আর সম্ভবপর হয়ে ওঠেনি। এই ধূমকেতুটির নাম ছিল "ধূমকেতু হাইয়্যাকুতাকে" (Comet Hyakutake)। এই ধূমকেতুটি আবিষ্কার করেন এবছরে ৩০ জানুয়ারির মধ্য রাত্রে, জাপানের হায়াতো শহরের একজন অপেশাদার জ্যোতির্বিজ্ঞানী, নাম তাঁর ইউজি হাইয়্যাকুতাকে। একটি শক্তিশালী বাইনোকুলারের সাহায্যে তাঁর এই আবিষ্কার। ওঁরই নামানুসারে ধূমকেতুটির নামকরণ হয়েছে "হাইয়্যাকুতাকে"। কিন্তু এই ধূমকেতুটি যে মার্চ মাসের একেবারে শেষের দিকে বেশ উজ্জ্বল হয়ে উঠবে, আর তাকে খালি চোখে দেখা সম্ভবপর হবে, এই খবর জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা খুব আগে থেকে সাধারণ মানুষকে জানিয়ে দিতে পারেননি। এর জন্যে দায়ী দুটি কারণ — প্রথমত অগ্রিম বিজ্ঞপ্তি না দিয়েই এই ধূমকেতুটি অকস্মাৎ বেশ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল, আর দ্বিতীয়ত, পৃথিবীর আকাশে খালি চোখে দেখার মতো ঔজ্জ্বল্য এর খুব অল্প সময়ের জন্যে ছিল। তাই রাতের আকাশে, গত মার্চ মাসে, তোমরা অনেকেই এই ধূমকেতু হাইয়্যাকুতাকে-কে খালি চোখে দেখার সুযোগ হারিয়ে ফেলেছ।

চিত্র : ১ – অ্যালান হেইল্ ও তাঁর ১৬-ইঞ্চি দূরবিন।

কিন্তু নিরাশ হওয়ার কোন কারণ নেই। এখন তোমাদের যে ধূমকেতু সম্পর্কে আলেখ্য দেব, তাকে কলকাতার আকাশেই, অথবা ভারতের যে কোনও স্থানের আকাশেই বেশ কিছুদিন ধরে খালি চোখে দেখতে পাবে, আগামী ১৯৯৭ সালের ফেব্রুয়ারি থেকে, কখনো সন্ধ্যাবেলার আকাশে, আবার কখনো ভোরবেলার আকাশে। এই নতুন আবিষ্কৃত ধূমকেতুটির নাম "হেইল্ - বপ" (Hale-Bopp)। এরই কথা তোমাদের বিস্তারিত ভাবে বলব।

প্রথমেই বলি এই ধূমকেতুটির আবিষ্কারের কাহিনী। দিনটা ছিল ১৯৯৫ সালের ২৩ জুলাই — এই দিন রাতে মার্কিন দেশের দুই অপেশাদার জ্যোতির্বিজ্ঞানী দুটি সম্পূর্ণ ভিন্ন স্থান থেকে স্বাধীনভাবে ধনুরাশিতে অবস্থিত এম ৭০ (M 70) নামে একটি বর্তুলাকার নক্ষত্রগুচ্ছ (globular star cluster) দূরবিন সাহায্যে পর্যবেক্ষণ করছিলেন। একজন

হলেন অ্যালান হেইল্ (Alan Hale), ইনি নিউমেক্সিকো প্রদেশের ক্লাউডক্রফট থেকে একটি ১৬-ইঞ্চি দূরবিন মাধ্যমে দেখছিলেন। আর একজন হলেন টমাস বপ (Thomas Bopp), ইনি পর্যবেক্ষণ করছিলেন অ্যারিজোনা প্রদেশের স্ট্যানফিল্ড থেকে, এঁর হাতিয়ার ছিল ১৭¼-ইঞ্চি ব্যাসের দূরবিন। দুজনেই ধনুরাশিতে একটি নতুন ধূমকেতু পর্যবেক্ষণ করলেন। এই নতুন ধূমকেতুর নামকরণ করা হল "ধূমকেতু হেইল্-বপ" (Comet Hale-Bopp)। একটা কথা এখানে খেয়াল করতে হবে, আবিষ্কারের সময়ে ধূমকেতুটির অবস্থান ছিল, বৃহস্পতির কক্ষপথেরও অনেক বাইরে, অর্থাৎ পৃথিবী থেকে অনেক অনেক দূরে। সূর্য থেকে এত দূরে অবস্থিত কোনও ধূমকেতু আবিষ্কারের কৃতিত্ব আজ পর্যন্ত কোনও অপেশাদার জ্যোতির্বিজ্ঞানীর জীবনে ঘটেনি, এঁরা দুজনে এই দৃষ্টান্ত সর্বপ্রথম স্থাপন করলেন। আর সাধারণত সূর্য থেকে এত দূরে, কোনও ধূমকেতু একটি ছোট দূরবিন মাধ্যমে দর্শনযোগ্য হয়েও ওঠে না, কিন্তু এই ধূমকেতুটির বেলায় তা হয়েছে। এর থেকে একটা সিদ্ধান্তে জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা এলেন, সেটা হল এই : সূর্য থেকে এত দূরে অবস্থান কালেই যখন ধূমকেতুটি এত উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে, তাহলে সূর্যের কাছে উপস্থিত হলে, নিশ্চয়ই একে আরও উজ্জ্বল অবস্থায় দেখা যাবে। তাই জ্যোতির্বিজ্ঞানের এই আবিষ্কার, সারা পৃথিবীর বিজ্ঞানীদের খুব বিস্মিত করেছে।

হাওয়াই দ্বীপের মউনাকি পর্বতের ওপর বর্তমানে আছে, পৃথিবীর সবচেয়ে শক্তিশালী দূরবিন, তার নাম 'কেক টেলিস্কোপ' (Keck Telescope), এর আয়নার ব্যাস ৪০০ ইঞ্চি। এই দূরবিন সাহায্যে আর ইলেকট্রনিক সিসিডি ক্যামেরা দিয়ে এই ধূমকেতুটির বেশ কিছু আলোকচিত্র সংগৃহীত হল, এই ধূমকেতু আবিষ্কারের দু'সপ্তাহের মধ্যে। সেইসব ছবি ও আকাশের অবস্থান পর্যালোচনা করে, সুপার কম্পিউটারের সাহায্যে হেইল্-বপের সূর্যের চারিদিকে পরিক্রমণ পথ এবং একবার পরিক্রমণ করার সময় গণনা করা সম্ভবপর হয়েছে। দেখা গেছে, সূর্যের চারদিকে একবার পরিক্রমণ করতে হেইল্-বপের সময় লাগে ৩০০০ বছর। তার মানেই হল, এই ধূমকেতুর কক্ষপথ সুদীর্ঘ উপবৃত্তাকার।

চিত্র : ২ – টমাস বপ ও তাঁর ১৭$\frac{১}{২}$ ইঞ্চি দূরবীণ।

এই প্রসঙ্গে ধূমকেতুর জ্যোতির্বিজ্ঞান সম্পর্কে কিছু তথ্য তোমাদের জেনে রাখা প্রয়োজন। পৃথিবী সমেত নটি গ্রহ যেমন সৌরপরিবারের সদস্য, তেমনি ধূমকেতুও সৌরপরিবারের অন্তর্ভুক্ত, কিন্তু তার চলার পথ আদৌ গ্রহের মতো নয়। গ্রহগুলোর সূর্যের চারদিকে পরিক্রমণ পথ এক একটি উপবৃত্ত (Ellipse) অর্থাৎ বৃত্তের মতো একেবারে গোল না হয়ে একটু সামান্য লম্বাটে ধরনের — একটা ছোট মুরগীর ডিম যেমন একেবারে গোল নয়, একদিকে সামান্য একটু চাপা, সেই রকম। কিন্তু কিছু কিছু ধূমকেতুর বেলায় এই পরিক্রমণ-পথ এক একটি সুদীর্ঘ উপবৃত্ত তার মানেই হল ডিমের আকৃতি না হয়ে একটা লম্বা পটলের আকৃতি। ধূমকেতুর কক্ষ উপবৃত্ত হওয়া মানে হল, তাকে নির্দিষ্ট সময় পর পর পৃথিবীর আকাশে ফিরে আসতে দেখা যাবেই। এদের বলা হয় প্রত্যাবর্তনশীল (Periodic) ধূমকেতু। ঘুরতে ঘুরতে যখন ধূমকেতু সূর্যের সব থেকে কাছে এসে পৌছয়, সেই অবস্থানকে বলা হয় বিজ্ঞানের ভাষায় অনুসূর অবস্থান (perihelion)। আবার চলতে চলতে ধূমকেতু এক সময় সূর্য থেকে সবচেয়ে দূরতম স্থানে চলে যায়, এই অবস্থানকে বলা হয় অপসূর অবস্থান (aphelion)। ধূমকেতু যখন সূর্য থেকে বহু দূরে অপসূর অবস্থানে থাকে, তখন এর কেন্দ্রীয় অংশটি জমাট বাঁধা বরফের গোল পিণ্ড হিসেবে থাকে। অপসূর অবস্থানে মহাকাশের খুব নিম্ন তাপমাত্রা, আর এত নিম্ন তাপমাত্রায় ধূমকেতুর কেন্দ্রীয় অংশ (nucleus)-য়ের গ্যাসীয় উপাদানগুলি থাকে জমাট বাঁধা বরফের অবস্থায়। আর এই ঘন জমাট বাঁধা কেন্দ্রীয় অংশকে ঘিরে থাকে হালকা গ্যাসের এক আবরণ, এর মধ্যে ধূলিকণার মতো কিছু কঠিন বস্তুও থাকে। ধূমকেতুর মাথায়

এই বাইরের গ্যাসের আবরণকেই বলা হয় কোমা (Coma)। যতই ধূমকেতুটি সূর্যের কাছে এগোতে থাকে, ততই সূর্যের প্রবল মহাকর্ষের ফলে এবং প্রবল তাপের দরুণ ধূমকেতুর দেহের বাহ্য পরিবর্তন ঘটতে থাকে। তখন সূর্যের ক্রমবর্ধমান তাপের প্রভাবে ধূমকেতুর কঠিন অংশের প্রায় সবটাই গ্যাসীয় রূপ ধারণ করে। তখন সৌর বিকিরণের চাপ (radiation pressure) সৃষ্টি হয়। এই চাপের সঙ্গে যুক্ত হয় সূর্যনিঃসৃত পারমাণবিক কণিকার প্রবাহ। এই দুইয়ের দ্বারা তাড়িত হয়ে ধূমকেতুর বিশাল গ্যাসীয় অংশটি সূর্যের বিপরীত দিকে বিস্তৃত হতে থাকে, আর এর থেকেই পাই ঝাঁটার মতো উজ্জ্বল লেজ নিয়ে একটি ধূমকেতু। আর এখানে একটি কথা মনে রেখে দিতে হবে, সূর্যের বেশ নিকটে এলেই আমরা ধূমকেতুর উজ্জ্বল রূপটি আকাশে দেখতে পাই।

প্রত্যাবর্তনশীল ধূমকেতুদের মধ্যে সবচেয়ে উজ্জ্বল ধূমকেতু হল হ্যালির ধূমকেতু। আমাদের পৃথিবীর আকাশে কোনো ধূমকেতুর আগমন হয় অকস্মাৎ, বেশ কয়েক দিন বা বেশ কিছুদিন ধরে তাকে আকাশে আমরা দেখতে পাই, তারপর যেমন অকস্মাৎ সে এসে উপস্থিত হয়েছিল তেমনি অকস্মাৎ একদিন আমাদের দৃষ্টির বাইরে চলে যায়। তাই

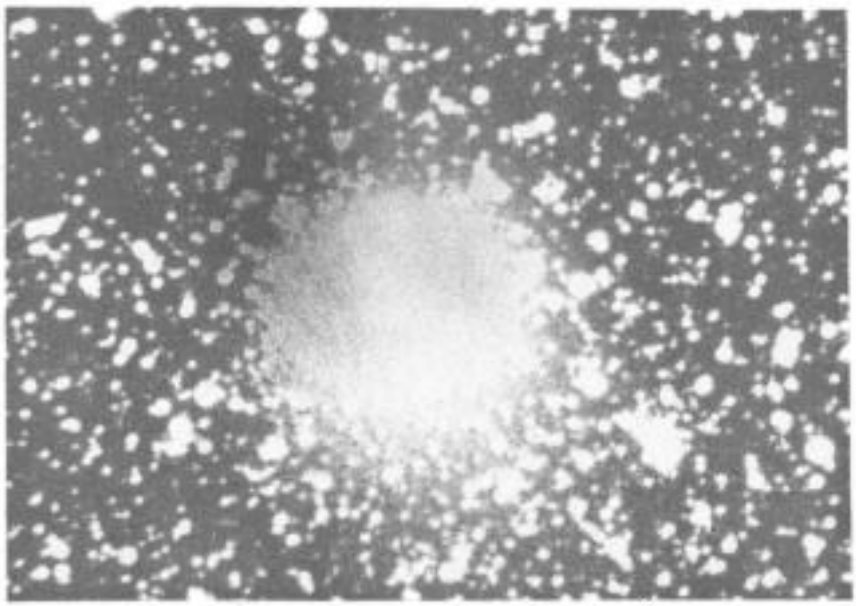

চিত্র : ৩ – হাওয়াই দ্বীপের মউনাকি পর্বতের ওপর ৪০০-ইঞ্চি কেক-টেলিস্কোপের মাধ্যমে ধূমকেতু হেইল্-বপের আলোকচিত্র —২ আগস্ট, ১৯৯৫।

ধূমকেতু লেজ ঝাঁটার মতো আকৃতি পায়। তাই জেনে রাখা দরকার, সব সময়েই ধূমকেতুর লেজটা সূর্য যেদিকে থাকে তার বিপরীত দিকে প্রক্ষিপ্ত হয়, আর যেসব ধূমকেতুর লেজ গজায়, সেটা হয় সূর্যের কাছে এলেই। একটা কথা তোমরা সর্বদা মনে রাখবে, সৌর জগতে সূর্য ছাড়া আর কারোর নিজের আলো নেই, সূর্যের আলো আমাদের পৃথিবীর উপগ্রহ চাঁদের ওপর পড়ে, তারপর সেই প্রতিফলিত আলো আমাদের চোখে এসে পড়ে, তখনি আমরা রাতের আকাশে দেখতে পাই অপরূপ উজ্জ্বল চাঁদ, আসলে চাঁদের নিজের কোনো আলো নেই। তেমনি ধূমকেতুরও নিজের কোনো আলো নেই, সূর্যের কাছে এলে, ধূমকেতুর কোমার গ্যাসের ওপর সূর্যের আলো এসে পড়ে, সেই প্রতিফলিত আলো যখন আমাদের চোখে এসে পড়ে তখনি আমার দেখতে

ধূমকেতু সম্পর্কে বহুদিন পর্যন্ত মানুষের ধারণা ছিল, ওরা মহাকাশে বড় এলোমেলোভাবে ঘুরে বেড়ায়, ওদের চলাফেরার কোন নিয়ম বা শৃঙ্খলা নেই।' এই ধারণাকে যিনি সর্বপ্রথম ভাঙ্গলেন, তিনিই হলেন এডমণ্ড হ্যালি, ইনি ইংলণ্ডের মানুষ ছিলেন। ১৬৮২ সালে হ্যালির যখন ২৬ বছর বয়স, তখন ইউরোপের আকাশে দারুণ উজ্জ্বল এক ধূমকেতুর আবির্ভাব হয়, হ্যালি তখন অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে গণিতের ছাত্র। হ্যালি এই ধূমকেতুটির আকাশের অবস্থান রাতের পর রাত পর্যবেক্ষণ করতে লাগলেন, যতদিন পর্যন্ত তাকে দেখা গেল। তারপর ধূমকেতুটি চলে যাওয়ার পরে, গভীরভাবে নিমগ্ন হলেন,

তার চলার পথের গাণিতিক রূপটি স্থির করার জন্যে। অবশেষে পারলেন, হ্যালি গণনা করে দেখলেন, সূর্যকে একবার পরিক্রমণ করার সময় এই ধূমকেতুটির লাগা উচিত ৭৫-৭৬ বছর। হ্যালি ঘোষণা করলেন, এই ধূমকেতুটিকে পৃথিবীর আকাশে আবার দেখা যাবে আগামী ১৭৫৮ সালে। সত্যি সত্যিই তাকে দেখা গেল ১৭৫৮ সালে, কিন্তু তখন হ্যালি আর বেঁচে ছিলেন না, পরিণত বয়সে ১৭৪২ সালে হ্যালি পরলোক গমন করেন। নির্ভুলভাবে এই ধূমকতুটির পরিক্রমণপথ ও পরিক্রমণকাল গণনা করার জন্যে, হ্যালির নামে এই ধূমকেতুটির নামকরণ করা হল "হ্যালির ধূমকেতু" (Halley's Comet)। হ্যালির এই আবিষ্কার, তত্ত্বগত জ্যোতির্বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এক অন্যতম শ্রেষ্ঠ আবিষ্কার হিসেবে চিহ্নিত। আর সত্যি কথা বলতে কী, জ্যোতির্বিজ্ঞানের ইতিহাসে এই ধূমকেতুটি হ্যালিকে অমর করে রেখেছে।

ভালভাবে দেখা যায়নি, দেখা গিয়েছিল অন্তত আট বা দশ ইঞ্চি দূরবিন সাহায্যে। অথচ ১৯১০ সালে হ্যালিকে আমাদের আকাশে দেখা গিয়েছিল দারুণ উজ্জ্বল এক ধূমকেতু হিসেবে, খালিচোখে হ্যালির লেজের দৈর্ঘ্য দেখা গিয়েছিল ২ কোটি ৫০ লক্ষ কিলোমিটার। কিন্তু ১৯৮৬ সালে খালিচোখে হ্যালির এমন রূপ দেখা গেল না কেন ? এই কারণটি ভাল করে বুঝতে হবে। ১৯১০ হ্যালি যখন সূর্যের নিকটতম অবস্থানে ছিল, পৃথিবীও ছিল তার বেশ নিকটে একই দিকে, আর তাই হ্যালির সবচেয়ে উজ্জ্বল ও দীর্ঘতম লেজের আকৃতিটা খালিচোখে দেখা সম্ভবপর ছিল। কিন্তু ১৯৮৬ সালে হ্যালি যখন সূর্যের নিকটতম অবস্থানে এসে উপস্থিত হল, তখন সূর্যের যেদিকে হ্যালি ছিল, আমাদের পৃথিবীর অবস্থান ছিল ঠিক উল্টোদিকে, আর তারই ফলে ১৯৮৬ সালে হ্যালির আবির্ভাব আমাদের কাছে খালিচোখে মোটেই উজ্জ্বল হয়ে ওঠেনি। কিন্তু ১৯৮৬ সালে বিজ্ঞানীরা একটা বিরাট গুরুত্বপূর্ণ কাজ করতে সমর্থ হন, সেটা হল পাঁচটি মহাকাশযান পৃথিবী থেকে হ্যালির ধূমকেতু

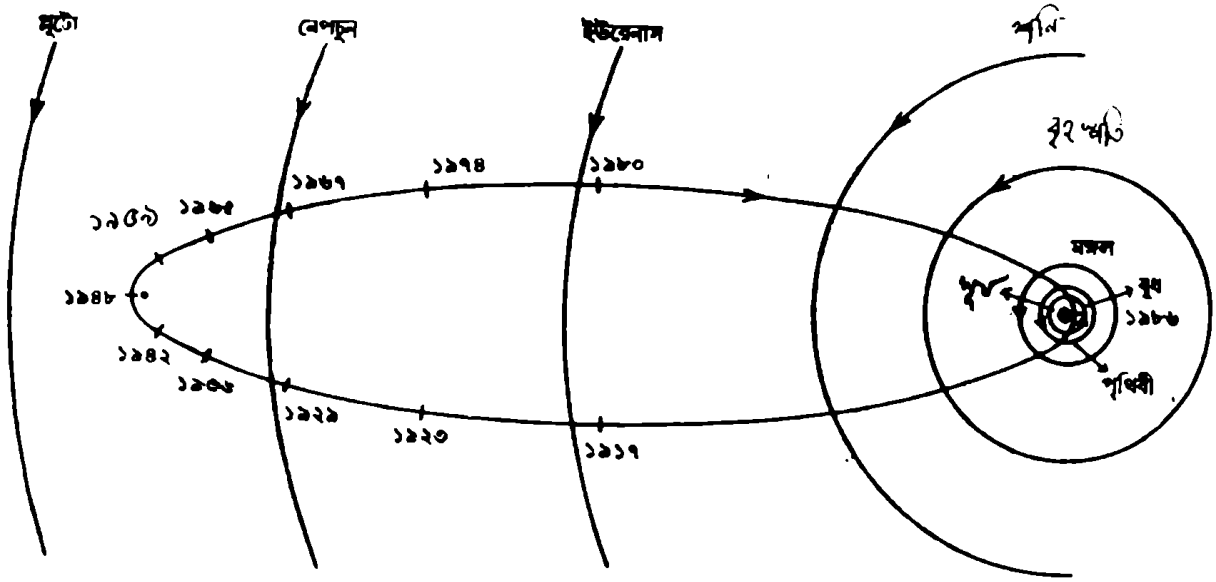

চিত্র ঃ ৪ – সূর্যের চারদিকে ধূমকেতুর পরিক্রমণ পথ।

হ্যালির ধূমকেতু আমরা সর্বশেষ পৃথিবীর আকাশে দেখেছি ১৯৮৬ সালে, তার আগে তাকে দেখা গিয়েছিল ১৯১০ সালে। কিন্তু ১৯৮৬ সালে হ্যালির পৃথিবীর আকাশে আবির্ভাব মোটেই নয়নাভিরাম হয়নি, খালিচোখে তাকে

অভিমুখে পাঠিয়ে, হ্যালির একেবারে কাছে গিয়ে ধূমকেতুর বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা। এদের মধ্যে ইউরোপিয়ান স্পেস এজেন্সির মহাকাশযান জিয়োটো (Giotto) হ্যালির ধূমকেতুর সবচেয়ে নিকটে দাঁড়িয়ে বৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষণ

করতে সমর্থ হয়েছিল। মহাকাশযান পাঠিয়ে ধূমকেতুর বৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষণ, জ্যোতির্বিজ্ঞানের ইতিহাসে এই ছিল প্রথম। ১৯৮৬ সালে বিজ্ঞানীদের এইটাই ছিল এক বড় রকমের কৃতিত্ব।

এবারে পৃথিবীর আকাশে ধূমকেতুর আবির্ভাবের সংগে কুসংস্কার কেমনভাবে জড়িয়ে আছে, সেই প্রসঙ্গে তোমাদের কিছু বলব। বহু প্রাচীনকাল থেকে, পৃথিবীর আকাশে ধূমকেতুর আবির্ভাবকে, পৃথিবীর সব দেশের মানুষ, একটা অমঙ্গল ও দুর্ঘটনার অগ্রদূত বলে মনে করে এসেছেন। এর নজির আমরা খুঁজে পাই পৃথিবীর সর্ব দেশের প্রাচীন সাহিত্য বা ইতিহাসের পাতায়। প্রথমেই উল্লেখ করি ভারতের সবচেয়ে প্রাচীন মহাকাব্য মহাভারত সম্পর্কে। মহাভারতের ভীষ্মপর্বে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের সময়ে একটি দীর্ঘ লেজ-বিশিষ্ট ভয়ঙ্কর ধূমকেতুর উদয়ের কথা বর্ণিত আছে — এখানে বলা আছে, ধূমকেতুটি পুষ্যা নক্ষত্রে অবস্থান করছে এবং উভয় পক্ষের সৈন্যদের অনিষ্ট সাধন করবে এবং পরিশেষে কুরুকুল ক্ষয় হবে। পাশ্চাত্য দেশের সাহিত্যেও এমন নজির যথেষ্ট আছে। খৃষ্টপূর্ব ৮৬ সালে জুলিয়াস সীজারের হত্যাকাণ্ডের সময় একটি ধূমকেতুর আবির্ভাব হয়েছিল। শেক্সপীয়ার তাঁর "জুলিয়াস সীজার" নাটকে ঘটনা দুটিকে কার্যকারণ কল্পনা করে সীজারপত্নী ক্যালফুর্ণিয়ার মুখ দিয়ে বলিয়েছিলেন "যখন ভিখারীরা মরে, আকাশে কোনও ধূমকেতু দেখা যায় না, কিন্তু রাজপুরুষের মৃত্যুতে স্বর্গ থেকে আলোর জোয়ার আসে।" ১০৬৬ সালে ইউরোপের আকাশে একটি অতি উজ্জ্বল ধূমকেতু আকাশে দেখা গিয়েছিল, সেই বছরেই হেস্টিংসের যুদ্ধক্ষেত্রে ইংলণ্ডের রাজা হ্যারল্ডের মৃত্যু হয়। এই ধূমকেতু ছিল হ্যালির ধূমকেতুর একটি পূর্বতন আবির্ভাব। এই ধূমকেতুর আবির্ভাবের দরুণই হ্যারল্ডকে শেষ পর্যন্ত মৃত্যুবরণ করতে হল, এরকম একটি ধারণা সারা ইংলণ্ডের মানুষের মনে গেঁথে গিয়েছিল। ১৮১১ সালে সারা ইউরোপের আকাশে একটি অসাধারণ উজ্জ্বল ধূমকেতুর আবির্ভাব হয়, সেই বছর নেপোলিয়ন রাশিয়া জয় করতে গিয়ে অসাধারণ বরফ পড়ার ফলে বিফলমনোরথ হয়ে ফিরে আসতে বাধ্য হলেন। সমগ্র ফ্রান্সের জনসাধারণ নেপোলিয়নের এই পরাজয়কে, ঐ ধূমকেতুর আবির্ভাবের সঙ্গে জড়িয়েছিলেন। ২১৮ খৃস্টাব্দের ৬ এপ্রিল হ্যালির ধূমকেতুর, চীন দেশ ও রোম নগর থেকে, পর্যবেক্ষণের বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে — ঐ ধূমকেতুকে ভয়ঙ্কর একটা জ্বলন্ত নক্ষত্র বলে বর্ণনা করা হয়েছে। আর ঠিক ঐ সময়টিতেই রোম সম্রাট সেক্রাইনাস পরলোকগমন করেন। এই মৃত্যুর জন্যেও রোমের মানুষেরা দায়ী করেন এই ধূমকেতুর আবির্ভাবকে।

বহু প্রাচীনকাল থেকে দেখা যাচ্ছে পৃথিবীর নানান্ দেশে, ধূমকেতুর আবির্ভাবকে জড়িয়ে নানান্ অমঙ্গলের কাহিনী প্রচলিত। এর ভেতরের গূঢ় অর্থটিকে ভাল করে বুঝতে হবে। সূর্য অস্ত গেলে নিয়মিতভাবে রাতের আকাশে যাদের আমরা দেখি, তারা হল অগনিত তারা, উজ্জ্বল চাঁদ ও কয়েকটি উজ্জ্বল গ্রহ। যদি কখনো এর হেরফের হয়, তাহলেই মুস্কিল। রাতের আকাশে ঝাঁটার মতো লেজ নিয়ে কোনো ধূমকেতুকে দেখা গেল, অমনি মানুষের মনে এসে গেল — নিশ্চয়ই ভয়ঙ্কর একটা কিছু ঘটতে চলেছে। এর মানেই হল, পৃথিবীর সব অঘটনের দায়-দায়িত্ব যদি আকাশের কোন ক্ষণজীবী জ্যোতিষ্কের ঘাড়ে চাপান যায়, তাহলে মন্দ কী? কারুর তো কোনো ক্ষতি হবে না তাতে ! এইরকম একটা ধারণার বশবর্তী হয়েই মানুষ একেবারে প্রাচীন কাল থেকে এরকম একটা দোষারোপ ধূমকেতুকে করে আসছেন। ধূমকেতুরা কিন্তু প্রকৃতির নিয়ম মেনে যেমন আসার তেমন বরাবর পৃথিবীর কাছে আসছে, আবার কিছুদিন পর চলে যাচ্ছে। ধূমকেতুর আবির্ভাবের সঙ্গে কোনরকম অমঙ্গল, মহামারী, ভূমিকম্প, বা জলোচ্ছাসের যে বিন্দুমাত্র সংযোগ নেই, এটা যুক্তি দিয়ে মানুষকে বুঝতে হবে। জ্যোতির্বিজ্ঞানের খুঁটিনাটি প্রাথমিকভাবে জানলেও মানুষের এমন ধারণা আর আসতে পারার কথা নয়।

এই কুসংস্কারের পাদমূলে সর্বপ্রথম যিনি কুঠারাঘাত হানলেন, তিনি হলেন ইতালির প্রতিভাবান শিল্পী জিয়োটো ডি বনডোন। ১৩০১ সালে হ্যালির ধূমকেতুর এক পূর্বগ আবির্ভাব ঘটেছিল, তখন জিয়োটো মুগ্ধনয়নে দেখেছিলেন পৃথিবীর আকাশে এই ধূমকেতুকে। প্রতিভাবান শিল্পী পৃথিবীর সমস্ত দেশে ধূমকেতুর আবির্ভাবকে কেন্দ্র করে যে কুসংস্কার যুগ যুগ ধরে প্রচলিত, তার একেবারে পাদমূলে কুঠারাঘাত হানলেন, তিনি বলে উঠলেন "প্রকৃতির নিয়মে ধূমকেতু পৃথিবীর আকাশে আসে, আবার প্রকৃতির নিয়মে সে চলেও যায়। যে কদিন তাকে দেখা যায় রাতের আকাশে,

আমরা সেই অপরূপ দৃশ্য উপভোগ করি, একে কেন্দ্র করে যেসব কুসংস্কার জড়িয়ে আছে, সেগুলো সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন, মানুষের নিছক অমূলক কল্পনা।" শুধু তাই নয়, কয়েক বছর পরে, জিয়োটোর আমন্ত্রণ এলো, ইতালির পাদুয়া শহরের বিখ্যাত এক গির্জার দেওয়ালে একটি ছবি আঁকার জন্যে, এই ছবির নাম হল "দ্যা অ্যাডোরেশন অফ দ্যা ম্যাগি" (The Adoration of the Magi)। এই ছবির বিষয়বস্তু ছিল এমন ঃ দাঁড়িয়ে মেরী মা, তাঁর কোলে নবজাত শিশু যীশু, আর দূর দূরান্ত থেকে যীশুর জন্ম সংবাদ জানতে পেরে মানুষেরা যীশুর পায়ে প্রণাম জানাতে এসেছেন। কিংবদন্তী ছিল, যীশুর জন্মসময়ে বেথেলহেমের আকাশে অপরূপ উজ্জ্বল এক তারা দেখা গিয়েছিল, এই চিত্রের একেবারে ওপরে জিয়োটো বেথেলহেমের তারার পরিবর্তে তাঁর নিজের দেখা উজ্জ্বল ধূমকেতুটির এক অপরূপ চিত্র এঁকে রেখে দিলেন। এই প্রসিদ্ধ চিত্রখানিতে ধূমকেতুর যে রূপ ফুটিয়ে তোলা হয়েছে, বিজ্ঞানীরা নিঃসন্দেহ যে এর আগে আর কোনো চিত্রে ধূমকেতুর এমন বিজ্ঞানসম্মত রূপ ফুটে ওঠেনি। এই ধূমকেতু এঁকে রাখার উদ্দেশ্য কী ছিল জিয়োটোর? ধূমকেতুকে সেই সময়ে ইউরোপের সব দেশের সাধারণ মানুষই ভয়ঙ্কর একাট অশুভ কিছুর প্রতীক হিসেবে গণ্য করতেন, কিন্তু শিল্পী জিয়োটো চেয়েছিলেন সাধারণ মানুষের মন থেকে এই কুসংস্কার যাতে দূরীভূত হয়, তাই এই ধূমকেতু এঁকে রেখে তিনি মনে মনে চেয়েছিলেন, পাদুয়ার এই বিখ্যাত গির্জায় যে সব মানুষ আসবেন যীশুর প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে, তাঁদের এই চিত্রটি দেখে মন থেকে ধূমকেতুর কুসংস্কার একেবারে চলে যাবে। এত বড় একটা উদ্দেশ্য নিয়ে তিনি এই চিত্রের ওপরে ধূমকেতু এঁকে গিয়েছিলেন। শুধু মাত্র এই কারণেই জিয়োটো স্মরণীয় হয়ে থাকবেন। এই শিল্পীর স্মৃতির সম্মানার্থে, ইউরোপিয়ান স্পেস এজেন্সি ১৯৮৬ সালে, হ্যালির ধূমকেতুকে খুব নিকট থেকে বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্যে যে মহাকাশযান পাঠিয়েছিলেন, তার নাম দিয়েছিলেন "জিয়োটো"।

এখন ধূমকেতু হেইল্-বপ-কে কখন এবং আকাশের কোন্ অঞ্চলে আমরা দেখতে পাব, সেই প্রসঙ্গে আসা যাক। ১৯৯৬ সালের অক্টোবর মাস থেকে ১৯৯৭ সালের এপ্রিল মাস পর্যন্ত, ভারতের সব স্থান থেকে সাত মাস ধরে ধূমকেতু হেইল্-বপকে রাতের আকাশে দেখার সুযোগ মিলবে, আর সে সুযোগ মিলবে শুধুমাত্র খালিচোখে। ধূমকেতুটির ঔজ্জ্বল্য ও আকাশের কোথায় তাকে দেখা যাবে, এসব বিচার করলে, এই সাতমাস সময়কে চারটি বিভাগে ভাগ করা যেতে পারে — (১) অক্টোবর-নভেম্বর, ১৯৯৬, (২) ডিসেম্বর ১৯৯৬— জানুয়ারি ১৯৯৭, (৩) ফেব্রুয়ারী — ১৫ মার্চ, ১৯৯৭, (৪) ১৬ মার্চ — ১৬ এপ্রিল, ১৯৯৭।

অক্টোবর-নভেম্বর, ১৯৯৬ ঃ অক্টোবর ও নভেম্বর মাসে হেইল্-বপ সন্ধ্যার আকাশের জ্যোতিষ্ক। এই দুমাসেই একে দেখা যাবে, একেবারে সূর্য অস্ত যাওয়ার অব্যবহিত পর থেকে অর্থাৎ গোধূলি বেলায় পশ্চিম আকাশে। এই দুমাসেই এর অবস্থান হবে অফিয়াকাস (Ophiuchus) তারামণ্ডলে। আর সন্ধ্যার অন্ধকার ঘন হওয়ার কিছুক্ষণ আগেই হেইল্-বপ পশ্চিম আকাশে অস্তমিত হয়ে যাবে, তাই এই দুমাসে একে দেখা যাবে বড্ড অল্প সময়ের জন্যে। নভেম্বর শেষে এর ঔজ্জ্বল্য বেশ বেড়ে উঠবে, কিন্তু নভেম্বরে একে সন্ধ্যার আকাশে দেখা সম্ভবপর হবে খুবই অল্প সময়ের জন্যে।

ডিসেম্বর ১৯৯৬ – জানুয়ারি ১৯৯৭ ঃ এই সময়ে হেইল্-বপ এবং সূর্য আকাশে খুব কাছাকাছি চলে আসবে, আর তার ফলে সূর্যের অত্যন্ত চোখ ধাঁধানো আলোর জন্যে, ধূমকেতুটিকে আকাশে দেখা আর সম্ভবপর হবে না।

ফেব্রুয়ারি – ১৫ মার্চ, ১৯৯৭ ঃ ফেব্রুয়ারি মাসে হেইল্-বপ কে দেখা যাবে ভোরবেলায় পূব আকাশে, সূর্যোদয়ের আগে। ফেব্রুয়ারি মাসের প্রথম দিকে, একে দেখা যাবে ঠিক পূবদিকের আকাশে একিলা (Aquilla) তারামণ্ডলে, এর ভারতীয় নাম ঈগল মণ্ডল। ১৫ ফেব্রুয়ারি তারিখ থেকে এর অবস্থান হবে আকাশের আরও একটু উত্তর-পূব দিক ঘেঁষে ভালপেকুলা (Vulpecula) তারামণ্ডলে, এর ভারতীয় নাম হল শৃগাল মণ্ডল। আর মার্চ মাসের প্রথমের দিকে একে দেখা যাবে আরও একটু উত্তর-পূব দিকে সিগনাস (Cygnus) তারা মণ্ডলে, এর ভারতীয় নাম বকমণ্ডল। এই সময়ে হেইল্-বপের ঔজ্জ্বল্য দারুণ বৃদ্ধি পাবে।

১৬ মার্চ – ১৪ এপ্রিল, ১৯৯৭ ঃ এই সময়ে হেইল্-বপ চলে আসবে সন্ধ্যাবেলার আকাশে। জুন মাসেই হেইল্-বপ আবার সূর্যের খুব নিকটে চলে আসার দরুণ,

তাকে আকাশে আর দেখা সম্ভবপর হবে না, আর তার আগে পর্যন্ত ১৬ মার্চ থেকে, একে সবসময় সন্ধ্যার আকাশেই দেখা যাবে, আর সম্পূর্ণ খালিচোখে। সূর্য অস্ত গেলেই ১৬ মার্চ থেকে হেইল্-বপকে সন্ধ্যার আকাশের উত্তর-পশ্চিম দিকে দেখা যাবে, তখন এর অবস্থান হবে অ্যানড্রোমিডা (Andromeda) মণ্ডলে। সূর্যের সবচেয়ে নিকটে, অনুসূর অবস্থানে আসার তারিখ হল এর পয়লা এপ্রিল, আর হেইল্-বপের পৃথিবীর সবচেয়ে নিকটে আসার তারিখ হল ২৩ মার্চ, ১৯৯৭। মার্চ মাসের শেষের দিকে আমরা এর সবচেয়ে উজ্জ্বল রূপটি আকাশে দেখতে সমর্থ হব। এই সময়ে তোমরা সন্ধ্যার আকাশে উত্তর-পশ্চিম দিগন্তের ১৫ থেকে ২১ ডিগ্রি ওপরে তাকালেই হেইল্-বপকে খুব সুন্দর দেখতে পাবে। এই সময়ে হেইল্-বপের লেজ সুস্পষ্ট হয়ে ওঠার আশা করছেন বিজ্ঞানীরা। ১৪ এপ্রিলের পর থেকেই হেইল্-বপ আস্তে আস্তে অ্যানড্রোমিডা মণ্ডল থেকে সরে চলে যাবে পারসিয়াস (Perseus) মণ্ডলে, অর্থাৎ আকাশের উত্তর-উত্তর-পশ্চিম দিকে। এপ্রিল মাসের শেষের দিকেই আকাশে একে চিহ্নিত করা বেশ কঠিন হয়ে উঠবে।

একটা কথা এখানে খুব স্পষ্টভাবে তোমাদের জেনে রাখা দরকার — এতক্ষণ পর্যন্ত হেইল্-বপ সম্পর্কে যা যা বলা হল, তা সবই বিজ্ঞানীদের ভবিষ্যদ্বাণী। সূর্যের নিকটে এসে, ধূমকেতুর কোমার সম্প্রসারণ ও তার অবয়ব ঠিক কী ধরনের হয়ে উঠবে, এর পূর্বাভাষ দেওয়া বিজ্ঞানীদের পক্ষে খুবই কঠিন, কারণ প্রতিটি ধূমকেতুর সূর্যের কাছে আসার পরে তার সম্প্রসারণ ও আচরণ ভিন্ন ভিন্ন রকমের। আর তাই সর্বক্ষেত্রে বিজ্ঞানীরা পৃথিবীর আকাশে ধূমকেতুর ঔজ্জ্বল্যের যে পূর্বাভাষ দেন, তা সঠিক হয়ে ওঠে না।

এটা তোমাদের আর একবার মনে করিয়ে দিতে চাই, আমরা সর্বশেষ যে ধূমকেতুকে বেশ কিছুদিন ধরে খালিচোখে রাতের আকাশে দেখেছি, তা হল ধূমকেতু ওয়েস্ট (Comet West), সেটা ছিল ১৯৭৬ সালে। তারপর ১৯৮৬ সালে পৃথিবী, সূর্য ও হ্যালির দুর্ভাগ্যজনক অবস্থানের জন্যে, খালিচোখে হ্যালির ধূমকেতুর সুন্দর রূপটি দেখা সম্ভবপর হয়ে ওঠেনি। তারপর এই বছর অর্থাৎ ১৯৯৬ সালের মার্চ মাসের একেবারে শেষের দিকে মাত্র দিন তিন চারেকের জন্যে খালি চোখে ধূমকেতু হাইয়্যাকুতাকে দেখা সম্ভবপর হয়েছিল। তাই কুড়ি বছর পরে আমরা আবার সুযোগ পাওয়ার আশা করছি, আমাদের আকাশে আগামী ১৯৯৬ সালের প্রথম দিকে বেশ কিছুদিন ধরে, কখনো ভোরবেলার আকাশে, আবার কখনো সন্ধ্যার আকাশে, একটি উজ্জ্বল ধূমকেতু খালিচোখে দেখার। জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের পূর্বাভাষ খানিকটা সঠিক হলে, সাধারণ মানুষের কাছে হেইল্-বপ হয়ে উঠবে এক আকর্ষণীয় জ্যোতিষ্ক।

শুভেচ্ছা সহ

গোপাল চন্দ্র ঘোষ

❀ ❀

গ্রাম + পোঃ — কানানদী

জেলা — হুগলী

গ্যাস্‌প্রা

অলকমোহন চট্টোপাধ্যায়

তোমাদের ভূগোল বইতে নিশ্চয়ই তোমরা পড়েছ যে সূর্যের চারপাশে নটা গ্রহ আছে। এদের নাম বুধ, শুক্র, পৃথিবী, মঙ্গল, বৃহস্পতি, শনি, ইউরেনাস, নেপচুন আর প্লুটো। মঙ্গল আর বৃহস্পতির মাঝখানে অসংখ্য পাথুরে জিনিস ঘুরে বেড়ায়। কোনটা কয়েক মিটার ব্যাসের, কোনটা ১০০০ কিমি ব্যাসের। এগুলোকে গ্রহাণু বলে।

সন্ধ্যের পর আমরা আকাশের দিকে খালি চোখে তাকালে অনেক তারা দেখি আর কিছু গ্রহকে বিভিন্ন সময় দেখা যায়। যে গ্রহগুলোকে খালি চোখে দেখা যায় তারা হল বুধ, শুক্র, মঙ্গল, বৃহস্পতি আর শনি। গ্রহাণুকে খালি চোখে দেখা যায় না। কারণ একে ত গ্রহাণুরা কত কোটি কিমি দূরে, তায় এগুলো আকারে খুব ছোট।

তবে কিছু গ্রহাণু দূরবীণ যন্ত্রে দেখা যায়। অত দূর থেকে দূরবীণ দিয়ে দেখে বিজ্ঞানীরা আন্দাজে কিছু লেখেন বটে। কিন্তু সে নেহাতই মামুলী কথা। বিজ্ঞানীরা কাছ থেকে কিছু না দেখা পর্যন্ত শান্তি পান না। মহাকাশযান পাঠিয়ে তাঁরা বুধ, শুক্র, মঙ্গল, বৃহস্পতি সব গ্রহ সম্বন্ধেই অনেক কিছু জেনেছেন। কিন্তু গ্রহাণুর সম্বন্ধে কোন প্রত্যক্ষ জ্ঞান কিছুদিন আগেও ছিল না।

১৯৮৯ সালে আমেরিকা বৃহস্পতির দিকে যে মহাকাশযান গ্যালিলিও পাঠায়, সেটা বৃহস্পতির দিকে যেতে যেতে গ্রহাণুপুঞ্জের মধ্যে দিয়ে যায়। (১৮ অক্টোবর, ১৯৯১) এ গ্যাস্‌প্রা (Gaspra) নামে একটা গ্রহাণুর ছবি তোলে। এটাই হল গ্রহাণুপুঞ্জের প্রথম প্রত্যক্ষ ছবি। এর পরেও এটা ইডা (Ida) নামে আর একটা গ্রহাণুর ছবি তোলে। গ্রাস্‌প্রা প্রথম, সেইজন্যে এর কথা বলব।

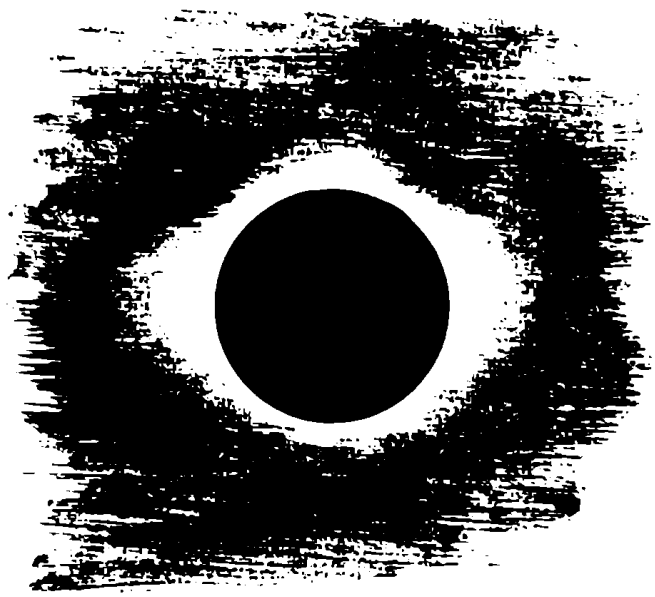

জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা যে সব জায়গা থেকে আকাশ দেখেন। সে জায়গাটা একটু নিরিবিলি আর গ্রাম্য পরিবেশের হয়, তার ফলে আকাশ দেখতে সুবিধে হয়। ১৯১৬ সালে রাশিয়াতে অবস্থিত ক্রিমিয়া পর্যবেক্ষণকেন্দ্র (যেটা ক্রিমিয়াতে অবস্থিত) আকাশ দেখতে দেখতে এটা আবিষ্কার করেন। ১৮০১ সাল থেকে এত বেশি গ্রহাণু আবিষ্কার হয় যে তাদের নাম দেওয়া বেশ কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। পাশ্চাত্যে জ্যোতিষ্কগুলোর নাম রোমান বা গ্রীক দেবদেবীর নামে হয়। কিন্তু বিজ্ঞানীরা যখন খেটেখুটে অনেক আবিষ্কার করে বসলেন, তখন দেখা গেল গ্রীক ও রোমান পুরাণ প্রায় ফিনিশ। রাশিয়ার লেখক টলস্টয়ের নাম তোমরা নিশ্চয় শুনেছ। টলস্টয় জীবনের একটা বড় অংশ গ্যাস্‌প্রা (Gaspra) নামে জায়গাটায় কাটিয়েছিলেন। বিজ্ঞানীরা শেষমেশ গ্যাস্‌প্রা নামটাই রাখলেন।

তবে আগেই বলছি গ্যাস্‌প্রা অন্যতম গ্রহাণু মাত্র। ১৮০১ সালে ইটালীর বিজ্ঞানী পিয়াস্‌জী (Piazzi) প্রথম গ্রহাণু আবিষ্কার করেন। সেটার নাম দেওয়া হয় সিরেস (Ceres)। সিসিল শহরের অধিষ্ঠাত্রী দেবীর নামে এই নাম দেওয়া হয়। এরপর প্যাল্‌লাস (Pallas), ভেষ্টা (Vesta), জুনো (Juno) এসব গ্রহাণু আবিষ্কার হয়। এই সময়ে বিজ্ঞানী উইলিয়াম হার্সেল (William Herschel) বুঝলেন, এরকম অনেক নতুন নতুন জিনিস বেরোতে পারে। তিনি এদের সাধারণ নাম দিলেন Asteroid মানে তারার মত। বাংলা ভাষায় আবশ্য এদের আমরা সেভাবে ডাকিনা। গ্রহাণু বলি। আজকে আমরা হাজার হাজার গ্রহাণুর অস্তিত্বের কথা জানি। এরা সূর্যের ধারে বিচিত্র রাস্তায় ঘোরে। অনেকগুলো গ্রহদের মত উপবৃত্তাকার রাস্তায় ঘোরে। কিছু আবার পৃথিবীর কাছ ঘেঁষে ঘোরে। পৃথিবীর খুব কাছে চলে আসে সাময়িক ভাবে। এদের Earth Crossing asteroid বলে। যদি পৃথিবীর টানে পৃথিবীর ওপর পড়ে তাহলে সাংঘাতিক কথা। এই ত মাত্র ৬$\frac{১}{২}$ কোটি বছর আগে ডায়নোসর ধ্বংসের কথা নিশ্চয় তোমাদের মনে আছে ? সব ভেবে বিজ্ঞানীরা গ্রহাণু সম্বন্ধে বিশদ গবেষণা করছেন। গ্রহাণু সম্বন্ধে ভালোমত না জানলে, কবে গ্রহাণু ঘাড়ে পড়বে জানা যাবে না। গ্রহাণু সম্বন্ধে ভালোমত জেনে এ ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন করা যেতে পারে।

সেইজন্যে গ্যালিলিও মহাকাশযান যখন গ্যাস্‌প্রার ছবিখানা বিজ্ঞানীদের হাতে এনে দিল, বিজ্ঞানীরা খুব খুশি হলেন। গ্যাস্‌প্রা সম্বন্ধে যা যা জানা যাচ্ছে, সব তাঁরা নথিবদ্ধ করলেন।

গ্যাস্‌প্রার পাশ দিয়ে যখন গ্যালিলিও মহাকাশযান যাচ্ছিল, তখন এর গতিবেগ সেকেন্ডে ৮ কিমি। তার মানে ঘণ্টায় ২৮,৮০০ কিমি। গ্যাস্‌প্রার ছবি বিশ্লেষণ করে বোঝা যাচ্ছে এটা একটা মস্ত বড় আলুর মত। কোথাও ব্যাস ১১ কিমি, কোথাও ১২, কোথাও ১৯। অন্য গ্রহাণুর খণ্ড এর ওপরে পড়ার জন্যে এর গায়ে অনেক খাঁজ। এটাও অনুমান করা হচ্ছে ২০ কোটি বছর আগে একটা বড় গ্রহাণু ভেঙে গ্যাস্‌প্রা হয়েছে। এবারে বিজ্ঞানীরা বিশদভাবে জানছেন ঃ—

(১) গ্যাস্‌প্রার রাসায়নিক গঠন কি ?

(২) গ্যাস্‌প্রা পদার্থবিদ্যার কোন নিয়মে চলে ? মানে এর মাটি শক্ত, নরম না ভঙ্গুর। হালকা না ভারি ?

(৩) সূর্যের চারধারে এর ঘোরার রাস্তা কি ?

এরপর গ্যালিলিও ইডা (Ida) নামে গ্রহাণুর পাশ দিয়ে যায়। সেটার ছবি তুলে পৃথিবীর বুকে পাঠায়। এসবের থেকেও বিজ্ঞানীরা গ্রহাণু সম্বন্ধে অনেক তথ্য আহরণ করেন।

বিজ্ঞানীরা শুধু যে গ্রহাণু ঘাড়ে পড়ার হাত থেকে বাঁচার জন্যে গ্রহাণু সম্বন্ধে জানছেন তা নয়। সূর্য থেকে গ্রহগুলো ঠিক কিভাবে সৃষ্টি হয়েছিল, এ নিয়ে বিজ্ঞানীরা কিছু গবেষণা করেছেন। কিছু ধারণা করেছেন। তাঁরা মনে করছেন গ্রহাণু সম্বন্ধে ভাল মত জানলে সৌরজগৎ গোড়াতে কি অবস্থায় ছিল গ্রহগুলোই বা গোড়াতে কি অবস্থায় ছিল এ সম্বন্ধে মূল্যবান তথ্য পাওয়া যাবে। মনে হতে পারে বিজ্ঞানীরা ত অনেক মহাকাশযান পাঠিয়েছেন। গ্রহ সম্বন্ধে অনেক কিছু জেনে ফেলেছেন। সঠিক ব্যাপারটা তা নয়। গ্রহ বিজ্ঞান এখন শৈশবে আছে বলা চলে। বিজ্ঞানীরা এই শিশুকে লালন-পালন করে বড় করে তুলছেন।

তোমরা হয়ত ভাবছ গ্রহ-গ্রহাণু সম্বন্ধে এই জ্ঞান মানুষের প্র্যাক্‌টিকাল কাজে লাগবে কিনা। চুপি চুপি বলে রাখি গ্রহাণুতে অঢেল খনিজ পদার্থ। পৃথিবীর খনিজ পদার্থে ঘাটতি পড়েছে। তাই অদূর ভবিষ্যতে হয়ত চাঁদ, মঙ্গল, গ্রহাণু এসব থেকে খনিজ পদার্থ সংগ্রহ করতে হবে।

মানুষের জীবন ধারণের জন্যে তিনটে জিনিস দরকারী। (১) থাকবার জায়গা, (২) খনিজ পদার্থ বা কাঁচামাল, (৩) শক্তি।

গ্রহান্তরে আছে অফুরন্ত জায়গা, অফুরন্ত কাঁচামাল, অফুরন্ত শক্তি। ভবিষ্যতে এটা আমাদের কাজে লাগবে।

তাই গ্যাস্‌প্রা সম্বন্ধে জানা আমাদের সামনে একটা নতুন সম্ভবনা খুলে দিল। মানুষ চিরকাল প্রকৃতিকে জেনে এসেছে। গ্যাস্‌প্রা তার নতুন নিদর্শন।

গণিত শিক্ষা

র ত ন মো হ ন খাঁ

গণিত নিয়ে পড়েছি, গণিতের শিক্ষক হিসাবেই কর্মজীবনের শুরু ও শেষ। দু-দশক আগেও দেখেছি ছাত্র-ছাত্রীদের ভিড়ে গণিতের ক্লাসগুলি বেশ জমজমাট, ছাত্র-ছাত্রীরা গণিতের অনেক খুঁটিনাটি বিষয় জানতে বেশ কৌতূহলী, বহু কৃতী ছাত্র-ছাত্রী গণিতের সম্মান বিভাগে ভর্তি হতে আগ্রহী। অধুনা চেহারাটি একেবারে পাল্টে গেছে। উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে অঙ্ককে প্রধান বিষয় করে যে সব ছাত্র-ছাত্রী পড়াশুনা করে তাদের শতকরা হিসাবটা খুবই উদ্বেগজনক। উচ্চমাধ্যমিকের পর অন্য কোন বিভাগে ভর্তির সুযোগ না পেয়ে অনিচ্ছা সহকারে গণিত নিয়ে পড়তে থাকে। স্নাতকের সাধারণ বিভাগে (সম্মান ছাড়া) যে সব ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি হয়, তারা কলেজে আসে সময় কাটাবার জন্য। ক্লাসে উপস্থিত থাকে শতকরা পনেরো থেকে কুড়িজন। শিক্ষকের উচ্চ রব দেওয়ালে প্রতিধ্বনিত হয় মাত্র। অনেকে বলতে পারেন — শিক্ষক অপারগ তাই এই অবস্থা। এ সিদ্ধান্তে আসতে হলে প্রায় সমস্ত কলেজ শিক্ষকই অপারগ। আমরা সবাই জানি সম্মান ছাড়া পড়াশুনা করে কোন লাভ নেই, অথচ ঐ পড়াশুনা চলেছে। বিচিত্র এ দেশ !

গত দু-তিন দশক ধরে সমাজ ব্যবস্থার দ্রুত পরিবর্তন ঘটে চলেছে। আগে শিক্ষা এবং জীবিকা একে অপরের পূরক হিসাবে চিন্তা করা হত না। অবশ্য 'লেখাপড়া করে যে গাড়ি-ঘোড়া চড়ে সে' এরকমটা না হলেও শিক্ষান্তে মোটামুটি জীবনে প্রতিষ্ঠিত হওয়া সহজ ছিল। বর্তমানে শিক্ষার যথেষ্ট প্রসার ঘটেছে এবং জ্ঞানের জন্য পড়াশুনা (art for arts' sake)— এ কথা আজ পাগলের প্রলাপমাত্র। যে শিক্ষা জীবিকার পথ সুগম করে, কর্মজীবনে অধিক অর্থ উপার্জন সহায়ক হয়, সেই শিক্ষাই আজকের সমাজে সবার আকাঙ্খিত ও ঈপ্সিত। এরূপ পটভূমিতে গণিত শিক্ষার সমস্যার কথা ভাবতে হবে।

আমাদের আলোচনা মোটামুটি পশ্চিমবঙ্গকে ঘিরে। একথা স্বীকার করতেই হবে – অধুনা গণিতে ছাত্র-ছাত্রীদের তেমন আকর্ষণ নেই। মাধ্যমিকের পর উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে পাঠরত ছাত্র-ছাত্রীদের বিষয় নির্বাচনের পরিসংখ্যানই এ সিদ্ধান্তের যথার্থতা প্রমাণ করে। গণিত ছাড়া কোন বিষয় পড়লে বা সামান্য গণিত নির্ভর কোন বিষয় পড়লে বৃত্তিতে সুবিধা হবে, অর্থাৎ চাকুরীর ক্ষেত্রে বেশি সুযোগ পাওয়া যাবে বা স্বনিযুক্তি প্রকল্পে স্বনির্ভর হওয়া যাবে সে সব দিকেই আমরা ছাত্র-ছাত্রীদের প্রলোভিত করি বা উৎসাহিত করি। একারণে গণিতের প্রতি আকর্ষণ বাড়াতে হলে গণিত শিক্ষার সঙ্গে জীবিকার সম্পর্ক স্থাপন করা বাঞ্ছনীয়। এ ছাড়া গণিত শিক্ষা এমনভাবে দেওয়া হয়, যাতে প্রাথমিক স্তরেই অধিকাংশ ছাত্র-ছাত্রীর গণিতের প্রতি বিতৃষ্ণা বা ভীতি জন্মে।

সমাজের যাঁরা রূপকার এবং শিক্ষার যাঁরা ধারক ও বাহক তাঁরা একথা ভালভাবেই জানেন – গণিত জীবনের সঙ্গে ওতঃপ্রোতভাবে জড়িত। হিসাব-নিকাশ-প্রোগ্রাম ছাড়া নিত্যকার জীবনও অচল হয়ে পড়ে। এজন্যই হয়ত প্রথম পাঠ অ-আ এর সঙ্গে মিশে আছে একে চন্দ্র, দুয়ে পক্ষ . . .। অথচ গণিতের প্রতি বিকর্ষণীয় মনোভাব কেন ? কারণগুলি জানতে হলে খোলা মন নিয়ে, বিশ্লেষণী মন নিয়ে সমস্যার গভীরে যাবার চেষ্টা করতে হবে। গণিত শিক্ষার সঙ্গে সরাসরি যুক্ত গণিত শিক্ষক, শিক্ষণ পদ্ধতি এবং পাঠক্রম। গণিত শিক্ষণ চলে পুরানো ধাঁচে। স্কুল থেকে কলেজ এই বিমূর্ত কৌশল বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করবেই,

যার ভয়ানক পরিণতি আজকের গণিতের সঙ্কটের অন্যতম কারণ। যোগ-বিয়োগ-গুণ-ভাগ শিক্ষক বর্ণিত নিয়মে সরলভাবে তুলে ধরার কোন চেষ্টা করা হয় না। সবই গতানুগতিকভাবে। গতানুগতিকতা ছেড়ে, অন্যসব দেশে, বিশেষ করে বিজ্ঞানে উন্নত দেশগুলিতে গণিতের শিক্ষণ কিভাবে শুরু হয়, পরের স্তরে গণিত শিক্ষা কিভাবে পরিচালিত হয়, সেখানে গণিত পাঠে ভাল ছাত্র-ছাত্রী এবং গণিতের উপর সফল গবেষক পাওয়া যায় কেন — এ সব আমাদের ভালভাবে অনুধাবন করা উচিত। তারপর দেশীয় পরিবেশ, সুযোগ সুবিধার উপর ভিত্তি করে গণিত শিক্ষায় পরিবর্তন আনতে হবে। গণিত শিক্ষার পরিকাঠামো তৈরি করতে হবে।

পরিবর্তন, পরিবর্ধন, পরিমার্জন প্রভৃতি ক্ষেত্রে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের ভূমিকাই মুখ্য। গণিত শিক্ষার আধুনিকীকরণে নব পদ্ধতি আয়ত্ত করে তার প্রয়োগে শিক্ষক-শিক্ষিকারা যদি জাতীয় দায়িত্ব পালনের মনোভাব নিয়ে এগিয়ে না আসেন তাহলে সব প্রচেষ্টাই হবে ব্যর্থ। পাঠক্রম সুচিন্তিতভাবে তৈরি করতে হবে। পাঠক্রম প্রায়ই পরিবর্তিত হয়। পরিবর্তন সাধারণত কিছু অধ্যায়ের সংযোজন ও বিয়োজনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে। গণিতের পাঠক্রম এমন হতে হবে যাতে শিক্ষা শেষে গণিতের ছাত্র-ছাত্রীরা কর্মজীবনে প্রবেশ করার অধিকতর সুযোগ পায়। গণিতের মূল বিষয়গুলি অবশ্যই পাঠক্রমে থাকবে, কিন্তু পাঠক্রম বিশুদ্ধ গণিতেই সীমাবদ্ধ রাখতে হবে — এ হেন গোঁড়ামি ত্যাগ করা একান্ত প্রয়োজন। শিক্ষা পরিপূর্ণ মানুষ গঠনের জন্য। পরিপূর্ণ মানুষ মানে কেবলমাত্র চরিত্রবাণ ও জ্ঞানবান নয়। যে কোন পরিস্থিতিতে আত্মপ্রত্যয়ের সঙ্গে জীবন সংগ্রামে যে জয়ী হতে পারে, অর্থাৎ নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে সেই হল পরিপূর্ণ মানুষ। পরিপূর্ণ মানুষ হবার মত গণিত শিক্ষার পরিকাঠামো হওয়া প্রয়োজন। শিক্ষান্তে যদি চলার পথ বাঁচার পথ, রুজি-রোজগারের পথ প্রায় রুদ্ধ হয়ে যায়, তবে সে শিক্ষা কি প্রকৃত শিক্ষা ? যে সব কাজের সমাজে চাহিদা আছে, যে সব কাজে কর্মসংস্থানের সুযোগ আছে, যে সব বিষয় জ্ঞানে স্বাবলম্বী হবার সম্ভাবনা আছে, সে সব দিকে পারদর্শিতা লাভের মত গণিত পাঠের পরিকাঠামো হওয়া প্রয়োজন। বিজ্ঞানের প্রতি শাখায় গণিতের প্রয়োগ বাড়ছে, গণিতের ক্ষেত্র প্রসারিত হচ্ছে অথচ গণিতজ্ঞের কদর নেই, চাহিদা নেই। গণিতের ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে স্কুল-কলেজ শিক্ষকতার কাজ ছাড়া সব দরজাই বন্ধ। এই বন্ধ্যাত্বই গণিতের প্রতি বিতৃষ্ণার প্রধান কারণ। গণিতের প্রায়োগিক দিক ও বিমূর্ত দিক কে সমভাবে লালন করতে হবে। গণিতের পাঠক্রমে গণিতের ব্যাকরণ মুখ্য হবে, কিন্তু ব্যাকরণ সব গ্রাস করবে না। গণিতের সম্মানের পাঠক্রমে কম্পিউটার বিজ্ঞান, অ্যাকাউন্ট্যান্সি, কস্টিং, বায়োমেট্রি প্রভৃতি আনলে দোষ কি ? প্রযুক্তি বিজ্ঞানে, বিজ্ঞানের যে কোন শাখায় গবেষণায় গণিতের সার্থক প্রয়োগে ও ব্যাখ্যায় এবং উন্নত পর্যায়ে আনতে গণিতের ব্যবহারে গণিতের পাঠক্রম এমন হতে হবে যাতে গণিতের ছাত্র অপরিহার্য হয়ে উঠে। উন্নত দেশগুলিতে গণিতে পারদর্শী লোক বহু ক্ষেত্রেই অপরিহার্য, অনুরূপ পরিবেশ আমাদের মাটিতেও গড়ে তুলতে পারলে গণিতে আকর্ষণ বাড়বে।

পরিশেষে বলতে হয় গণিত বিষয়ে অনীহা দূর করতে, গণিত পাঠে আকর্ষণ বাড়াতে করণীয় হল — (i) বিতৃষ্ণার কারণ সঠিকভাবে নির্ণয় করা, (ii) গণিত পাঠক্রমকে সর্বতোভাবে বাস্তবমুখী করা, (iii) প্রাথমিক স্তর থেকে উচ্চস্তর পর্যন্ত অনুসংযোগ রাখা, (iv) রক্ষণশীলতা ত্যাগ করা, (v) প্রাথমিক স্তরেই গণিত শিক্ষণে আমূল পরিবর্তন আনা, (vi) গণিত পাঠে শিশুমনে স্বতঃস্ফূর্ততা আনার মত পদ্ধতি প্রয়োগ করা, (vii) গণিত শিক্ষণে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের বিজ্ঞানসম্মত আধুনিক শিক্ষণ পদ্ধতিতে ওয়াকিবহাল করা, (viii) অপ্রয়োজনীয় বিষয় বর্জন করা, (ix) নানা বৃত্তির সঙ্গে গণিত পাঠের সংযোগ স্থাপন করা, (x) প্রচার মাধ্যমে গণিতে উচ্চ শিক্ষান্তে নানা সুযোগ লাভের সম্ভাবনা তুলে ধরা, (xi) নানা বিষয়ের বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে গণিত বিশেষজ্ঞদের পর্যায়ক্রমে আলোচনার মাধ্যমে আর্থ-সামাজিক কাঠামোর পরিবর্তন অনুযায়ী গণিতের পাঠক্রমে পরিবর্তন আনা।

বিভিন্ন স্তরের গণিত অনুরাগী ও সমাজ সংস্কারকদের শুভ প্রচেষ্টায় নির্ণীত চয়ণের কঠোর রূপায়ণে গণিতের সঙ্কট দূর হবে, বিজ্ঞান চর্চা অধিকতর সজীব ও ফলপ্রসূ হবে, এ আশা নিশ্চয়ই দুরাশা নয়।

ভেবু ও কেবুর অঙ্ক পাঠ

অরুণাভ মিশ্র

ঘুম ভেঙে মাঝ রাতে
উঠে দেখে ভ্যাবলা
কড়া নাড়ে দরজায়
ঘোষেদের ক্যাবলা

ভেবু বলে, কেবু তুই
মাঝ রাতে হ'ল কি !
কেবু বলে, চার গুণ
চারে হয় ষোল কি ?

লিনিয়ার প্রোগ্রামিং
ডিনামিক্স হাতড়ে
সাঁঝ থেকে মাঝ রাত
গেছি ভাই কাৎরে।

ঘেঁটে ঘুটে ম্যাট্রিক্স
পলিনমিয়ালটা
ক্যালকুলাসের ফাঁসে
জড়ে গেল জালটা।

কম্পিউটারে ফেলে
কষবার চেষ্টায়,
বেসিমেকর ভাষা দেখি
ফেঁসে গেল শেষটায় !

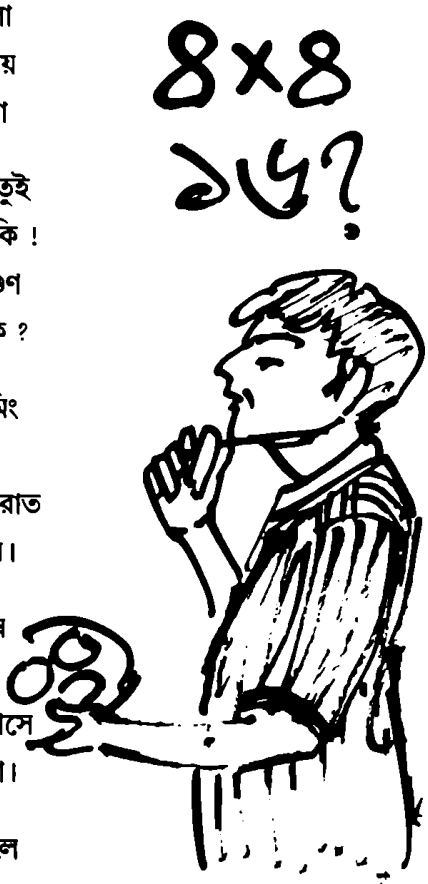

পাঁচখানা খাতা গেল
ডটপেন বত্রিশ,
না আঁচালে পাঁচুদার
দোকানেই খোঁজ নিস।

ভেবু বলে এ আবার
এমন কি চিন্তা
চারখানা প্যাঁড়া খাবি
জুড়ে চার দিন-তা।

টাকা টাকা প্যাঁড়া গুলো
খেতে নয় মন্দ
অঙ্কের ঝাঁঝ নেই
মিঠে মিঠে গন্ধ.

পঞ্চম দিনে যাবি
দাম দিতে দোকানে
আশা করি উত্তর
পেয়ে যাবি ওখানে।

With Best Compliments From :—

SPEER LABORATORIES PRIVATE LIMITED

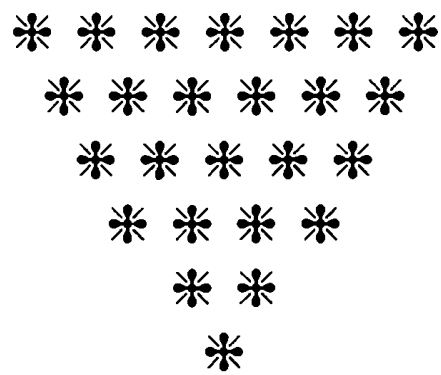

(Manufacturer of Laboratory Chemicals)

★ SOLVENTS
★ SALTS
★ ACIDS

13, BABURAM GHOSH ROAD
CALCUTTA-700 040.
PHONE : 471-7931

নোবেল পুরস্কার ও স্যার আলফ্রেড নোবেল

শ্রী রূপ গোপাল গোস্বামী

এমন কোন লেখাপড়া জানা মানুষ খুঁজে পাওয়া যাবে না যিনি নোবেল পুরস্কারের কথা জানেন না। বিশ্বে মানবজাতির কল্যাণে এই পুরস্কার দেওয়া হয়। এই পুরস্কারটির সঙ্গে যে ব্যক্তির নাম জড়িয়ে আছে তিনি হলেন স্যার আলফ্রেড বার্নাড নোবেল। তিনিই এই পুরস্কারটি চালু করেন। বিশ্বের বিজ্ঞানের ইতিহাসেও কিন্তু স্যার আলফ্রেড নোবেল চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন। বর্তমান বছরটি স্যার নোবেলের মৃত্যুশতবর্ষ হিসাবে পালিত হচ্ছে।

১৯৩৩ সালের ২১শে অক্টোবর সুইডেনের রাজধানী স্টকহলম শহরে আলফ্রেডের জন্ম। পিতা ইমানুয়েল ছিলেন প্রসিদ্ধ টর্পেডো ও মাইন নির্মাতা। চাকরি করতেন রাশিয়ার সেন্ট পিটার্সবুর্গে। সপরিবারেই থাকতেন সেখানে। তাঁর

স্যার আলফ্রেড নোবেল।

স্বপ্ন ছিল পুত্র আলফ্রেডও তাঁর মত কারিগরি বিদ্যায় দক্ষ হয়ে উঠবে। অতএব প্রয়োজন বিজ্ঞান শিক্ষার। তাই বিদ্যালয়ে না পাঠিয়ে উপযুক্ত গৃহশিক্ষকদের তত্ত্বাবধানে চলতে থাকল আলফ্রেডের পড়াশুনা। ছেলেবেলা থেকেই কিন্তু আলফ্রেড রসায়ন বিজ্ঞানের প্রতি প্রবল আকর্ষণ অনুভব করেন। গৃহশিক্ষকদের প্রচেষ্টায় ও পিতার প্রেরণায় অতি অল্প বয়েসেই এবিষয়ে অসাধারণ জ্ঞান লাভ করেন। আলফ্রেড কিন্তু কোনদিনই স্কুল-কলেজের দরজায় পা রাখেননি। অনেকটা রবীন্দ্রনাথের মত। একটু বয়স বাড়লে পিতা ইমানুয়েল পুত্র আলফ্রেডকে টর্পেডো ও মাইন নির্মাণের শিক্ষা দিতে শুরু করেন।

সেই সময়ে 'নাইট্রোগ্লিসারিন' (যার রাসায়নিক নাম গ্লিসারিল ট্রাইনাইট্রেট) নামক বিস্ফোরক পদার্থটি সবেমাত্র আবিষ্কৃত হয়েছে। এই বিস্ফোরক পদার্থটিকে কিভাবে নিরাপদে ব্যবহার করা যায় তাই নিয়েই সেই সময়ে বিজ্ঞানী মহলে দারুণ সাড়া পড়ে যায়। অধ্যাপক জিনিন-এর তত্ত্বাবধানে আলফ্রেড ঐ নাইট্রোগ্লিসারিনকে নিয়েই শুরু করলেন গবেষণা। ১৮৬২ সালে 'কাইজেলগার' নামক এক ধরণের মাটির দ্বারা নাইট্রোগ্লিসারিনকে শোষিত করিয়ে আবিষ্কার করলেন সুষ্ঠুভাবে ও নিরাপদে বিস্ফোরণ ঘটানোর কৌশল। পরে আরও বিস্তারিত গবেষণা করে ১৮৬৭ সালে আবিষ্কার করেন ডিনামাইট। যা অনেক নিরাপদ।

স্যার আলফ্রেড নোবেল সুদীর্ঘকাল ডিনামাইট নিয়ে গবেষণা করেছিলেন। আবিষ্কার করেছিলেন নানা ধরণের ডিনামাইট। ডিনামাইটকে কেন্দ্র করে গড়ে তুলেছিলেন

বিশাল শিল্প। এই শিল্প থেকে প্রচুর অর্থ উপার্জন করেছিলেন। শিল্পপতি হিসাবে যেমন খ্যাতি অর্জন করেছিলেন তেমনি বিশাল সম্পত্তিরও অধিকারী হয়েছিলেন। তাঁর উপার্জিত অর্থের একটা বড় অংশই তিনি দান করে গেছেন মানব জাতির কল্যাণে।

১৮৯৫ সালের ২৭শে নভেম্বর প্যারিস শহরে এই উদ্দেশ্যে একটি উইল রচনা করেন। সেই উইল অনুসারে প্রতি বছর পদার্থবিদ্যা, রসায়ন বিদ্যা, চিকিৎসা ও শারীর বিদ্যায় সর্বাপেক্ষা মূল্যবান আবিষ্কারের জন্য বিশ্বের সেরা সাহিত্য কর্মের জন্য এবং বিশ্ব শান্তি, এই পাঁচটির প্রত্যেকটির জন্য একটা মোটা অংকের অর্থ, পুরস্কার হিসাবে দেওয়া হয়। নোবেলের উইল অনুযায়ী ১৯০১ সাল থেকে এই পুরস্কার দেওয়া শুরু হয়। আগেই বলা হয়েছে পুরস্কার দাতার নামানুসারে পুরস্কারটির নাম হয়েছে 'নোবেল পুরস্কার'। পুরস্কারের সমস্ত অর্থ নোবেল গঠিত তহবিলের সুদ থেকেই পাওয়া যায়।

কেবলমাত্র একটি মাত্র সংস্থা থেকেই সবগুলি পুরস্কার দেওয়া হয় না। পদার্থবিদ্যা ও রসায়নের পুরস্কার দুটি দেয় সুইডিশ বিজ্ঞান একাডেমি, চিকিৎসা ও শারীরবিদ্যার পুরস্কার দেয় স্টকহলমের ক্যারোলিন মেডিক্যাল ইনস্টিটিউট, সাহিত্য পুরস্কার দেয় স্টকহলম সাহিত্য একাদেমি এবং বিশ্ব শান্তি পুরস্কারটি দেয় নরওয়েজিয়া স্টরটিং কর্তৃক নির্বাচিত কমিটির দ্বারা।

নোবেল পুরস্কারের ম'ত মোটা অঙ্কের পুরস্কার বোধহয় পৃথিবীতে আর দ্বিতীয় নেই। আলফ্রেড নোবেলের উইল অনুযায়ী পৃথিবীর যে কোন দেশের মানুষ এই পুরস্কার লাভ করতে পারে। ১৯০১ সাল থেকে এই পুরস্কার দেওয়া শুরু হয়। যদিও পুরস্কার প্রাপকদের নির্বাচিত করা হয়েছিল ১৯০০ সালে। যাঁরা প্রথম এই পুরস্কার লাভের গৌরব অর্জন করেছিলেন, তাঁরা হলেন — পদার্থবিদ্যায় জার্মানির উইল হেল্ম রন্টজেন, রসায়নে হল্যাণ্ডের ভাণ্ট হফ, চিকিৎসা ও শারীরবিদ্যায় জার্মানির ফন বেরিং, সাহিত্যে ফ্রান্সের সুলি প্রুধোম এবং শান্তির জন্য সুইজারল্যাণ্ডের ডুনাণ্ট এবং ফ্রান্সের পাসি। কোন বছর কোন বিষয়ে যোগ্য ব্যক্তি না পাওয়া গেলে সেই বছর সেই পুরস্কার দেওয়া হয় না। আবার এক বিষয়ের পুরস্কার একাধিক ব্যক্তিকে ভাগ করে দেওয়া হয়। অবশ্য এই সব ব্যাপারে নোবেলের উইলের কিছু কিছু পরিবর্তন করা হয়েছে পরবর্তীকালে। যেমন ১৯৭৪ সাল থেকে অর্থনীতিতেও নোবেল পুরস্কার দেওয়া হচ্ছে। গতবছর, অর্থাৎ ১৯৯৫ সালে যাঁরা নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন তাঁরা হলেন পদার্থবিদ্যায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মার্টিন এল পার্ল ও ফ্রেডরিক রেইন্স, রসায়নে নেদারল্যাণ্ডের পল ক্রুটজেন এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মারিও মলিনা ও এফ শেরউড রোল্যাণ্ড। চিকিৎসা ও শারীর বিদ্যায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এডোয়ার্ড লুইস, জার্মানির ক্রিসটেন নুসলেইন ভোলহার্ড ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এরিক উইয়েসস। অর্থনীতিতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রবার্ট ই লুকাস, জুনিয়র, শান্তির জন্য জোসেফ রটব্লাট, যিনি পারমাণবিক অস্ত্রশস্ত্র বিরোধী আন্দোলনের সংগঠক। সাহিত্যে আইরিশ কবি এবং প্রাবন্ধিক শেমস্ হেন।

আমাদের দেশেও নোবেল পুরস্কার এসেছে। সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও পদার্থবিদ্যায় স্যার চন্দ্রশেখর বেঙ্কটরমণ নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন। জন্ম ভারতে কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক হিসাবে নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন ডঃ হরগোবিন্দ খোরানা এবং সুব্রহ্মন্যম চন্দ্রশেখর। সুব্রহ্মন্যম চন্দ্রশেখর, যিনি ছিলেন স্যার চন্দ্রশেখর ভেঙ্কটরমেণের ভাইপো, কিছুদিন আগেই প্রয়াত হয়েছেন। আবার জন্ম ও কর্ম দুই-ই ভারতে অথচ ইংরাজ সন্তান স্যার রোনাল্ড রস নোবেল পুরস্কার পান। ১৯৭৯ সালে শান্তির জন্য নোবেল পুরস্কার পান মাদার টেরেসা।

১৮৯৬ সালের ২০শে ডিসেম্বর স্যার আলফ্রেড বার্নাড নোবেল প্রয়াত হ'ন। তিনি বেঁচে থাকতে অবশ্য এই নোবেল পুরস্কার কোন ব্যক্তিকে দেওয়া হয়নি। নিজের বিপুল সম্পত্তিকে মানবজাতির প্রতি উৎসর্গ করার নজির খুব কমই আছে। তাই শুধু বিজ্ঞানের রাজ্যেই নয় — সমস্ত ক্ষেত্রেই নোবেল তাঁর কর্মের জন্য চিরকাল অমর হয়ে থাকবেন।

প্রকৃতির পাঠশালা

চৈতালী ভদ্র নন্দী

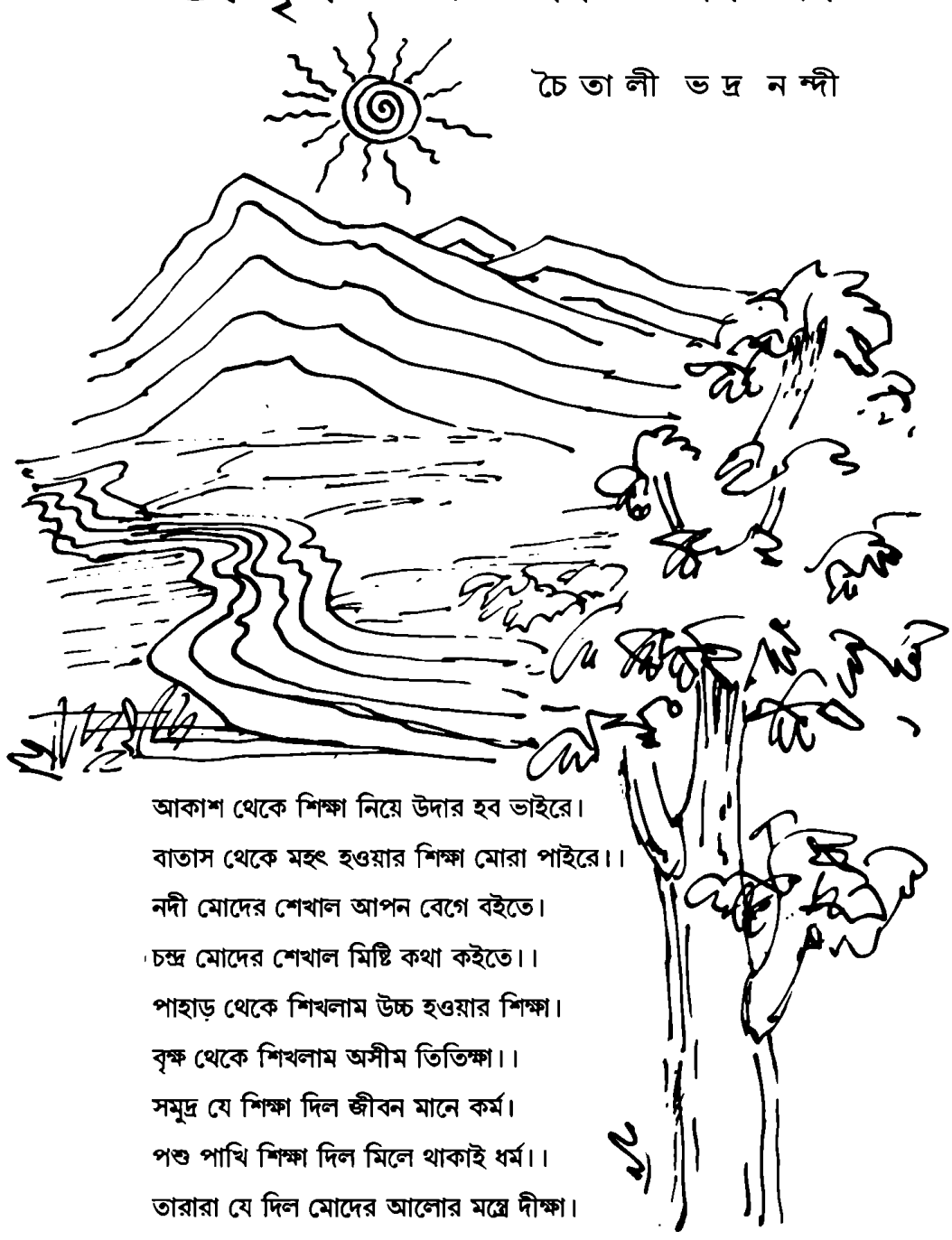

আকাশ থেকে শিক্ষা নিয়ে উদার হব ভাইরে।
বাতাস থেকে মহৎ হওয়ার শিক্ষা মোরা পাইরে।।
নদী মোদের শেখাল আপন বেগে বইতে।
চন্দ্র মোদের শেখাল মিষ্টি কথা কইতে।।
পাহাড় থেকে শিখলাম উচ্চ হওয়ার শিক্ষা।
বৃক্ষ থেকে শিখলাম অসীম তিতিক্ষা।।
সমুদ্র যে শিক্ষা দিল জীবন মানে কর্ম।
পশু পাখি শিক্ষা দিল মিলে থাকাই ধর্ম।।
তারারা যে দিল মোদের আলোর মন্ত্রে দীক্ষা।
জীবন ভরে উঠুক আলোয় সূর্য দিল শিক্ষা।।

একটি টুপি ঘটিত কাহিনী

স্বপন বন্দ্যোপাধ্যায়

সেদিন ঘরে ঢুকে দেখলাম এক দক্ষযজ্ঞ ব্যাপার চলছে। কালাবাবু ছাড়বেন না, মহর্ষিও বাগ মানবে না। যাকে বলে সারা ঘর জুড়ে দুজনের ছুটোছুটি। শেষ পর্যন্ত খোলা জানলা পথেই লাফ দিয়ে পালাল মহর্ষি।

কালাবাবুর হাতে রয়ে গেল মহর্ষির মাথার এক গোছা লোম আর একটি টুপি। পুরনো নক্সাকাটা একটা পশমের টুপি।

আশাকরি আমার পাঠকদের মধ্যে যারা আমার প্রতিবেশী কালাচরণ বাচস্পতিকে চেনেন তাঁরা কালাবাবুর পোষ্য হুলো বেড়াল মহর্ষিকেও জানেন।

আর সে কারনেই মহর্ষির কষ্টটা লাঘব করার চেষ্টায় মেতেছেন কালাবাবু।

কষ্ট বলতে শীতের কষ্ট। কথায় বলে, 'মাঘের শীত বাঘের গায়ে'। আর বেড়াল তো বাঘের মাসী (এক্ষেত্রে মেসো নিশ্চয়ই) সুতরাং এই মাঘ মাসের শীতে বেড়ালের যে কষ্ট হবে তা তো বলাই বাহুল্য। আর সে কারনেই মহর্ষির জন্যে এক প্রস্থ জামা বানিয়ে ফেলেছেন কালাবাবু।

সে জামা যদি বা বেড়ালকে পরানো গেছে, মাথায় টুপি কিছুতেই পরানো যাচ্ছে না। বেড়ালের মাথায় টুপি পরানো যে মানুষের কর্ম নয়, তা তো এক্ষুনি চোখের সামনেই দেখলাম। এখান থেকেই মহর্ষির মোটা গলার "ম্যাঁ ... ও ম্যাঁ .... ও ..... ও" ডাক শুনতে পাচ্ছি। আমার মনে

বড় টুপির ছবি

মহর্ষি শুধু কালাবাবুর পোষ্যই নয়, তাঁর একান্ত আপন। বলতে গেলে এ সংসারে তাঁর সবচেয়ে কাছের জন। হচ্ছে পাশের বাড়ির পাঁচিলে জামা গায়ে বসে মহর্ষি কালাবাবুকে তাঁর আচরণের জন্য তিরস্কারই করছেন।

কগলাবাবু এতক্ষণ সামনের সোফাটায় বসে হাঁফাচ্ছিলেন। ওই তো লিকপিকে চেহারা। এত ধকল সইবে কেন। এ অবস্থায় আমায় দেখে বোধ হয় কিছুটা লজ্জাই পেলেন। একটু শুকনো হেসে বললেন — এ টুপিটা ছেলেবেলায় আমি পরতাম স্বপনবাবু, এতদিন যত্ন করে রাখা ছিল। ভেবেছিলাম এই শীতে এটাই ওকে পরিয়ে রাখি, কিন্তু যা চঞ্চল ....।

—চঞ্চল। মানে বেড়ালটার কথা বলছেন ? না জিগ্যেস করে পারলাম না।

— হ্যাঁ। কগলাবাবু এবার টুপিটা ভাঁজ করতে করতে বললেন, — জানেন, ছেলেবেলায় আমিও ওই রকমই চঞ্চল আর দুষ্টু ছিলাম। আমাকেও আমার মা যখন ওই টুপিটা পরাতে আসতো, আমিও সারা ঘরে চর্কিপাক খেয়ে ঘুরতাম।

— তবে কি বলতে চান টুপিটার দোষ শুনেই ..... কথাটা বেশ নিরাসক্ত ভাবেই বলার চেষ্টা করলাম।

— হতে পারে। কগলাবাবু কিন্তু বেশ সিরিয়াস। এক একটা জিনিসের এক একটা বৈশিষ্ট্য তো থাকেই। জানি না আপনাদের বিজ্ঞান কি বলে, কিন্তু ....।

এবার আমি চেষ্টা করেও হাসি চাপতে পারলাম না। তবু প্রাণপনে নিজেকে স্বাভাবিক রাখার চেষ্টা করে বললাম, — এক্ষেত্রে আপনার টুপির বিশ্বাস কি বলে জানি না, তবে বেশ কয়েকবছর আগে একটা টুপির সাহায্যে একটা দারুণ ঘটনা ঘটিয়েছিলেন আশ্চর্য বিজ্ঞানী স্যার সত্যপ্রকাশ।

— স্যার সত্যপ্রকাশ। নামটা শুনেই দুচোখ বড় হয়ে উঠলো কগলাচরণ বাচস্পতির। বললেন, কিন্তু কোনদিন তো ওঁর মাথায় টুপি দেখিনি স্বপনবাবু !

— না। টুপি উনি নিজে কোনদিন পরেন নি বটে, তবে টুপির সাহায্যেই একবার এক অসাধ্য সাধন করেছিলেন।

— ব্যাপারটা বেশ রহস্যজনক মনে হচ্ছে। একটু কি ভেঙে বলা যাবে না ? কগলাবাবু এবার আগ্রহাতিশয্যে বোধকরি মহর্ষির ডাক আর শুনেও শুনলেন না।

— ব্যাপারটা তাহলে খুলেই বলি। অতীত সে প্রসঙ্গটা এবার পেড়েই ফেললাম।

বেশ কয়েক বছর আগের কথা। বিজ্ঞানী স্যার সত্যপ্রকাশের সঙ্গে নতুন করে পরিচয়ের কিছুদিন পর।

সত্যি বলতে কি স্যার সত্যপ্রকাশের মুখ থেকে ঘটনাটার কথা শুনে সেদিন আমারই বিশ্বাস করতে মন চায় নি। তবু সে কথা ওঁর মুখের সামনে উচ্চারণ করতে পারিনি। কারণ মানুষটা আর কেউ নয় — স্যার সত্যপ্রকাশ।

সত্যিই একথা ভাবা যায়, একজন মানুষ শুধু একটা ছোট্ট যন্ত্রের কৌশলে একটা গোটা সেনা বাহিনীকে পর্য্যদুস্ত করে দিয়েছিলেন।

হয়তো আপনারা কোন অস্ত্রের কথা ভাবছেন। আধুনিক সমর বিজ্ঞানীদের কৃপায় সাংঘাতিক সব মারনাস্ত্রের অভাব তো কোন দেশেরই নেই। গোটা হিরোসিমা আর নাগাসাকিকে ধ্বংস করতে দুটির বেশী এ্যটম বোমার দরকার হয় নি। আর আজ তো আমরা এ্যটম বোমাকে পেছনে ফেলে আরও অনেক প্রাণঘাতী অস্ত্রের আবিষ্কার করতে পেরেছি।

কিন্তু স্যার সত্যপ্রকাশের আবিষ্কৃত কৌশলে যুদ্ধজয়ের জন্য কোন বিধ্বংসী অস্ত্র ছিল না। ছিল অন্য কিছু — আর সেটাই আমার আজকের কাহিনী।

স্যার সত্যপ্রকাশের কথামতো কাহিনী শুরু করি ঃ

আগেই বলেছি ঘটনাটা বেশ কয়েকবছর আগের। তখন দুই প্রতিবেশী দেশের মধ্যে প্রচণ্ড যুদ্ধ চলছে।

আসলে দু-দেশের মধ্যে উত্তেজনাটা কয়েকমাস যাবৎই চলছিল। তারপর হঠাৎ কথা নেই বার্তা নেই এক দেশের সেনাবাহিনী জল স্থল অন্তরীক্ষে হুড়মুড় করে অন্য দেশের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। দেশের বিভিন্ন পথে সীমান্ত ডিঙিয়ে এগিয়ে এল শত্রুর ভারী ভারী ট্যাঙ্ক, কনভয়, গোলোন্দাজের দল। অন্য দেশের পশ্চিম আকাশ ছেয়ে গেল বিমান বহরে। বৃষ্টির মতো বোমা পড়তে শুরু করলো দেশের বিভিন্ন প্রান্তে। এ ঝটিকা আক্রমণে দিশেহারা হয়ে গেল আমাদের দেশের সেনাবাহিনী। সব থেকে বিপদের কথা, আক্রমণটা কখন, কোন দিক থেকে আসবে সেটা কিছুতেই বোঝা যাচ্ছিল না। শত্রুদেশের সেনাবাহিনী পরিচালনা করছিলেন এক অতি কুশল সেনাধ্যক্ষ। তিনি

ক্ষণে ক্ষণে পরিবর্তন করছিলেন তাঁর আক্রমনের ধারা এবং রীতি, যা মোকাবিলা করতে আমাদের সেনাবাহিনীর জওয়ানদের রীতিমত হিমসিম খেতে হচ্ছিল।

এই সময়টাতে স্যার সত্যপ্রকাশ রাজস্থানের রতনপুরে তাঁর নিজস্ব ল্যাবরেটারীতে। তখন তাঁর অজ্ঞাতবাস চলছে বলা চলে।

কিন্তু অজ্ঞাতবাসে থাকলেও দেশের সব খবরই রাখতেন স্যার সত্যপ্রকাশ। শত্রুপক্ষের হাতে আমাদের সেনাবাহিনীর নাকাল হওয়ার কারনটাও উনি বুঝলেন। উনি দেখলেন সেনাবাহিনী সীমান্ত পেরিয়ে ক্রমেই ঢুকে পড়ছে এদেশের আরও ভেতরে। তবে কি সত্যিই এদেশের সরকারকে পরাজয়ের কালিমা মুখে মেখে শত্রুদেশের সঙ্গে সন্ধি করতে হবে ? এর চেয়ে লজ্জা আর কীই বা হতে পারে।

স্যার সত্যপ্রকাশ আর দেরী করলেন না। উনি দেখা করলেন পশ্চিম রনাঙ্গনের সমর অধিকর্তার সঙ্গে। তাঁকে খুলে বললেন নিজস্ব পরিকল্পনার কথা। শুনে আমার মতো সমর অধিকর্তাও সেদিন স্যার সত্যপ্রকাশের পরিকল্পনাকে আজগুবি বলে উড়িয়ে দিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু দেশের বৃহত্তর স্বার্থের কথা ভেবে স্যার সত্যপ্রকাশ সে অবহেলা গায়ে মাখেননি। ফিরে এসেছিলেন নিজের ল্যাবরেটারীতে। তারপর তিনদিন তিন রাত ধরে ক্রমাগত পরীক্ষা নীরিক্ষা চালিয়ে নিজের নব আবিষ্কৃত যন্ত্রটি নিখুঁত ভাবে তৈরী করেছেন। তারপর সেটা সঙ্গে নিয়ে গিয়ে আবার দেখা করেছেন সেই সমর অধিকর্তার সঙ্গে। নানাভাবে তাঁকে বোঝাবার চেষ্টা করেছেন। আমাদের সেনাবাহিনীর অবস্থা তখন সত্যিই করুণ। সমস্ত প্রতিরোধগুলো একে একে ভেঙে পড়ছে। অবশেষে অবিশ্বাস সত্ত্বেও ডুবন্ত মানুষের কাছে খড়কুটো আঁকড়ে ধরার মতো সমর অধিকর্তা আঁকড়ে ধরলেন স্যার সত্যপ্রকাশের ফর্মূলা। সেই মতো শুরু হলো কাজ। কিন্তু সমস্ত ব্যাপারটা খুব গোপন রইলো। সমর অধিকর্তা ছাড়া জানলো কেবল একজন। সে সমর অধিকর্তারই এক বিশ্বস্ত সহচর। তার কাজ হলো শত্রুপক্ষের যুদ্ধ পরিচালনারত সেনাধ্যক্ষের একেবারে কাছাকাছি পৌছনো এবং তার মাথার সামরিক টুপিটা কোন রকমে হাতিয়ে নিয়ে সেই জায়গায় হুবহু ওই রকম আর একটা টুপি রেখে আসা।

—টুপি ! বগলাবাবু এবার আর মুখ না খুলে বোধকরি পারলেন না, বলছেন কি স্বপনবাবু, এসব কি কথা আপনাকে স্যার শুনিয়েছেন ?

— শুধু কি শুনিয়েছেন, এই সঙ্গে জানাতে ভোলেন নি সেদিন, সেই সেনাধ্যক্ষের টুপি বদলের সাফল্যের ওপরই নির্ভর করেছে ভারতীয় সেনাবাহিনীর সাফল্য।

— কি রকম ?

— আসলে সেটা কোন সাধারণ টুপি ছিল না। সেনাবাহিনীর টুপি পাল্টে যে বিশেষ ভাবে তৈরী টুপিটা সেদিন রেখে আসা হয়েছিল তার মধ্যে ছিল স্যার সত্যপ্রকাশের সদ্য আবিষ্কৃত এক নতুন অস্ত্র। উনি তার নাম দিয়েছিলেন 'চিন্তা প্রক্ষেপন যন্ত্র'।

— 'চিন্তা প্রক্ষেপন যন্ত্র' !

— হ্যাঁ, সেদিন আমার কৌতূহলী প্রশ্নের উত্তরে স্যার সত্যপ্রকাশ যা বলেছিলেন, তা এই রকম ঃ

আমাদের যাবতীয় কর্মোদ্যক্ষের পেছনে কাজ করে আমাদের ভাবনা। না ভেবে কোন কাজই কোন সুস্থ মানুষ করতে পারে না — তা সে যত ছোট বা বৃহৎ কাজই হোক না কেন। তাই মানুষের সমস্ত কর্ম বা পরিকল্পনার মূলে থাকে তার চিন্তাশক্তি। আর সে চিন্তার উৎস মানুষের মস্তিষ্ক। বরং বলা যায় মস্তিষ্কের বিশেষ কয়েকটা কোষের কম্পন। স্যার সত্যপ্রকাশের আবিষ্কৃত 'চিন্তা প্রক্ষেপন যন্ত্র' একজন মানুষের চিন্তার ভাষা অন্যের কাছে প্রকাশ করে দিতে পারতো — যদিও স্বাভাবিক ভাবে তা সম্ভব নয়।

— বলেন কি ?

— হ্যাঁ। আর এই যন্ত্রের সাহায্যে শত্রুপক্ষের সেনাবাহিনীর সেনাধ্যক্ষের যুদ্ধ সংক্রান্ত প্রতিটি পরিকল্পনা এবং কৌশলই জন্ম মুহূর্তে আমাদের সামরিক বিভাগ জেনে ফেলতো।

— কিন্তু ব্যাপারটা কিভাবে সম্ভব হয়েছিল ? একটু খুলে বলবেন ?

বগলাবাবুর প্রশ্নের উত্তরে বলি — দেখুন আমার পক্ষে এই জটিল আবিষ্কারটিকে পুরোপুরি ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়, তবে সেদিন স্যার সত্যপ্রকাশের কথায় যেটুকু বুঝেছি তা হলো — ঐ সেনাধ্যক্ষের কাছে পাঠানো সেই বিশেষ টুপির সামরিক ব্যাজটার মধ্যে ছিল একটি অতিসূক্ষ্ম ইলেকট্রনিক যন্ত্র। তার মধ্যে রাখা ছিল অতি সেনসিটিভ মাইক্রোফয়েল। সেই টুপি ধারণকারী ব্যক্তিটির প্রতিটি চিন্তার কম্পনকে সেই মাইক্রোফয়েলের মধ্যে সঞ্চারিত করে এবং ম্যাগনিফাই করে চৌম্বক তরঙ্গ মাধ্যমে তা নিয়ে আসা হতো কয়েকশো মাইল দূরে স্যার সত্যপ্রকাশের ল্যাবরেটারী ঘরে। সেখানে একটা রিসিভার তাকে গ্রহণ করতো। তারপর তা বিশেষভাবে তৈরি একটি টেপে আঁচড় দিয়ে সৃষ্টি করতো চিন্তার তরঙ্গ রেখা। সেই টেপকে উচ্চ বিদ্যুৎ প্রবাহে চালিত করলেই সেই গ্রাফ বা রেখাচিত্র সাউণ্ড এনার্জিতে পরিণত হতো। তখন সেই চিন্তার ভাষা উদ্ধার করা স্যার সত্যপ্রাকাশের কাছে আর এমন কিছু শক্ত ব্যাপার ছিল না। অর্থাৎ আমি যেটুকু বুঝেছি জিনিসটা অনেকটা টেপ রেকর্ডারেরই মতোই। তবে মূল পার্থক্য এক্ষেত্রে চিন্তা তরঙ্গকে চৌম্বক তরঙ্গে পরিবর্তিত করে তা আবার শব্দ তরঙ্গে রূপান্তরিত করা হয়েছিল।

এই পর্যন্ত শুনেই তিড়িং করে লাফিয়ে উঠেছেন বগলাবাবু, এতো এক যুগান্তকারী আবিষ্কার মশাই। এমন জিনিসটা উনি রাখলেন কোথায় ?

— সেদিন ওঁর মুখে ব্যাপারটা শুনে এ প্রশ্ন আমিও করেছিলাম। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলি, উনি উত্তরে জানিয়েছেন, প্রয়োজন শেষ হতেই এ যন্ত্র উনি নষ্ট করে ফেলেছেন।

— সেকি ! কেন ?

— আমরা এ যন্ত্র ব্যবহারের উপযুক্ত হইনি বলে। এমন একটি যন্ত্র দেশের সরকারের হাতে থাকলে সাধারণ মানুষ চিন্তা করতেও ভয় পাবে। হয়তো চিন্তার ওপর নিয়ন্ত্রণের বোঝাও চাপানো হতে পারে। অথচ আজ মানুষ তার সবকিছু হারালেও একমাত্র চিন্তার অধিকারটুকু বজায় রাখতে পেরেছে। 'চিন্তা প্রক্ষেপন যন্ত্র' সকলের হস্তগত হলে দুর্বলেরা তাদের সেই শেষ স্বাধীনতাটুকুও হারাতে পারে। মানুষের বঞ্চিত হওয়ার এ সম্ভাবনাকে স্যার সত্যপ্রকাশের মতো বিজ্ঞানী মেনে নিতে পারেন নি।

বেশ কিছুক্ষণ সময় বাদে বগলাচরণ বাচস্পতি নীরবতা ভাঙলেন। তারপর ফিস ফিস করে বললেন — স্বপনবাবু, স্যার সত্যপ্রকাশের সঙ্গে আবার দেখা হলে আমার তরফ থেকে একটা অনুরোধ জানাবেন ?

— কি অনুরোধ ?

— ওঁর 'চিন্তা প্রক্ষেপন যন্ত্রের' ফর্মূলাটা যদি আজও থাকে তবে তার সাহায্যে অন্ততঃ একটা টুপি যেন বানিয়ে দেন আমার মহর্ষির জন্যে। তাহলে আর যাই হোক, ওর সঙ্গে আমার ভুল বোঝাবুঝি হবার দুর্ভাবনাটা আর থাকবে না . . . . . ।

— ম্যাও - - - - - ও - - - ।

বগলাবাবুর কণ্ঠের বিষন্ন সুরের কথাগুলো শেষ হবার আগেই মহর্ষির ডাক শুনে ফিরে তাকালাম। বেড়ালটা বগলাবাবুর একেবারে পাশ ঘেঁসে এসে দাঁড়িয়েছে। ওর মধ্যে দুরন্তপনার লক্ষণমাত্র নেই।

কি মনে হতে বগলাবাবু আর কিছু বলার আগেই ওঁর সেই সাধের টুপিটা মহর্ষির মাথায় পরিয়ে দিলাম।

এবার কিন্তু হুলো কাবলী বেড়ালটা এতটুকু আপত্তি জানাল না।

এই মুহূর্তে ওর এই আশ্চর্য পরিবর্তনটাও কিন্তু কম বিস্ময়কর নয় !

With Best Compliments From :—

JASHODA NANDAN DUTT

ENGINEER BUILDER & CONTRACTOR

76/1, BIDHAN SARANI,
CALCUTTA-700 006

PHONE : 555-9504, 555-7120

শব্দ জব্দ

সুমিত্রা চৌধুরী

আকাশে চাঁদ ওঠেনি। ঘুটঘুটে অন্ধকার রাত্রি। এরই মধ্যে বাদুড় চামচিকেরা বেরিয়ে পড়েছে শিকারের সন্ধানে। অন্ধকারেই দিব্যি বুঝতে পারছে কোনটা খাবার আর কোনটা নয়। ছোট ছোট কীট পতঙ্গকেও উড়ে গিয়ে গলাধঃকরণ করছে। এমনকি পোকাটার নড়াচড়া বা ডানা ঝাপটানো ধরে ফেলতেও বাদুড়ের কোনো অসুবিধা হয়না। শিকার ধরার পথে ঘরবাড়ী, গাছপালা ইত্যাদি অখাদ্য কিছু পড়লেও দিব্যি পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে যায়। এসব শুনলে মনে হতেই পারে বাদুরের দৃষ্টি শক্তি খুব তীক্ষ্ণ, ঘুটঘুটে অন্ধকারেও ভালো দেখতে পায়। ঘটনাটা কিন্তু মোটেও তা নয়। বিড়াল জাতীয় জন্তুগুলি খুব সামান্য আলোতেও দেখতে পেলেও বাদুড়ের সে ক্ষমতা নেই। বাদুরের এই সব ঘোরাঘুরি, শিকার ধরার মূলে রয়েছে বাদুড়দের সৃষ্টিকরা শব্দহীন শব্দ আর তার শব্দহীন প্রতিশব্দ বা প্রতিধ্বনি।

নিঃশব্দ শব্দটা আবার কি ? হ্যাঁ, আছে। যে আলো আমরা চোখে দেখতে পাই তার বাইরেও যেমন আলোক তরঙ্গ আছে, তেমনি যে শব্দ শুনতে পাই তার বাইরেও শব্দ আছে।

জল, মাটি, ইট, কাঠ, ধাতু বা অন্যান্য বস্তু যখন কোনো কারণে কাঁপতে থাকে আর সেই কম্পন বাতাসে ঢেউ এর সৃষ্টি করে, সেই ঢেউ এসে ধাক্কা দেয় আমাদের কানের পর্দায়, সেই ধাক্কাটাই আমরা শব্দ বা আওয়াজ হিসাবে শুনি। একদম শূন্য জায়গায় (যেখানে কোনো বায়ু পর্য্যন্ত নেই) কোনো শব্দ অর্থাৎ কম্পন তৈরী হলেও শুনতে পাবোনা, কেননা ঐ কম্পন বায়ুকণা বা অন্যকোনো মাধ্যমে (যদি তাতে কান ঠেকিয়ে রাখা যায়) কে কম্পিত করলে তবেই আমরা শুনতে পাবো। শব্দ যেহেতু ঢেউ হয়ে চলাফেরা করে কাজেই ঢেউগুলোও জলের ঢেউএর মতই বড় বা ছোট হতে পারে। বিভিন্ন মাধ্যমে শব্দের গতিবেগই নির্দিষ্ট। এক সেকেণ্ডে শব্দের ঢেউ যতটা দূরত্ব অতিক্রম করে তাই শব্দের গতিবেগ। মোটামুটি শুকনো বাতাসে এই গতিবেগ সেকেণ্ডে ৩৩২ মিটার। এখন ঢেউগুলো যদি আকারে ছোট, বড় হয় তাহলে এই ৩৩২ মিটার রাস্তায় ঢেউ-এর সংখ্যাতেও তারতম্য হবে। এই সংখ্যাটাকে বলে শব্দের কম্পাঙ্ক (frequency) এর একক ধরা হয় হার্জ। এক একটা ঢেউ যতখানি জায়গা জুড়ে থাকে তাকে বলে তরঙ্গ দৈর্ঘ্য এবং ঢেউগুলো যতটা উঁচু বা নীচু হয় তাকে বলে ঢেউএর বিস্তার বা অ্যামপ্লিচিউড। শব্দ তরঙ্গের ছবিটা কেমন দেখাবে ? ঠিক যেন দুটো একই মাপের বাটি পরস্পর বিপরীত মুখী করে পাশাপাশি সাজিয়ে রাখা হয়েছে। দুটো উল্টোনো বাটির মোট দৈর্ঘ্য (AB রেখা) হলো একটি ঢেউএর দৈর্ঘ্য (তরঙ্গ দৈর্ঘ্য) আর OX এই লম্ব দূরত্ব হলো ঢেউএর বিস্তার। এখন ১০০০ থেকে ২০,০০০ হার্জ কম্পাঙ্কের যে কম্পন

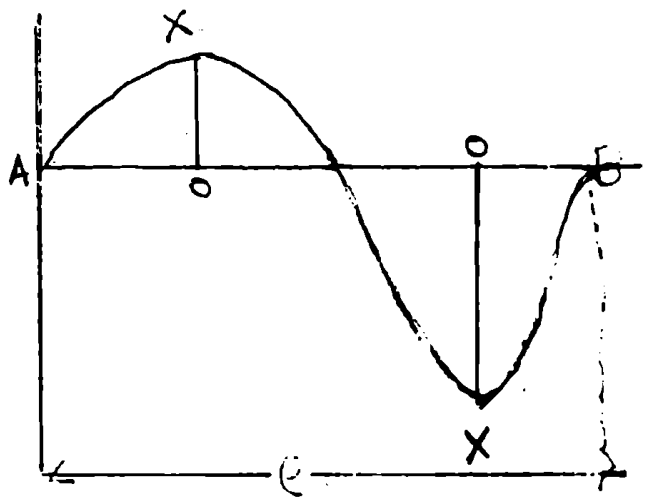

চিত্র – ১

তৈরী হবে তা আমরা শুনতে পাবো। এর কম বা বেশী কম্পাঙ্কের শব্দ আমরা শুনতে পাইনা। ১০০০ এর কম কম্পাঙ্কের শব্দকে বলা হয় অবশব্দ (subsound)। সাধারণতঃ ভূমিকম্পের পর বিরাট বিরাট ঢেউ তোলা এই শব্দ সৃষ্টি হয়। আবার ২০,০০০ এর বেশী কম্পাঙ্কের শব্দকে বলে অতিশব্দ বা শব্দোত্তর শব্দ (ultrasound)। সাধারণ শব্দও যেমন কোনো কঠিন বস্তুতে ধাক্কা খেয়ে খানিকটা প্রতিফলিত হয়ে প্রতিধ্বনি সৃষ্টি করে, শুনতে না পেলেও এই শব্দোত্তর শব্দও প্রতিফলিত হয়।

বাদুড় যেমন শব্দোত্তর শব্দ তৈরী করতে পারে, তেমনই এই শব্দের প্রতিধ্বনি শুনতেও পায়।

রাত্রির অন্ধকারে গাছের ডালে ঝুলন্ত অবস্থায় বাদুড়েরা চারিদিকে এই শব্দোত্তর শব্দ পাঠাতে শুরু করে। এদের কম্পাঙ্কে তিরিশ হাজার থেকে সত্তর হাজার হার্জ পর্য্যন্ত হতে পারে আর তরঙ্গ দৈর্ঘ্য পাঁচ থেকে এগারো মিলিমিটার। এখানে একটা ছোট্ট অঙ্ক কষে নেওয়া যেতে পারে। একটা নির্দিষ্ট মাধ্যমে শব্দের গতিবেগও নির্দিষ্ট। যদি গতিবেগকে υ ধরি, কম্পাঙ্ককে n এবং তরঙ্গ দৈর্ঘকে λ। তাহলে সংজ্ঞা অনুযায়ী $n \times \lambda = \upsilon$। অর্থাৎ n বাড়লে λ কমবে এবং n কমলে λ বাড়বে।

বাদুড়ের পাঠানো তরঙ্গ যদি প্রতিফলিত হয়ে ফিরে না আসে তাহলে ওরা বুঝতে পারে ধারে কাছে কোনো কঠিন বস্তু নেই। আবার কঠিন বস্তুতে প্রতিফলিত হয়ে ফিরে এলেই তক্ষুনি বোঝার উপায় নেই সেটি খাদ্যবস্তু না কি অন্যকিছু। এই বার এই শব্দ তরঙ্গ পাঠিয়েই বাদুর বুঝতে পারে বস্তুটা সচল না কি অচল। সচল হলে, এবং প্রতিফলিত শব্দের পরিমান থেকে সজীব বস্তুটির আকৃতিও বুঝতে পারে। ধরো একটা পতঙ্গ ডানা গুটিয়ে কোথাও বসে আছে, একটু বাদেই হয়ত ডানা দুটো মেলে ধরলো, এরপর উড়তে শুরু করলো। বাদুড়টা যদি পতঙ্গের নজরে আসে তাহলে উল্টোদিকে উড়ে পালাতে চেষ্টা করবে, আর না হলে বাদুড়ের দিকেও উড়ে আসতে পারে। এখন বাদুড়তো তার চারদিকে নিঃশব্দ শব্দ-তরঙ্গ পাঠিয়েই যাচ্ছে। পোকাটার নড়াচড়া, ডানা মেলা উড়ে যাওয়া এই বিভিন্ন সময়ে যে বিভিন্ন কম্পাঙ্কের প্রতিধ্বনি পাওয়া যাবে সেই রকমফের থেকেই বাদুর ধরে ফেলবে তার অভীষ্ট শিকার এখন কি করছে। ভাবলে আশ্চর্য হবে যে মুহূর্তে শিকারকে চিহ্নিত করতে পারবে বাদুড় তখন আর চারদিকে শব্দ তরঙ্গ না পাঠিয়ে ঐ পোকাটাকে লক্ষ্য করেই শব্দ পাঠাতে শুরু করবে। আর যদি কোনো দিকে শব্দ পাঠিয়ে ফিরে আসার প্রতিধ্বনির কম্পাঙ্কের কোনো রকমফের না হয় তখন বুঝতে পারবে ঐ দিকে খাদ্যপদবাচ্য নয় এমন কোনো কঠিন বস্তু আছে। অর্থাৎ ভুলেও ও পথে যেওনা।

বাদুড় যখন এমন জায়গায় থাকে যেখানে অন্য কোনো বাদুড় নেই, সেই সময় সাধারণত স্থির কম্পাঙ্কের শব্দোত্তর শব্দ (সি-এফ বা কনষ্ট্যাণ্ট ফ্রিকোয়েন্সি) পাঠাতে থাকে। প্রায় ষাট হাজার হার্জের (ষাট কিলো হার্জ) কাছাকাছি একটানা শব্দ-তরঙ্গ। বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায় দেখা গেছে ৬১.৮ কিলো হার্জ কম্পাঙ্কের শব্দতরঙ্গের প্রতিধ্বনি এরা সবথেকে ভালো শুনতে পায়। হঠাৎ মনে হতেই পারে বাদুড় যদি একটানা ভীষ্মলোচন শর্মার মতো আওয়াজ পাঠাতেই থাকে তাহলে ঐ একটানা আওয়াজের মধ্যে কীটপতঙ্গের গা থেকে ঠিকরে আসা প্রতিধ্বনি শুনবে কি করে ? শিকারও যদি স্থির বসে থাকে ধরতে পারবেনা কিন্তু যেই নড়তে চড়তে বা উড়তে শুরু করবে তখনই ফিরে আসা শব্দের কম্পাঙ্কে তারতম্য হবে। ধরা যাক তুমি কোনো একটি রেলষ্টেশনে দাঁড়িয়ে আছো। দূর থেকে একটা ট্রেন হুইসল দিতে দিতে ষ্টেশনে না থেমে সোজা বেরিয়ে গেল। ট্রেনটা দূর থেকে যত ষ্টেশনের কাছাকাছি আসবে হুইশলের আওয়াজ তত তীক্ষ্ণ হবে। আবার ট্রেন যখন ষ্টেশন ছেড়ে বেরিয়ে যাবে আওয়াজ আস্তে আস্তে কমতে থাকবে। এক্ষেত্রে ট্রেন যত ষ্টেশনের কাছাকাছি আসবে তোমার আর ট্রেনের মধ্যে দূরত্ব কমবে আর যে শব্দ শোনা যাচ্ছে তার তরঙ্গ দৈর্ঘ্য কমবে অর্থাৎ কম্পন সংখ্যা বাড়বে এবং তীক্ষ্ণতাও বাড়বে। আবার ট্রেনটি দূরে চলে গেলে তরঙ্গ দৈর্ঘ্য বাড়বে আর কম্পাঙ্ক কমবে। একে বলে ডপলার ক্রিয়া।

বাদুড়দের ক্ষেত্রেও একই ঘটনা ঘটবে। বাদুড় একই কম্পাঙ্কের শব্দতরঙ্গ পাঠালেও শিকার যদি বাদুড়ের দিকে আসে তাহলে প্রতিফলিত শব্দের কম্পাঙ্ক বাড়বে আর

শিকার উল্টোদিকে পালাতে থাকলে ফিরে আসা শব্দের কম্পাঙ্ক বাদুড়ের পাঠানো শব্দের কম্পাঙ্কের থেকে কম হবে।

এখন কোনো বদ্ধ জায়গায় (পাহাড়ের গুহা বা পোড়ো বাড়ী) যদি অনেক বাদুড় থাকে সে ক্ষেত্রে প্রত্যেক বাদুড়ই তো শব্দোত্তর শব্দ পাঠাতে পারে। কাজেই একজনের সঙ্গে অন্যের পাঠানো শব্দের ধরণ যেন এক না হয় সেটা দেখতে হবে। সি. এফ ছাড়াও আরও দুধরণের তরঙ্গ বাদুড়েরা তৈরী করতে পারে। এ. এম (অ্যামপ্লিচিউড মডিউলেটেড) এবং এফ এম (ফ্রিকোয়েন্সি মডিউলেটেড) তরঙ্গ। আকাশবাণী বা দূরদর্শনের সুবাদে এ. এম এবং এফ. এম প্রচার তরঙ্গ দুটি খুবই পরিচিত। এ. এম তরঙ্গের ক্ষেত্রে কম্পাঙ্ক স্থির রেখে তরঙ্গের বিস্তারকে ইচ্ছামতো পরিবর্তিত করে নেওয়া যায়। আর এফ এম তরঙ্গের ক্ষেত্রে প্রেরিত শব্দের কম্পাঙ্কে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন করে অন্যদের থেকে পৃথক কম্পাঙ্কের শব্দ তৈরী করা যায়। আকাশবানী বা দূরদর্শনের ক্ষেত্রে প্রেরকযন্ত্র থেকে এ. এম বা এফ. এম শব্দ বহু দূরে পাঠানো যায়. আবার নির্দিষ্ট গ্রাহক যন্ত্রে নব ঘুরিয়ে প্রয়োজনীয় শব্দ তরঙ্গে পরিণত করা হয়। বাদুড়েরা সরাসরি নিজস্ব এফ. এম বা এ. এম শব্দ তরঙ্গ পাঠাতে থাকে আর প্রতিধ্বনি থেকে ঠিক ঠিক নিজ নিজ প্রতিফলকটিকে খুঁজে বার করে নেয়। শিকারকে নিঃশব্দ শব্দে জব্দ করে।

আমাদের আন্তরিক
শারদ শুভেচ্ছা

❖

শুভার্থী

জীবনের অস্তিত্ব মঙ্গলগ্রহে ?

অমিয়কুমার হাটি

সম্প্রতি মঙ্গলগ্রহে প্রাণীর অস্তিত্ব সম্পর্কে আমেরিকার বিজ্ঞানীদের প্রতিবেদন সারা পৃথিবীতে প্রচার করা হয়েছে। মঙ্গলগ্রহ থেকে পৃথিবীতে খসে পড়া ১.৯ কিলোগ্রাম একটি পাথর পরীক্ষা করে নাকি কোটি কোটি বছর আগে মঙ্গলগ্রহে প্রাণীর অস্তিত্বের প্রাথমিক প্রমাণ মিলেছে। ঐ পাথরের উপরে পাওয়া গেছে নাকি বীজাণুর ফসিল। বিজ্ঞানীদের মতে সে ১০ লক্ষ বছর আগের কথা। মঙ্গলের গ্রহে ধাক্কা খায় মহাকাশ ঘুরে বেড়ানো খুদে তারকাকণা বা অ্যাসটেরয়েড। মঙ্গলের কিছু অংশ ভেঙে যায়। টুকরোগুলো নানা দিকে ছড়িয়ে পড়ে। তারপর তারই এক টুকরো উল্কাপাত হতে বহু বছর পর নেমে আসে পৃথিবীতে — আছড়ে পড়ে দক্ষিণ মেরুর বুকে। আজ থেকে ১৩ হাজার বছর আগে। সেই মঙ্গল থেকে আসা শিলাখণ্ড আমেরিকানরা আবিষ্কার করেন ১৯৮৪ সালে। তারপর ঐ শিলাখণ্ডকে লেসার, স্পেকট্রোফটোমিটার প্রভৃতি নানা সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতি দিয়ে পরীক্ষা করা হয়। বিজ্ঞানীরা বিচার বিশ্লেষণ করে এ বছর ১৯৯৬ সালে জানিয়েছেন যে মঙ্গল থেকে আসা ঐ পাথরে রয়েছে প্রাণীর আদিম অস্তিত্ব - ফসিলের আকারে। বীজাণুর ফসিল। আমেরিকার 'NASA' বিজ্ঞানীরা বর্তমান এই আবিষ্কারকে এইভাবে বর্ণনা করেছেন — "মনোমুগ্ধকর মোহিনী গোয়েন্দা গল্প" মঙ্গলগ্রহে প্রাণীর অস্তিত্ব সম্বন্ধে যা বলা হয়েছে, অনেকের মতে তা হচ্ছে ধারণা — বলা যেতে পারে বিজ্ঞান ভিত্তিক অনুমান — চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নয়। প্রাণীর অস্তিত্ব সম্বন্ধে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে আসা যায় নি। বিজ্ঞানী মহলে তর্কবিতর্কও আরম্ভ হয়েছে।

এ তর্ক আগেও উঠেছে। লাল গ্রহ মঙ্গল নিয়ে তাতে প্রাণীর অস্তিত্ব ছিল কীনা, থাকতে পারে কীনা এই নিয়ে। একসময় বলা হয়েছিল পাথুরে এই গ্রহের আবহাওয়া ছিল পৃথিবীর আবহাওয়া মণ্ডলের মত গরম এবং জল বয়ে যেতো মঙ্গলের উপর দিয়ে যার ফলে সম্ভব ছিল প্রাণীর অভ্যুদয়। আদি কোন রকমের প্রাণ।

আমেরিকার বিজ্ঞানীরা বলতে চাইছেন হ্যাঁ — ঐ সময়ে তা প্রায় সাড়ে তিনশো কোটি বছর আগে রাসায়নিক টানা পোড়নে সৃষ্টি হয়েছিল ব্যাকটিরিয়ার বা বীজাণুর। লেগে রয়েছিল মঙ্গলের পাথরে। তারপর তা ফসিলে পরিণত হয়েছে। ইলেকট্রন মাইক্রোসকোপে বহুগুণ বড় করে দেখা যায়। তাতে চাপিয়ে দেখা গেছে — যে দাগ বীজাণুরা রেখে গেছে লম্বা — একগুচ্ছ নলাকার নলের দুটো দিকই গোল। ইলেকট্রন মাইক্রোসকোপের নাম স্ক্যানিং টানসিলিং ইলেকট্রন মাইক্রোসকোপ। এতে কোন কিছু চাপালে ১০ লক্ষ গুণ বড় করে দেখানো যায়।

কিন্তু কোটি ডলারের প্রশ্ন এটা নয় যে কে এবং কীভাবে এই বীজাণুদের মেরে ফেলেছে। তবে একটা বেয়ারা প্রশ্ন থাকেই, এটা কি সত্যিই মৃত বীজাণুদের গুচ্ছ গুচ্ছ ফসিল না কি শুকিয়ে যাওয়া মাটি — যা দেখতে লাগছে বীজাণুর শরীরের মত ?

আমেরিকার বিজ্ঞানীরা বলছেন বটে জোর দিয়ে যে এরা মঙ্গল থেকে আসা অণু-ফসিল কিন্তু NASA-র বিজ্ঞানীরা স্বীকার করছেন যে যে সব তথ্য প্রমাণ দেওয়া হচ্ছে, কোনটাই চূড়ান্ত নয় কিন্তু সব মিলিয়ে একটা সাদামাটা সহজ ব্যাখ্যা করা যায় যে মঙ্গলের আদিযুগে সেখানে ছিল

প্রাণীর অস্তিত্ব। যে ভাবে যে ভাষায় তাঁরা বলেছেন, তাতে এটাই স্পষ্ট যে আরো সুনির্দিষ্ট প্রমাণের দরকার। NASA আমেরিকারই মহাকাশ সংস্থা। কাজেই যে কথা বলা হচ্ছে মঙ্গলে প্রাণীর অস্তিত্ব সম্বন্ধে তা নিয়ে সন্দেহ জাগেই।

জীবন ছিল কীনা জানার একটা উপায় আরো চুলচেরা বিশ্লেষণ ঐ ফসিল নিয়ে।

ঐ অতি সূক্ষ্ম ক্ষুদ্র নলগুলি কাটাছেঁড়া করা, মেলানো যে সত্যি কোষের গঠন সত্যি আছে কীনা, কোষের দেওয়ালের অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায় কীনা বা কোষের ভিতর কোন কোন অ্যামাইনো অ্যাসিড আছে কীনা — কারণ অ্যামাইনো অ্যাসিড হল জীবন গড়ে তোলার একক।

মঙ্গল থেকে দীর্ঘ অগ্নি পথ পরিভ্রমণে সৌর জগতের মধ্যে দিয়ে আসতে আসতে পৃথিবীতে পড়ার আগে কীভাবে মঙ্গলের ঐ এক টুকরো পাথরে বীজাণুরা বেঁচে রইল — এ প্রশ্নের সমাধান কিন্তু হয়নি।

এও সম্ভব — ১২০০০ বছর আগে মঙ্গল গ্রহের পাথর আছড়ে পড়ল পৃথিবীতে তারপর ঐ পাথরের সংক্রমণ হল পৃথিবীর কোন বীজাণু দিয়ে। অর্থাৎ মঙ্গল গ্রহের পাথরে বীজাণু লেগেছে, পাথর দূষিত হয়েছে পৃথিবীতে আনার পর।

নতুন করে মঙ্গল থেকে রোবট উপগ্রহ পাঠিয়ে পাথর সংগ্রহ করে এনে পরীক্ষা করা ওখানে আগে প্রাণীর অস্তিত্ব ছিল কিনা জানার আর একটি উপায়। মানুষ পাঠালে এ ক্ষেত্রেও মানুষ থেকে সংক্রমণের সম্ভাবনা বাড়ে। রোবট পাঠালে সংক্রমণের সম্ভাবনা কমানো যায়।

NASA-র পরিকল্পনা আছে আগামী দশ বছরে মঙ্গলগ্রহে দশটি অভিযান সংগঠিত করবে। কিন্তু তা সত্বেও জীবনের অস্তিত্ব সেখানে ছিল কীনা সে তর্ক অমীমাংসিতই থেকে যেতে পারে। কারণ মধ্য ৭-এর দশকে "ভাইকিং" গ্রহযান পাঠানো হয়েছিল, হাল্কাভাবে নেমেও ছিল মঙ্গলে, তাহলেও মঙ্গলের মাটি পরীক্ষা করে প্রাণীর অস্তিত্ব সম্বন্ধে নিঃসংশয় বা নিশ্চিত কোন তথ্য পাওয়া যায়নি।

এইখানেই বর্তমান এই সাড়া জাগানো আবিষ্কারের বড় ত্রুটি। কোটি কোটি ডলার খরচ হয়েছে মেরিনার ও ভাইকিং গ্রহযান পাঠাতে মঙ্গলের বুকে। প্রাণের সন্ধান মেলেনি। তারপর হঠাৎ প্রায় দু কেজি একটা পাথর পরীক্ষা নিরীক্ষা করে প্রচার করা হল মঙ্গলে প্রাণীর অস্তিত্বের কথা। এটা যে অ্যান্টিক্লাইম্যাক্স। অতি সরলীকরণ। হাস্যকর অসঙ্গতি।

আসলে গ্রহান্তরে বা তারকান্তরে প্রাণ আছে এটা মানুষের একটা বিশ্বাস। দার্শনিকরা এ নিয়ে কথা বলেছেন। ধরা যেতে পারে প্লেটোর কথা। তাঁর ধারণা ছিল কোন এক দেবতা যিনি এই মহাবিশ্ব তৈরি করেছেন তিনি সর্বত্র সমান ভাবে আত্মা ছড়িয়ে দিয়েছেন। দার্শনিকদের কথা বাদ দিলেও সাধারণ জ্ঞান থেকে ধারণা জন্মানো সম্ভব পৃথিবীতে প্রাণ থাকলে অন্য কোথাও সে রকম প্রাণ থাকা সম্ভব। ইদানীং আবার আর একটা ঝোঁক দেখা যাচ্ছে।

কেউ কেউ আবার বিজ্ঞান ও ধর্মের মধ্যে কথাবার্তা শুরু করতে চাইছেন। স্বভাবত এঁদের যুক্তির মধ্যে অনেক ধরণের পরস্পর বিরোধিতা থাকে। ঐ রকম একজনের নাম পল ডেভিস — যিনি পৃথিবীতে টাকার দিক থেকে সব থেকে দামি টেমপ্লেটন পুরস্কার পেয়েছেন। তিনি বিবিসিতে এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন, "আমি মনে করিনা যে জীবনের উৎস একটা অলৌকিক ঘটনা মাত্র এবং এও বিশ্বাস করিনা যে এটা একটা বিস্ময়কর রকম দুর্ঘটনা। আমি মনে করি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মূল নীতি এবং নিয়ম মেনেই অন্যত্র জীবনের অস্তিত্ব থাকা সম্ভব।"

কিন্তু ধারণা, ভাবনা, চিন্তা, মনে করা এক কথা, নিশ্চিতভাবে প্রমাণ করা অন্য কথা। আকাশ পাতাল তফাৎ।

এখন পর্যন্ত পৃথিবীর বিজ্ঞান যথেষ্ট এগিয়ে গেলেও নিশ্চিত প্রমাণ মেলেনি।

তবে একথা ঠিক, সাধারণ মানুষ মঙ্গলগ্রহ বাসীদের সম্পর্কে যে সব ধারণা করে রেখেছিল, তাতে আঘাত এসেছে। তাদের ধারণায় নানা ভাববিজ্ঞানের গল্পে তারা জেনেছে মঙ্গলে আছে বুদ্ধিমান প্রাণী — কিন্তু পৃথিবীর প্রতি নেই , তাদের কোন সহানুভূতি। বরং পোষণ করে সাংঘাতিক ঈর্ষা। অধিকার করতে চায় পৃথিবী। কিম্বা মঙ্গল গ্রহের অপরূপ সুন্দরী কন্যাদের হরণ করে নিয়ে যাচ্ছে অন্যগ্রহের লোক যাদের দেখতে পেয়ারার মত।

মঙ্গলে বীজাণু পাওয়া গেছে এই ধারণা, এই আবিষ্কার অকিঞ্চিতকর যদি নাও হয়, তাহলেও সাধারণ মানুষের চিন্তাভাবনার দুনিয়ায় অ্যান্টিক্লাইম্যাক্স। দৈত্যের বদলে দুর্বাঘাস, সিংহের গর্জনের বদলে ভেকের গ্যাঙর গ্যাঙ।

বোকাবাক্স

নৃসিংহকুমার ভট্টাচার্য

টেলিভিশনের আরেক নাম বোকাবাক্স। ইংরেজিতে বলে 'ইডিয়ট বক্স'। কিন্তু কেন এই নাম ? যে টি. ভি. আমাদের প্রত্যেকদিন এনে দিচ্ছে সারা বিশ্বের জরুরী খবর, চোখের পলকে নিয়ে যাচ্ছে সাত সমুদ্দুর পেরিয়ে অলিম্পিকের আসরে, কত অজানা দুনিয়ার দরজা খুলে দিচ্ছে বিস্মিত চোখের সামনে। এ সবই তো বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অবদান। আমাদের ঘরে ঘরে পৌঁছে গেছে কত চ্যানেল, প্রায় সারাদিনরাতই চলছে হরেকরকমের অনুষ্ঠান, তার সঙ্গে ভিডিও ক্যামেরা, ভি. সি. আর-এর খেলা। এ্যানটেনা ডিস্‌ক আজ আর কারো দৃষ্টি আকর্ষণ করে না। এত উন্নতি সত্ত্বেও তার এই অপমানজনক উপাধি কেন ? আসলে একটু চোখকান খোলা রাখলেই ব্যাপারটা বোঝা কিছু শক্ত নয়। টেলিভিশনের অনুষ্ঠান সূচী পর্যালোচনা করলে দেখতে পাওয়া যাবে বেশীর ভাগ সময় জ্ঞান বিজ্ঞানের অনুষ্ঠান প্রায় নেই আর যদিও বা ছিটে ফোঁটা কিছু পরিবেশন করা হয় সেই সময় ছেলে মেয়েরা সেই অনুষ্ঠান দেখার কোন সময় পায় না অর্থাৎ এমনই সময় সেই অনুষ্ঠানগুলো দেখান হয় তখন তারা ইস্কুলে থাকে অথবা সকালের দিকে যখন তারা পড়াশোনায় ব্যস্ত থাকে। অনুষ্ঠান সূচীকে আঁকড়ে রেখেছে একের পর এক সিরিয়াল আর তার ফাঁকে ফাঁকে মন ভোলানো বিজ্ঞাপন। দর্শকের মনে এই দুটি জিনিসেরই প্রভাব অত্যন্ত প্রগাঢ় ও সুদূরপ্রসারী।

বিজ্ঞাপনের কাজ আগে ছিল একটি নির্দিষ্ট ভোগ্যপণ্য সম্পর্কে কিছু কথা বলা। সে কথা যাতে অন্যরকমভাবে বলা হয় তার চেষ্টা অবশ্যই ছিল, কিন্তু তা বলে বিজ্ঞাপনকে আকর্ষণীয় করে তোলার জন্য পণ্যটির সঙ্গে সম্পর্ক বিহীণ ছবি বা পরিস্থিতি ব্যবহার করার কথা চিন্তা করা যেত না। পাউডার মেখে বা ইনহেলার ব্যবহার করে যে চাকরি পাওয়া যায় না তা আমরা জানি। কিন্তু অত্যন্ত মুন্সিয়ানার সঙ্গে এ ছবি তুলে উপযোগী ও আকর্ষণীয় সংগীতের সাহায্যে তাকে উপস্থাপন করলে বারবার তা দেখতে দেখতে আমাদের বাস্তববুদ্ধি গুলিয়ে যেতেই পারে। আর এখানেই আসল গণ্ডগোল। বিজ্ঞাপনের আবেদন কিন্তু বুদ্ধির কাছে নয়, হৃদয়ের কাছে। তাই গায়ে মাখার সাবানের বিজ্ঞাপনের মডেলরা শুধু দেখতেই সুন্দর নয়, তাদের পোষাক-বাড়ি-গাড়ি-চাকুরির জায়গা সব মিলিয়ে তাঁরা অন্য এক জগতের বাসিন্দা। এই চকচকে, টাকাপয়সায় ভরপুর, -াব পেয়েছির দুনিয়া কে না চায় ? যদি একজন সারাদিন হাজারটা বিজ্ঞাপনে হাসি খুশি সুন্দর জামাকাপড় পরা মানুষদের দেখে যারা গাড়ি চড়ে, সেলুলার ফোন ব্যবহার করে, রাজকীয় বাড়ির প্যাঁচালো সিঁড়ি দিয়ে তরতর করে উঠে যায়, যাদের বাথরুম আমাদের শোবার ঘরের চেয়ে প্রশস্ত ও সুন্দর তা হলে তার কী মনে হবে ? সে তখন শুধু সাবান বা পাউডার কিনেই শান্ত হবে না, সে তখন ঐ গোটা জীবনযাত্রাটাই কিনতে চাইবে। তার জীবনের সব মূল্যবোধকে ধীরে ধীরে সরিয়ে দিয়ে প্রবল হয়ে উঠবে টাকা

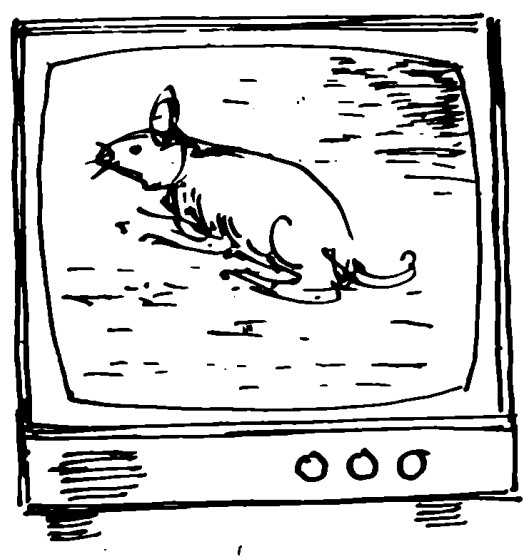

পয়সার চাহিদা, ধনসম্পত্তির লোভ। জীবন ধারা যে এত সহজ নয় এই বাস্তব বোধ হারিয়ে ফেলে ছুটে চলে এক অজানা কাল্পনিক জীবনের পথে। এই অর্থ লোলুপতা যে জীবনের সবকিছু নয় এই সত্যের উপলব্ধি থেকে জীবনকে গড়ে তোলার ও নিজের ধ্যানধারণা গড়ে তোলার বয়সে বিশেষভাবে রেখাপাত করে থাকে। একটু দৃষ্টি দিলেই দেখা যাবে আজকাল ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা এই বিজ্ঞাপনের গান ও আদপ কায়দা দেখাচ্ছে ও অভিভাবকেরা তা খুবই আনন্দের সঙ্গে উপভোগ করছেন এবং তাদের চাহিদা পূরণের জন্য সেই পণ্য সংগ্রহ করতে কুণ্ঠাবোধ করছেন না। এই চাহিদা পূরণের ধারাবাহিকতা বজায় থাকলে এবং আদপ-কায়দা আয়ত্তের ফলে মোটামুটিভাবে নিজস্ব সংস্কৃতি বিসর্জনের পথে আমরা অতি সহজে এগিয়ে যাচ্ছি।

সিরিয়ালগুলি কী করছে ? তার আগে বুঝতে হবে সিরিয়াল তৈরী করে যারা তারা কী চায় ? তারা চায় টাকা। টাকা আসে সিরিয়ালের মাঝে মাঝে যে বিজ্ঞাপণগুলো দেখানো হয় তার থেকে। বিজ্ঞাপন দেয় ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান। স্বাভাবিকভাবেই, সিরিয়াল যত বেশী জনপ্রিয় হবে, তারা তত বেশী বিজ্ঞাপন দেবে। তাই, সিরিয়াল যাতে নিশ্চিতভাবে জনপ্রিয় হয়, প্রযোজকরা চায় ব্যবসায়িক সিরিয়াল পরিবেশন করতে। কোন ঝুঁকি তারা নিতে নারাজ, কোনও নতুন জিনিসকে আমল দিতে অনিচ্ছুক, থোড়-বড়ি-খাড়া আর খাড়া-বড়ি-থোড়, এর বাইরে তারা কিছুতেই যাবে না। কারণ তারা ব্যবসা করার জন্য সিরিয়াল করছে, শিল্প করার জন্য নয়। এই বস্তাপচা অন্তঃসারশূন্য চিন্তা ভাবনাহীন সিরিয়াল একের পর এক দেখতে দেখতে ধীরে ধীরে মানুষের গভীর ও জটিল চিন্তাভাবনার ক্ষমতা চলে যেতে থাকে। এই গতানুগতিক চিন্তাধারা মানুষের চিন্তশক্তির উৎকর্ষতায় বিঘ্ন ঘটায় ফলে সুস্থ ভাবনা-চিন্তার বিকাশ না ঘটে মানুষের জীবনে নেমে আসে গতানুগতিক চিন্তাশক্তির প্রয়োগ ক্ষমতা।

বর্তমানে টেলিভিশনে চলচ্চিত্র যা প্রদর্শিত হয় তা বেশীরভাগ ক্ষেত্রে শিক্ষার চেয়ে অশিক্ষার পথেই এগিয়ে নিয়ে চলেছে। এখানেও বাণিজ্যিক চাকার আবর্তে আমাদের এমনভাবে জড়িয়ে ফেলা হচ্ছে যা থেকে আমরা বেড়িয়ে আসতে পারছি না তো বটেই বরং নেশাগ্রস্থ হয়ে এর নাগপাশে এমনভাবে জড়িয়ে গেছি যা আমাদের নিজেদের সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন করে এক ঘোরে জীবনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। আর কাহিনী চিত্রের মাথামুণ্ডু কিছু নেই শুধু মারদাঙ্গা প্রেমপ্রীতি ইত্যাদি। এখানেও সেই ভাবভঙ্গিহীন গতানুগতিক চিন্তা যার মধ্যে দিয়ে সুস্থ চিন্তাভাবনার বিকাশ আসম্ভব। আর সংলাপ যা এখন কথায় কথায় অনেকে আওড়ায়, প্রিয় নায়ক নায়িকার পোষাক পরিচ্ছদের অনুকরণ যা আমাদের জাতীয় সাংস্কৃতিক জীবনে এক সংকটময় ছবি তুলে ধরছে। এইভাবে যদি সমস্ত অনুষ্ঠান সূচী পর্যালোচনা করা যায় তা হলে বুঝতে অসুবিধে হবে না যে আমাদের বর্তমান প্রজন্মরা এই টেলিভিশনের ফাঁদে পরে গিয়ে সুস্থ ও স্বাভাবিক সাংস্কৃতিক পরিবেশের মধ্যে দিয়ে গড়ে উঠতে পাচ্ছে না। কারণ পঠনের সময় যদি লোভী, রাগী ও হিংস্র, ঘৃণা প্রতিশোধ ও প্রতিহিংসামূলক চরিত্র মনের মধ্যে সর্বদা স্থান পায় তা হলে পরস্পরের সঙ্গে স্নেহ ভালবাসা বা শ্রদ্ধার সম্পর্ক গড়ে উঠতে পারে না। এই গতানুগতিক নিম্ন সাংস্কৃতিক মানে নিজেদের নেশাগ্রস্থ করে রেখে আত্মকেন্দ্রিক চিন্তা, বোধশক্তির বিকাশ, সমস্যা সমাধানের ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতার উন্মেষে বাধার সৃষ্টি হয়। শিল্প অবকাশ যাপনের উপায় মানে এই নয় তাকে নীচু মানে নামিয়ে এই নির্বুদ্ধিতার স্তরে নিয়ে যেতে হবে।

With Best Wishes From :—

❋
❋ ❋
❋

SANAT KUMAR DAS

❋
❋ ❋

29/4, Biplabi Pulin Das Street
Calcutta-700 009

Space Donated By :

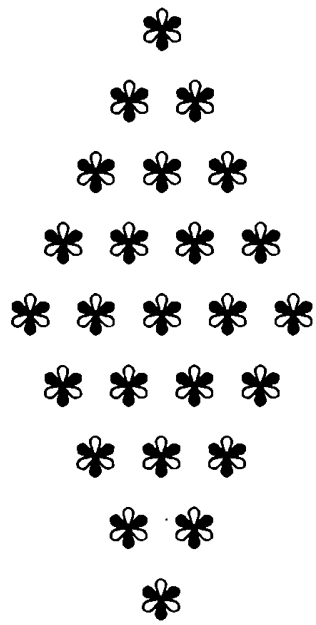

A
WELL WISHER

পরমাণুর আড়ালে বোমা

নি মা ই দ ত্ত গু প্ত

তোমাদের নিশ্চয়ই মনে আছে, টি. ভিতে দেখেছ আমেরিকার ইরাক আক্রমণ। বিশ্বের শিশুরা জানতে চেয়েছিল আমাদের ইরাকের বন্ধুরা বেঁচে আছে তো ? খাদ্য-পানীয় পাচ্ছে তো ? তোমরা বিশ্বযুদ্ধ দেখনি, দু'টি বিশ্বযুদ্ধ হয়েছে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের তুলনায় ২য় বিশ্বযুদ্ধ আরো ভয়ংকর ও ধ্বংসাত্মক ছিল। যুদ্ধের আগে যা কল্পনা পর্যন্ত করা যায় নি।

হিটলার ছিল দ্বিতীয় যুদ্ধের মহানায়ক। যুদ্ধ প্রায় শেষ। জাপানে পারমানবিক বোমা নিক্ষেপ করেছে আমেরিকা। যুদ্ধের জয়-পরাজয় নির্ধারণ করতে কিন্তু এই বোমা ফেলেনি। আমেরিকা পারমাণবিক বোমার শক্তি পরীক্ষা করতে জনজীবনে বোমা ফেলেছে। পারমাণবিক বোমার ধ্বংসাত্মক পরিণতি সকলকে স্তম্ভিত করে দিয়েছে।

১৯৪৫ সালের ৬ই আগস্ট আমেরিকা প্রথম পারমাণবিক বোমা হিরোশিমা শহরে নিক্ষেপ করেছে। তার তিনদিন পর ৯ই আগস্ট দ্বিতীয় বোমাটি নাগাসাকিতে ফেলেছে। দু'টি শহর প্রায় ধ্বংস হয়ে গেছে।

হিরোশিমায় ফেলা বোমাটি বাইশ হাজার টন টি. এন. টি-র সমান। বোমাটি নির্মাণ করা হয়েছে ইউরেনিয়াম ভিত্তিক। বিস্ফোরণে আড়াই লক্ষ মানুষ মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে।

হিরোশিমা-নাগাসাকি শহরে পারমাণবিক বিস্ফোরণের সম্পূর্ণ তথ্য ও বিবরণ আজও জানা সম্ভব হয়নি। প্রতিক্রিয়া, তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া, পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া এবং ভবিষ্যৎ প্রতিক্রিয়া জানা-বোঝার অনুসন্ধান চলছে। আশির দশকের শেষে জাপানে এক ব্যাপক সমীক্ষা হয়েছে। তাতে জানা গেছে পারমাণবিক বিকিরণে ও বিস্ফোরণের প্রভাবে প্রথম পাঁচ মাসে হিরোশিমা শহরে মারা গেছে দেড় লক্ষ মানুষ। নাগাসাকিতে একই কারণে মৃত্যুর সংখ্যা আশি হাজার। তেজস্ক্রিয়তায় আক্রান্ত মানুষের সংখ্যা তিন লক্ষের বেশি। যারা বেঁচে আছে তাদের প্রজন্মকে বলা হয় 'হিবাকুশা"।

পরমাণু যখন বিভাজন হয় অথবা পরমাণু সংযোজন প্রক্রিয়ার সময় কিছু ভর শক্তিতে রূপান্তরিত হয়। এই প্রচন্ড শক্তি সৃজনশীল অথবা ধ্বংসের কাজে প্রয়োগ করা যায়।

কোন একজন বিজ্ঞানীর প্রচেষ্টায় পরমাণু বোমা উদ্ভাবন হয় নি। বেশ কয়েকজন বিজ্ঞানীর ঘনবদ্ধ আবিষ্কারে পারমাণবিক বোমা নির্মাণ করা হয়েছে। আইনস্টাইনের বৈজ্ঞানিক দর্শন হল তার দিক দর্শন।

প্রোটন ও নিউট্রনের সমষ্টি ব্যতীত পদার্থের কেন্দ্রীনের গঠন করা যায় না। প্রোটনের সংখ্যা হল পারমাণবিক সংখ্যার সমান। ইউরেনিয়ামের কথা ধরলে পারমাণবিক সংখ্যা ৯২ এবং ভর সংখ্যা ২৩৮। সুতরাং কেন্দ্রীনের প্রোটনের সংখ্যা ৯২ এবং নিউট্রনের সংখ্যা ১৪৬। পদার্থের হিলিয়াম কেন্দ্রনে আছে দু'টি প্রোটন তার ভর হল ৪. হিলিয়াম কেন্দ্রনকে বলা হয় আলফা কণিকা। U_{235} এর কণিকার সঙ্গে পরমাণুর সংঘর্ষে U_{238} পরমাণু বিভাজন ঘটে ও অন্য পরমাণুর সৃষ্টি হয়। এই সময় কিছু ভর শক্তিতে রূপান্তরিত হয় যার পরিমাণ সাধারণ কল্পনার বাইরে।

১৯৩১ সালে রাদারফোর্ডের সহকারী ককরফট পরমাণু চূর্ণ করার প্রয়োজনে প্রোটনকে উচ্চশক্তি সম্পন্ন

করার জন্য প্রথম যন্ত্র উদ্ভাবন করেন। দু'জনে মিলে এই যন্ত্রের সাহায্যে প্রোটন রশ্মিগুলিকে শক্তিশালী করে হিলিয়ামকে আঘাত করেন। পরিণতিতে সশব্দে বিস্ফোরণ

যুদ্ধের বিরুদ্ধে এবং শান্তির স্বপক্ষে মানবিকতার স্পন্দন তীব্র আকারে প্রকাশ পেল। দেশ-বিদেশের কৃতী, গুণী, শুভবুদ্ধি সম্পন্ন বিজ্ঞানী, সাহিত্যিক, শিল্পী, কবি, বুদ্ধিজীবী এবং অগনিত মানুষ পরমাণু বোমা নিক্ষেপের বিরুদ্ধে ধিক্কার জানায়। আইনস্টাইন, ওপেনহাইমার, রাসেল, জোলিও কুরি, জে. ডি. বার্নাল, পিকাসো, আদ্রে সালবো, পাবলো নেরুদা, সত্যেন্দ্রনাথ বসু, মেঘনাদ সাহা যুদ্ধের বিরুদ্ধে শান্তির স্বপক্ষে সামিল হন।

হয়ে আলো বেরিয়ে আসে। যা পর্যবেক্ষণ করে বোঝা যায় পরমাণু বিভাজন থেকে বেশ কিছু পরিমাণ শক্তি পাওয়া যাবে।

হিটলার বাহিনীর অত্যাচার, প্রতিহিংসা, জাত্যাভিমান, চুক্তিভঙ্গ, পররাজ্য-গ্রাস মানুষকে অতিষ্ঠ করে তোলে। তার অত্যাচার প্রতিহিংসা সহ্য করতে না পেরে জার্মানী, অস্ট্রেলিয়া, হাঙ্গেরী, ইতালী থেকে বিশিষ্ট উদ্বাস্তু বিজ্ঞানীরা আমেরিকা চলে আসেন। আইস্টাইনের নাম পর্যন্ত হিটলারের হত্যা তালিকায় ছিল। আইনস্টাইন উদ্বিগ্ন হয়ে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট রুজবেল্টকে পারমাণবিক বোমা নির্মাণের পরামর্শ দেন।

আইনস্টাইন গভীর দুঃখে বললেন, "আমি যদি নতুন করে আবার জীবন শুরু করতে পারতাম তাহলে বিজ্ঞানী না হয়ে একজন সূতার মিস্ত্রির জীবন-যাপন করতাম।"

যুদ্ধের বিরুদ্ধে এবং শান্তির স্বপক্ষে মানবিকতার স্পন্দন তীব্র আকারে প্রকাশ পেল। দেশ-বিদেশের কৃতী, গুণী, শুভবুদ্ধি সম্পন্ন বিজ্ঞানী, সাহিত্যিক, শিল্পী, কবি, বুদ্ধিজীবী এবং অগনিত মানুষ পরমাণু বোমা নিক্ষেপের বিরুদ্ধে ধিক্কার জানায়। আইনস্টাইন, ওপেনহাইমার, রাসেল, জোলিও কুরি, জে. ডি. বার্নাল, পিকাসো, আদ্রে সালবো, পাবলো নেরুদা, সত্যেন্দ্রনাথ বসু, মেঘনাদ সাহা যুদ্ধের বিরুদ্ধে শান্তির স্বপক্ষে সামিল হন।

দুঃখের ও ক্ষোভের বিষয় তা সত্ত্বেও পারমাণবিক অস্ত্রের বিস্ফোরণ চলছে। অতি সম্প্রতি ফ্রান্স আটটি পারমাণবিক বিস্ফোরণের সিদ্ধান্ত করেছে। ৫ই সেপ্টেম্বর ও ১ লা অক্টোবর ১৯৯৫ সালে ছটি পারমাণবিক বোমা ফাটিয়েছে। প্রথমটির তুলনায় দ্বিতীয়টির শক্তি পাঁচগুণ বেশী শক্তিশালী। ফ্রান্স প্রকাশ্যে ঘোষণা করেছে — নয়া সামরিক প্রযুক্তির কার্যকারিতা পরখ করার প্রয়োজনে পারমাণবিক বিস্ফোরণ আবশ্যক। পারমাণবিক অস্ত্র নিরস্ত্রিকরণ সম্পর্কে বৃহৎশক্তি বর্গ যা বলছে তার আসল উদ্দেশ্য নিরস্ত্রিরকরণ নয়। আসল উদ্দেশ্য পারমাণবিক অস্ত্রের একচ্ছত্র ক্ষমতা অক্ষুন্ন রাখা। যা বিশ্বশান্তির পক্ষে মহাবিপদ।

পারমাণবিক বোমা পরার পর সুবিশাল এলাকা জুড়ে দীর্ঘকাল অর্থাৎ ৩০-৫০ বছর ধরে তেজস্ক্রিয় দূষণের সম্ভাবনা প্রবল। বিস্ফোরণের প্রতিক্রিয়ায় কলকারখানা ধ্বংস হবে, ভূমির গুণমান নষ্ট হবে, বন-জঙ্গল প্রচণ্ড অগ্নিকাণ্ডে ধ্বংস হবে।

প্রিয় তরুণ বন্ধুরা তোমরা নিশ্চয়ই বিশ্বাস কর এমন একটা ভবিষ্যত কোন মানুষের কাম্য হতে পারে না। তোমরা সকলকে নিয়ে যদি প্রতিবাদে সামিল হতে পারো, সুখের ছবিটি নিশ্চয়ই তৈরী হবে একদিন।

মেঘ ও বৃষ্টি

দিলীপকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

শরৎকালের ঝকঝকে নীল আকাশে মনের আনন্দে ঘুরে-বেড়ানো সাদা মেঘের ভেলা দেখেই বোধ হয় কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন,

'নীল আকাশে কে ভাসালো সাদা মেঘের ভেলা।'

শুধু কবি নয়, নীল আকাশে পেঁজা তুলোর মতো মেঘ দেখলে আমাদের সকলের মনই ভরে ওঠে হাজার খুশির আমেজে। কিন্তু পেঁজা তুলোর বদলে মেঘের চেহারা যদি হয় ঘন কালো গম্বুজের মতো, তবে আসন্ন বজ্রবিদ্যুৎ-ঝড় ও বৃষ্টির কথা ভেবে আমাদের মন শঙ্কিত হয়ে ওঠে। সত্যি বলতে কি, সারা দিনের আবহাওয়া কেমন যাবে, বৃষ্টি বা ঝড় হবে কিনা, তার অনেকটা আভাস আমরা পেয়ে যাই মেঘের চেহারা ও আয়তন থেকেই।

মেঘ-বৃষ্টি-ঝড় (বা বাতাস) যেন আলেকজাণ্ডার ডুমার উপন্যাসের থ্রি মাস্কেটিয়ার্স, যারা দাপটের সঙ্গে নিয়ন্ত্রণ করছে আবহাওয়া জগৎকে।

ভৌগোলিকের ভাষায়, মেঘ আসলে আকাশের বুকে ভাসমান পুঞ্জীভূত জলকণা বা তুষারকণা। জলকণা বা বরফের এইসব কেলাসগুলির (Crystal) আয়তন (বা ব্যাস) নেহাতই ক্ষুদে। মোটামুটিভাবে এদের ব্যাস ০.০২ থেকে ০.০৬ মিলিমিটারের মধ্যেই থাকে।

ভূপৃষ্ঠের সাগর, নদী ও জলাশয় থেকে প্রতিদিন যে জলীয় বাষ্পের সৃষ্টি হচ্ছে, তা বায়ুমণ্ডলের ঘুরে বেড়ানো খুবই সূক্ষ্ম হয়ে শিশিরাঙ্কে (Dew Point) পৌঁছলে সৃষ্টি হয় জলকণা। এখানে একটা প্রশ্ন, শিশিরাঙ্ক কাকে বলে ? শিশিরাঙ্ক হল এমন এক তাপমাত্রা, যে তাপমাত্রায় বাতাসের জলীয় বাষ্প ঘনীভূত হয়ে জন্ম দেয় জলকণার।

সারা বছর ধরে আকাশে মেঘের আনাগোনা নজর করলে দেখা যাবে, ঋতু অনুযায়ী মেঘের চেহারা বদলাচ্ছে। শুধু ঋতু অনুযায়ী কেন, একটা গোটা দিনের মধ্যেই আবহাওয়া অনুযায়ী, মেঘের চেহারা হাবভাব পালটে যাচ্ছে। ঝড়-বৃষ্টির আগে মেঘের যে চেহারা থাকে, বৃষ্টির পর তা একেবারে অন্যরকম হয়ে যায়। মেঘ যেন এক বহুরূপী।

লিউক হাওয়ার্ড ছিলেন লণ্ডনের এক ওষুধের কারবারী। তিনি প্রায় দুশো বছর আগে ১৮০৩ সালে মেঘের শ্রেণীবিভাগ করেন। বিজ্ঞানসম্মত নামও দেন। যেমন সিরাস (Cirrus, পালক বা আঁশের মতো), কিউমুলাস (Cumulus, পেঁজা তুলোর স্তূপের মতো), স্ট্র্যাটাস (Stratus, স্তরে স্তরে সাজানো), নিম্বাস (Nimbus, বর্ষণ মেঘ) ইত্যাদি।

মেঘ যেন বৃষ্টির মা। মেঘ থেকেই তো বৃষ্টির সৃষ্টি। মেঘ থেকে কেমন করে বৃষ্টি হয় ? উত্তরে বলি, আকাশে মেঘের মধ্যে ভেসে-থাকা জলকণাগুলি মাঝে মাঝে পরস্পরের সঙ্গে মিলেমিশে এতই বড় জলকণায় পরিণত হয় যে তা আর ভেসে থাকতে পারে না। তখন তা পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ শক্তির টানে ভূপৃষ্ঠে ঝরে পড়ে বৃষ্টির আকারে। সাধারণভাবে বৃষ্টির ফোঁটার ব্যাস ০.৫ মিলিমিটার থেকে ৫ মিলিমিটারের মধ্যেই থাকে। কখনো কখনো অবশ্য বৃষ্টির ফোঁটা এর চেয়ে বড় বা ছোট হতে পারে। তবে তা নেহাতই ব্যতিক্রম।

শুধু মেঘ থকে নয়, অনেক সময় বরফের কেলাস বা তুষারের পাত গলেও বৃষ্টিপাত হয়ে ঝরে পড়ে।

সব বৃষ্টিপাতের চেহারা একরকম নয়, আর তা একই রকম প্রক্রিয়ায় ঘটেও না। যেমন, মাঝারি ও উঁচু অক্ষাংশের

এলাকায় বৃষ্টির নাম শীতল বৃষ্টি (Cold rain), আরা নিচু অক্ষাংশের বৃষ্টির নাম উষ্ণ বৃষ্টি (Warm rain)। এই দুই বৃষ্টির প্রকৃতি অনেকটাই আলাদা আর তা ঘটেও আলাদা প্রক্রিয়ায়।

শীতল বৃষ্টিপাত সম্পর্কে মতামত দিয়েছেন বিখ্যাত আবহবিজ্ঞানী বার্জেরন ফিণ্ডেইসেন (Bergeron-Findeisen)। ওঁর মতে, মাঝারি ও উঁচু অক্ষাংশের ঠাণ্ডা বৃষ্টিপাত হয় যে মেঘ থেকে, তার গভীরতা সাধারণভাবে ১৫০০ মিটারের বেশি। এই রকম মেঘের তাপমাত্রা থাকে 0^{0} সে. থেকে -৮৯^{0} সে.-এর মধ্যে। এই মেঘে প্রচুর জলকণা ও বরফের কেলাস থাকে। তবে বরফের কেলাস থাকে মেঘের ওপরদিকে আর নিচের দিকে জলকণা। তাপমাত্রা হিমাঙ্কের নিচে থাকলে পরিপৃক্ত (Saturated) বাষ্পের আয়তন বেড়ে যাবে। আয়তনে বেড়ে গেলে বরফের কেলাসগুলি আর ভেসে থাকতে পারে না, মাটির দিকে পড়তে থাকে। পড়বার সময় প্রাকৃতিক নিয়মেই বরফের বড় কেলাসগুলি ছোট কেলাসগুলিকে টানতে থাকে। ফলে এদের আয়তন আরো বেড়ে যায় আর উষ্ণতা হিমাঙ্কের ওপরে পৌছলে বরফের কেলাসগুলি জলকণায় পরিণত হয়। পরে বড় জলকণাগুলি নিচের দিকে পড়বার সময় ছোট ছোট জলকণাগুলিকে টেনে নেয় ও তা শীতল বৃষ্টি হয়ে নেমে আসে।

এবার বলি উষ্ণ বৃষ্টিপাতের উৎপত্তির কথা। ক্রান্তীয় (কর্কটক্রান্তি ও মকরক্রান্তি) অঞ্চলে ভূপৃষ্ঠের জলভাগ থেকে সূর্যতাপের প্রভাবে প্রচুর জলীয় বাষ্প অবিরাম মিশে যাচ্ছে

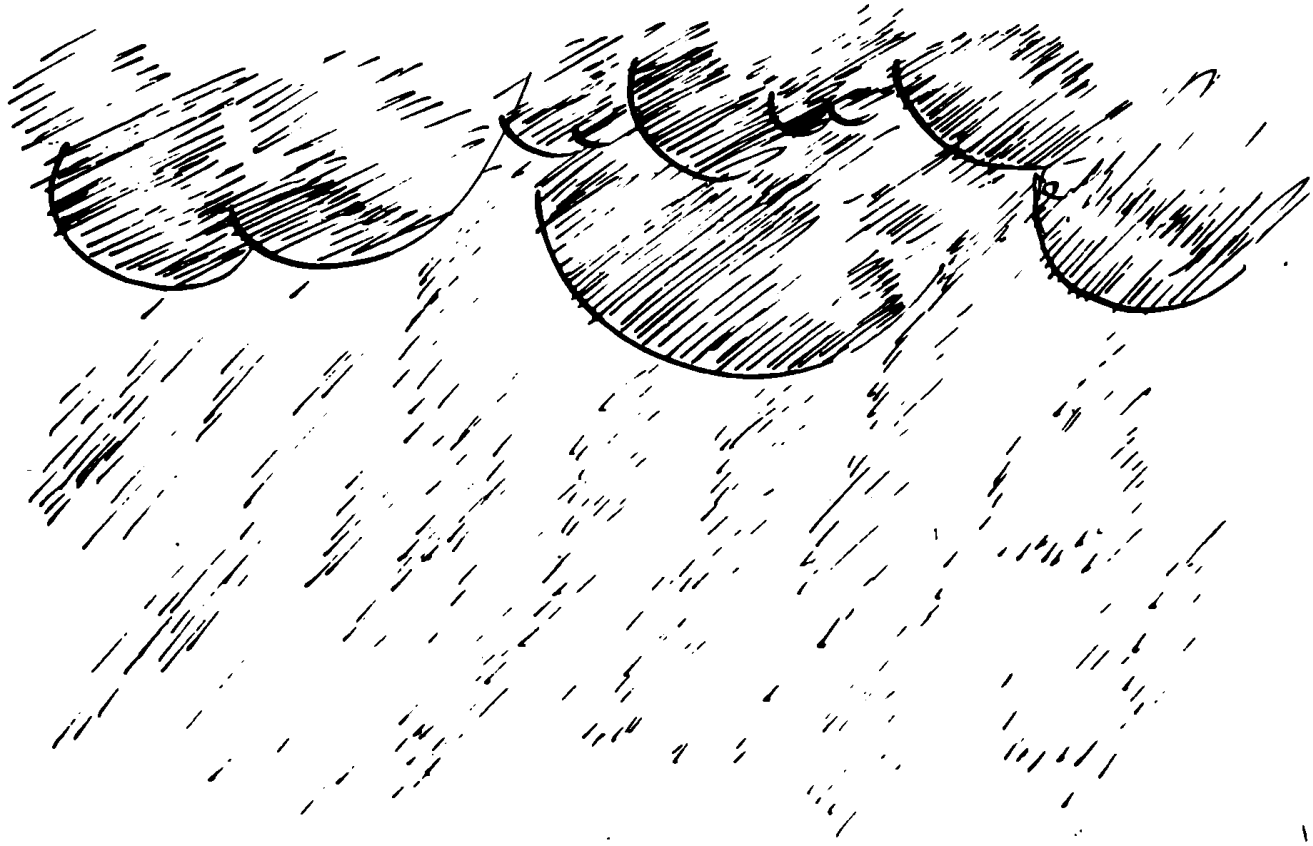

বায়ুমণ্ডলে। জলীয় বাষ্প ধীরে ধীরে ঘনীভূত হয়ে বায়ুতে ভেসে-থাকা লবণের কণা ও ধূলিকণাকে আঁকড়ে ধরে জলকণায় পরিণত হয়। এসব ধূলিকণার আয়তন খুবই ছোট। খালি চোখে মোটেই দেখা যায় না। অণুবীক্ষণ যন্ত্র লাগে। এদের ব্যাস ০.০০০০১ থেকে ০.০০০১ মিলিমিটার। আয়তনে বাড়তে বাড়তে এইসব জলকণাগুলির ব্যাস যখন ১ মিলিমিটার ছাড়িয়ে যায়, তখন তা আর বাতাসে ভেসে থাকতে পারে না। বৃষ্টির ফোঁটা হয়ে ঝরে পড়ে।

১৯৪৬ সালে এক মার্কিন বিজ্ঞানী প্রথম কৃত্রিম উপায়ে বৃষ্টিপাত ঘটান। তবে পঞ্চাশের দশকে কলকাতায় এরকম কৃত্রিম বৃষ্টিপাত ঘটিয়ে খুবই মুশকিলে পড়েছিলেন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের এক অধ্যাপক। সেই কৃত্রিম বৃষ্টিপাতে সামনের উদ্বাস্তু শিবিরগুলো ভেসে যাবার উপক্রম হলে সেই অধ্যাপক হামলার মুখোমুখি হন।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেও এই কৃত্রিম বৃষ্টিপাত নিয়ে বহুবার আইনগত ঝামেলা হয়েছে। যে অঞ্চলে কৃত্রিম বৃষ্টিপাত ঘটল, তার পাশের জমির মালিকরা মামলা রুজু করল এই অজুহাতে, তাদের প্রাপ্য বৃষ্টি অন্যরা চুরি করে নিয়ে যাচ্ছে।

এই ধরনের বৃষ্টি সৃষ্টির কারণকে বিজ্ঞানীরা বলেন 'বিন্দু সংযুক্তি তত্ত্ব' (Coalescence Theory of Rainfall)। আমাদের দেশে বর্ষাকালে যে গাঢ় কালো রঙের স্তূপ ক্ষণে ক্ষণে বৃষ্টি হয়, তার ব্যাখ্যা মেলে এই তত্ত্ব থেকেই। সব ধরনের বৃষ্টির কথা আলোচনা করার জায়গা নেই। এখানে শুধু বলছি কৃত্রিম ও অম্ল-বৃষ্টির কথা।

কৃত্রিম বৃষ্টি

যেখানে বৃষ্টি হয় না, সেখানকার আকাশে মেঘ সৃষ্টি করে বৃষ্টিপাত ঘটানো সম্ভব নয়। তবে আকাশে কিছুটা মেঘ থাকলে, সেই মেঘ থেকে কৃত্রিম উপায়ে বৃষ্টিপাত ঘটানো সম্ভব । আমাদের দেশেও এভাবে কৃত্রিম বৃষ্টিপাত ঘটানো হয়েছে।

ধরা যাক বাতাসে প্রচুর আর্দ্রতা ও আকাশে মেঘ আছে। কিন্তু মেঘের অতি ছোট জলকণাগুলো জুড়ে গিয়ে বড় জলকণা তৈরি করতে পারছে না বলে বৃষ্টি হচ্ছে না। কারণ বড় জলকণা তৈরি না হলে তা বৃষ্টির ফোঁটার আকারে ঝরে পড়তে পারবে না। এমন অবস্থায় কৃত্রিম বৃষ্টিপাত ঘটানোর জন্য এরোপ্লেন থেকে ঐ মেঘের ওপর শুকনো বরফ (Dry ice) (কঠিন কার্বন ডাই-অক্সাইড) কিংবা সাধারণ লবণ ছড়িয়ে দেওয়া হয়। এর ফলে ওই কঠিন কার্বন ডাই-অক্সাইড বা লবণের কণাগুলিকে জড়িয়ে ধরে জলকণাগুলি খুব তাড়াতাড়ি বড় বড় ফোঁটায় পরিণত হয়ে বৃষ্টিপাত ঘটায়। এছাড়া সিলভার আয়োডাইড লবণ ঐ একই কাজ আরো তাড়াতাড়ি ও ভালোভাবে করতে পারে। দেখা গেছে, বিমান থেকে ঐ মেঘের ওপর সিলভার আয়োডাইড-এর ধোঁয়া ছড়ানোর পনেরো মিনিটের মধ্যে বৃষ্টি শুরু হয়েছে। ১৯৪৬ সালে এক মার্কিন বিজ্ঞানী প্রথম কৃত্রিম উপায়ে বৃষ্টিপাত ঘটান। তবে পঞ্চাশের দশকে কলকাতায় এরকম কৃত্রিম বৃষ্টিপাত ঘটিয়ে খুবই মুশকিলে পড়েছিলেন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের এক অধ্যাপক। সেই কৃত্রিম বৃষ্টিপাতে সামনের উদ্বাস্তু শিবিরগুলো ভেসে যাবার উপক্রম হলে সেই অধ্যাপক হামলার মুখোমুখি হন।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেও এই কৃত্রিম বৃষ্টিপাত নিয়ে বহুবার আইনগত ঝামেলা হয়েছে। যে অঞ্চলে কৃত্রিম বৃষ্টিপাত ঘটল, তার পাশের জমির মালিকরা মামলা রুজু করল এই অজুহাতে, তাদের প্রাপ্য বৃষ্টি অন্যরা চুরি করে নিয়ে যাচ্ছে।

অম্ল-বৃষ্টি

পরিবেশ দূষণের ফলে আজকাল প্রায়ই অম্ল-বৃষ্টির কথা শোনা যায়। কলকারখানার চিমনির ধোঁয়া, মোটর, বাস ও লরির ধোঁয়া, উনোনের ধোঁয়া ইত্যাদির মধ্যে যে সালফার ডাই-অক্সাইড ও নাইট্রোজেন অক্সাইড থাকে তা বাতাসে ভাসতে ভাসতে মেঘের মধ্যে ঢুকে গিয়ে অম্ল-বৃষ্টি হয়ে নিচে নেমে আসে। অম্ল-বৃষ্টি আজ পৃথিবীর সব দেশের কাছেই এক বিরাট সমস্যা। অম্ল-বৃষ্টির ফলে বিষিয়ে উঠছে নদনদী, খালবিল, হ্রদ ও ঝিলের জল। নষ্ট হচ্ছে চাষের জমি, জলজ প্রাণী, সবুজ অ্যালগি ও শ্যাওলা। মাছের ডিম ফুটছে না। যদিও বা ফুটছে, বিকলাঙ্গ হচ্ছে প্রজন্ম। জানা গেছে, আমাদের দেশে আগ্রার কাছে মথুরার তেল শোধনাগার থেকে বেরিয়ে আসা ধোঁয়ার প্রভাবে যে অম্ল-বৃষ্টি হচ্ছে, তাতে তাজমহলের শরীরে নাকি ছোপ ছোপ দাগ পড়েছে।

প্যালিনড্রোম নিয়ে দু-চার কথা

অনীশ দেব

'প্যালিনড্রোম' হল এমন কোনও শব্দ, বাক্য বা প্যারা যা বাঁ দিক থেকে ডান দিকে পড়লে, বা ডান দিক থেকে বাঁ দিকে পড়লে কোনও তফাৎ খুঁজে পাওয়া যায় না। যদি কোন সংখ্যার মধ্যে এই ধর্ম খুঁজে পাওয়া যায়, তাহলে তাকে বলে 'প্যালিনড্রোমিক নাম্বার' বা প্যালিনড্রোম সংখ্যা।

শব্দ বা সংখ্যা নিয়ে খেলা করতে যাঁরা ভালোবাসেন, তাঁরা বহুদিন ধরেই প্যালিনড্রোমের চর্চা করছেন। তাছাড়া শুধু শব্দ বা সংখ্যা কেন, কোনও ছবি, নকশা কিংবা সুরের স্বরলিপিও প্যালিনড্রোম হতে পারে। তাদের শর্ত শুধু একটাই ঃ সোজা দিকেও যা, উলটো দিকেও তাই। যেমন, পশু-পাখি বা মানুষের শরীরের গঠনও প্যালিনড্রোমিক। কারণ, উল্লম্ব তল দিয়ে পশু-পাখি বা মানুষকে সমান দু-ভাগ করলে প্রতিসাম্যের ব্যাপারটা নজরে পড়ে।

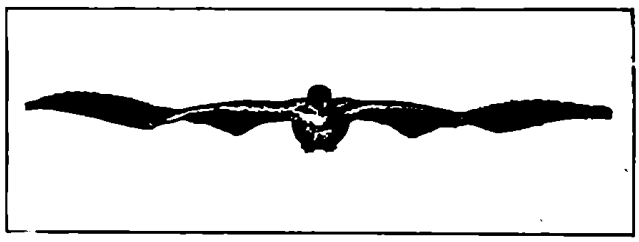

উড়ন্ত সিগাল ঃ দৃষ্টিনন্দন প্যালিনড্রোম।

1930 সালে প্রকাশিত গবেষণাপত্রে প্যালিনড্রোম সংক্রান্ত একটি গাণিতিক প্রকল্পের হদিস পাওয়া যায়, যার কোনও প্রমাণ এখনও পর্যন্ত পাওয়া যায়নি।

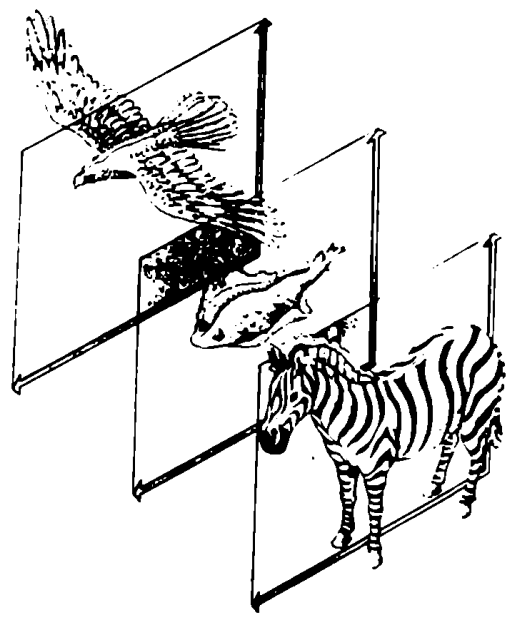

পশু-পাখি-মাছ, এবং মানুষ — প্যালিনড্রোমের হাত থেকে কারও রেহাই নেই।

প্রথমে যে কোনও একটি ধনাত্বক পূর্ণসংখ্যা নেওয়া হল। সেটিকে উলটে লিখে মূল সংখ্যাটির সঙ্গে যোগ দেওয়া হল। এইবার যোগফলটিকে উলটে লিখে আবার যোগ দেওয়া হল প্রথম যোগফলের সঙ্গে। প্রকল্পটি হল ঃ এইভাবে যোগ দিতে-দিতে একসময় যোগফল হিসেবে একটি প্যালিনড্রোম-সংখ্যা পাওয়া যাবেই। যেমন, 78 সংখ্যাটি নিয়ে শুরু করলে চারবার যোগ দেওয়ার পর প্যালিনড্রোম সংখ্যা পাওয়া যায় ঃ

$$
\begin{array}{r}
78 \\
+\ 87 \\
\hline
165 \\
+\ 561 \\
\hline
726 \\
+\ 627 \\
\hline
1353 \\
+\ 3531 \\
\hline
4884
\end{array}
$$

কোন-কোনও সংখ্যার ক্ষেত্রে মাত্র কয়েকবার যোগ দিলেই প্যালিনড্রোম-সংখ্যা পাওয়া যায়। যেমন, 75 দিয়ে শুরু করলে মাত্র দুবার যোগ দিলেই যোগফল হয় 363 ; আবার 89 নিয়ে শুরু করলে 24 বার যোগ করার পর উত্তর পাওয়া যায় 8813200023188। বলাবাহুল্য, এই দুটি উত্তরই প্যালিনড্রোম।

যদিও এই প্রকল্পটির নির্ভুল প্রমাণ এখনও পাওয়া যায়নি, তবুও অনেক গণিতজ্ঞ মনে করেন, এটি সব ক্ষেত্রেই সত্যি। আবার অনেকের ধারণা, প্রকল্পটি সব সংখ্যার জন্য সত্যি নয়। যেমন, ক্যালিফোর্নিয়ার গণিতজ্ঞ চার্লস ডব্রিউ, ট্রিগ পরীক্ষা করে দেখেছেন যে, 10000-এর চেয়ে 249টি সংখ্যা নিয়ে চেষ্টা করলে 100 বার যোগের ধাপ পেরিয়ে গেলেও প্যালিনড্রোম-সংখ্যার দেখা মেলে না।

আমরা জানি যে, $11 \times 11 = 121$, গুণফল প্যালিনড্রোম-সংখ্যা।

আবার, $111 \times 111 = 12321$, অর্থাৎ, আবার প্যালিনড্রোম।

এইভাবে যদি আমরা এগোতে থাকি, তাহলে সাধারণ সূত্রটি হল :

$$\underbrace{111\ldots111}_{m} \times \underbrace{111\ldots111}_{m} = \underbrace{123\ldots m\ldots321}_{2m-1}$$

অর্থাৎ, m সংখ্যক 1-কে পাশাপাশি লিখে যে সংখ্যা পাওয়া যায়, তাকে বর্গ করলে উত্তর হবে $(2m-1)$ অঙ্কের প্যালিনড্রোম-সংখ্যা।

প্যালিনড্রোম-সংখ্যা নিয়ে এরকম বহু বিচিত্র সম্পর্ক খুঁজে পাওয়া গেছে।

এবারে নজর দেওয়া যাক, প্যালিনড্রোম শব্দ, বাক্য বা কবিতার দিকে। ইংরেজি ভাষায় সবচেয়ে বড় যে সব প্যালিনড্রোম শব্দের সন্ধান পাওয়া যায় সেগুলো সাতটি বর্ণ দিয়ে তৈরি। যেমন, reviver, repaper, deified এবং rotator। হাইফেন বর্জিত সবচেয়ে দীর্ঘ প্যালিনড্রোম শব্দের হদিস পাওয়া যায় ফিনদেশের ভাষায়। শব্দটি হল : saippuakauppias। এর অর্থ হল 'সাবান বিক্রেতা'।

1967 সালে ইংল্যাণ্ডের 'নিউ স্টেটসম্যান' পত্রিকা একটি প্যালিনড্রোম প্রতিযোগিতার আয়োজন করে। সেই প্রতিযোগিতায় প্রথম হয়েছিলেন জেমস মিচি। তাঁর প্যালিনড্রোমটি শুধু দীর্ঘ তা নয়, একই সঙ্গে অত্যন্ত স্বাভাবিক ও বাস্তব। সেটি হল 'Doc note, I dissent. A fast never prevents a fatness. I diet on cod.'

এরকমই একটি বিখ্যাত প্যালিনড্রোম তৈরি করেছেন ব্রিটেনের লাই মার্সার। সেটি হল : 'A man, a plan, a canal — Panama !'

বহু প্যালিনড্রোমের উদ্ভাবক মার্সার খুশিমতো লম্বা প্যালিনড্রোম লেখার একটি অভিনব পদ্ধতি শিখিয়ে দিয়েছেন। এই দীর্ঘ প্যালিনড্রোমটির গঠন হবে এইরকম : ' "————", sides reversed, is "————". এই বাক্যটিতে প্রথম শূন্যস্থানে যে কোনও মাপের বর্ণমালা বসানো যেতে পারে, তবে দ্বিতীয় শূন্যস্থানে সেই বর্ণগুলোকেই উলটে লিখতে হবে। যেমন, ' "Cat", sides reversed, is "tac".'

লুই ক্যারলের 'অ্যালিস ইন ওয়াণ্ডারল্যাণ্ড' বইয়ে অ্যালিসের একটি সংলাপ ছিল প্যালিনড্রোম : 'Was it a cat I saw ?'

আর একটি বিখ্যাত প্যালিনড্রোম বাক্য রচিত হয়েছে মার্কিন প্রেসিডেন্ট নিক্সনকে নিয়ে। সেটি হল, 'No 'X' in Mr. R. M. Nixon.'

এই ধরনের আরও কয়েকটি প্যালিনড্রোম বাক্যের উদাহরণ নীচে দেওয়া হল :

Evil is a name of a foeman, as I live.

Madam, in Eden I'm — Adam.

Lepers repel.

No lemons, no melon.

No, it is open on one position.

Sir, I demand, I am a maid named Iris.

Rats live on no evil star.

এ - পর্যন্ত যে সব প্যালিনড্রোমের উদাহরণ দেওয়া হয়েছে তাতে এক একটি বর্ণ হচ্ছে এক-একটি 'ইউনিট'। অনেক ক্ষেত্রে এক-একটি শব্দকে 'ইউনিট' ধরেও কিন্তু প্যালিনড্রোম-বাক্য লেখা হয়েছে। ব্রিটিশ প্যালিনড্রোমিস্ট জে. এ. লিন্ডন এরকম বহু চমৎকার বাক্য লিখেছেন। তা থেকেই নির্বাচিত কয়েকটি বাক্য নীচে দেওয়া হল ঃ

King, are you glad you are King?

You can cage a swallow, can't you, but you can't swallow a cage, can you ?

So patient a doctor to doctor a patient so.

ভাষা সংক্রান্ত প্যালিনড্রোমের যেসব উদাহরণ এ পর্যন্ত দিয়েছি, তার সবই প্রায় ইংরেজি। বাংলায় কি কোনও প্যালিনড্রোম -শব্দ হয় না ? নিশ্চয়ই হয়। তবে ব্যঞ্জনবর্ণের সঙ্গে স্বরবর্ণ যুক্ত থাকার জন্য বাংলায় প্যালিড্রোম-শব্দ তৈরি করার কাজটা বেশ কঠিন হয়ে পড়ে। তার ওপর রয়েছে যুক্তাক্ষরের ঝামেলা।

বাংলায় কয়েকটি প্যালিনড্রোম নাম হল ঃ রমাকান্ত কামার, সুবল বসু, রায়মণি ময়রা এবং সদানন্দ দাস।

সবশেষে আমার তৈরি অর্থময় একটি বাংলা প্যালিনড্রোম-বাক্যের উদাহরণ দিই ঃ 'নবো, রমার মাসী কি সীমার মার বোন ?'

তোমরাও চেষ্টা করে দেখতে পারো, এরকম প্যালিনড্রোম-বাক্য বা কবিতা লিখতে পারো কিনা, তবে সন্দেহ নেই, ইংরেজির তুলনায় বাংলায় এই কাজটি একশো কেন, অন্তত হাজারগুণ কঠিন।

কলিকাতা পুস্তক মেলায় '৯৭ এবারো
পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান মঞ্চ বইয়ের
ডালি সাজিয়ে বসবে।
তোমাদের সাদর
আমন্ত্রণ রইল।

জিন খানা

ত্রিদিবকুমার চট্টোপাধ্যায়

ওয়েলকাম স্যার ! বলুন, কিরকম চান।

— না, মানে আমরা একটু দেখতে এসেছি ব্যাপারটা, আজকের কাগজে খবরটা পড়ে—

— ও সিওর। দেখুন না, যতখুশি দেখুন। এদিকে আসুন স্যার, কমপ্লিট ক্যাটালগ দেখাচ্ছি। ভিতরে লাইভ ডেমোনেস্ট্রেশনও হচ্ছে।

— আপনি অত ব্যস্ত হবেন না। এখনই কিছু করার প্ল্যান নেই আমাদের। জাস্ট দেখবো।

সেল্‌স-এর স্মার্ট মেয়েটি একটু দমে গেল ঠিকই, কিন্তু শমিতবাবুদের পিছন ছাড়লো না। ওর অভিজ্ঞ চোখে ধরা পড়েছে জয়তী সান্যালের উৎসাহী আর অবাক দৃষ্টি।

এয়ারকন্ডিশনড্ সুসজ্জিত হলঘর। দেয়ালজুড়ে ছবিতে ছবিতে বোঝানো হয়েছে ব্যাপারটা। চার্টগুলোর ঠিক নিচেই টানা ডেস্কের ওপর পরপর নানারকম ছোট ছোট মডেল, কাঁচ বন্দী।

আজ সকালের কাগজেই বেশ ফলাও করে বেরিয়েছিল খবরটা। বিদেশে ব্যাপারটা কয়েকমাস আগে শুরু হলেও এদেশে এই প্রথম।

জিন ব্যাঙ্ক। বাংলায় নাম দিয়েছে 'জিন খানা'।

মাল্টিন্যাশনাল একটা কোম্পানি কলকাতায় চালু করছে এই জিনব্যাঙ্ক।

যে কোনও প্রাণীর মতই মানুষের শরীরের প্রতিটি কোষে থাকে ক্রোমোজোম, তৈরি ডি. এন. এ বা ডি অক্সিরাইবো নিউক্লিয়িক অ্যাসিড দিয়ে। দেখতে ফিতের মতো জড়িয়ে থাকা এই ডি. এন. এ.-র বিভিন্ন পয়েন্টে থাকে 'জিন'। এই অসংখ্য 'জিন'রাই নিয়ন্ত্রণ করে মানুষের স্বভাবচরিত্র বুদ্ধি-মেধা সমস্তকিছু। এমনকি শারীরিক গঠনও। বাবা-মায়ের কাছ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে জিনরা চলে আসে ছেলেমেয়েদের মধ্যে। কেউ দেখতে হয়তো বাবার মতো, স্বভাবে মা। আবার অন্যজন দুজনেরই খানিকটা বৈশিষ্ট্য পায়।

অনেক সময় দেখা যায়, ছেলে বা মেয়ে কেউই বাবা-মায়ের মতো হলো না। না স্বভাবে, না দেখতে। তখন খোঁজ নিয়ে দেখা যাবে, ঐসব বৈশিষ্ট্য সে পেয়েছে দু-তিন পুরুষ আগে থেকে।

কেন এমন হয়, এটা বেশ জটিল অঙ্ক। সেসবের মধ্যে না গিয়ে কোম্পানিটি জানিয়েছে, প্রতিটি ছেলে বা মেয়ে যাতে 'সুপার ম্যান বা লেডি' তৈরি হয়, তারই এক অভিনব এবং দুর্দান্ত 'প্যাকেজ' নিয়ে তারা এসেছে।

সকালে খবরটা পড়েই জয়তী দেবী, যাকে বলে লাফিয়ে উঠেছিলেন। আর তাঁরই টানাটানিতে এই ছুটির দিনের আলস্যি ছেড়ে আসতে হয়েছে শমিতবাবুকে।

ওদের ছমাসের শিশুপুত্র অমিতকে রেখে এসেছেন আয়ার কাছে।

সেল্‌স-এর মেয়েটি ওঁদের পিছন পিছন আসছে আর অনর্গল বকবক করে চলেছে।

— এই যে স্যার, এটা হল পারফর্মার প্যাকেজ। মানে ধরুন আপনাদের বেবিকে ভবিষ্যতে উত্তমকুমার বা উদয়শঙ্কর যদি করতে চান, বা ধরুন সুচিত্রা সেন কি সংযুক্তা পানিগ্রাহী, তার জিন প্যাকেজ।

এদিকেরটা ডাক্তার। এটা ইঞ্জিনীয়ার। কবি-সাহিত্যিক-শিল্পী-পলিটিসিয়ান-বিজনেসম্যান সবরকম রয়েছে। যা চান, তাই হবে।

ওঁরা ঘুরতে ঘুরতে হলের শেষপ্রান্তে চলে এলেন। বেশ লোকজন হয়েছে, এদের সেল্‌স গাইড প্রচুর। প্রায় প্রত্যেক দলের পিছনেই একজন লেগে আছে।

আর হবে নাই বা কেন ? চার্টে যেসব প্যাকেজ বলা আছে, সবচেয়ে কমটার জন্যে খরচ পঞ্চাশ হাজার টাকা। সাতদিনের ট্রিটমেন্ট কোর্স।

— স্যার, এদিকে আসুন। ইনি আমাদের একজন ডিরেক্টর। একটু কথা বলে যান। উনি আপনাকে সব —

— কি দরকার ? আজ তো আমরা — পরে একদিন বরং —

কথা বলতে দোষ কি ! — চাপা গলায় জয়তী ঝাঁঝিয়ে ওঠেন ঃ তোমায় নিয়ে পার গেল না। কথা বললে তো টাকা লাগে না।

অগত্যা ! মেয়েটির পিছন পিছন ওঁরা দুজন কাঁচের ছোট্ট চেম্বারে ঢুকে পড়লেন।

গুড্ ইভনিং। — টেবিলের ওপাশ থেকে সুদর্শন ডিরেক্টর হাত বাড়িয়ে দিলেন ঃ বসুন, প্লীজ। বলুন, আপনাদের জন্যে কি করতে পারি।

শমিতবাবু কিছু বলার আগেই জয়তী দেবী বলে উঠলেন, — আমরা আমাদের বেবিকে জিন ট্রিটমেন্ট করাতে চাই। সে ব্যাপারে একটু ডিটেল্‌সে যদি বলেন !

ও সিওর। — ডিরেক্টর বললেন ঃ ফার্স্ট ফ্যাক্টর হল এজ। আপ টু একবছর বয়স অব্দি বেবিকে এই ট্রিটমেন্ট করাতে পারেন। দুনম্বর হল পেসেন্স। ট্রিটমেন্ট করানোর সাথে সাথেই এর এফেক্ট পাবেন না। সময় লাগবে। ধৈর্য ধরতে হবে। আপনার ছেলেমেয়ে যত বড় হবে, আস্তে আস্তে এই ট্রিটমেন্টের ফল দেখতে পাবেন।

একটা কথা। — শমিত বললেন ঃ আপনাদের এই ম্যাডাম আমাদের যেসব প্যাকেজের কথা বললেন, সবই এক একধরনের স্পেশালাইজড্ ম্যান বা উওম্যান হবার প্যাকেজ। মানে আমি বলতে চাইছি, সব মিলিয়ে একজন সম্পূর্ণ মানুষ হবার কোন প্যাকেজ নেই আপনাদের ?

— ঠিক বুঝলাম না আপনার কথা। সম্পূর্ণ মানুষ বলতে ঠিক কি বোঝাতে চাইছেন ?

— মানে ধরুন স্পেশালাইজেশন থাকে থাকুক, সুপার ম্যান বা উওম্যান হবে মানবিক সমস্ত গুণসম্পন্ন একজন মানুষ। দয়ামায়া স্নেহমমতা ভালবাসা, পরিশ্রম একাগ্রতা সব মিলিয়ে সে হয়ে উঠবে সবার মধ্যে একজন আদর্শ মানুষ।

— সরি টু সে, আপনি যেসব গুণগুলির কথা বললেন, এগুলো এই টুয়েন্টি ফার্স্ট সেঞ্চুরিতে টোটালি অবসলিডেটেড। না — না, ওসব গুণ বরং আমরা ছেঁটে বাদ দিয়ে দিচ্ছি। অকারণ ব্রেনে লোড্ রেখে কোন লাভ নেই।

— তার মানে ? আপনারা কি রোবট মানে ম্যান – কম্পিউটার তৈরি করবেন ?

— রাইট, অ্যাবসলিউটলি রাইট। আজকের দিনে ছেলেমেয়েকে নিজের পায়ে দাঁড়াতে হলে ওরকমই তো হতে হবে। কি বলেন ম্যাডাম ?

জয়তী হাসিমুখে ঘাড় না নাড়েন। শমিত সেদিকে একবার তাকিয়ে বলেন, — তার মানে আপনি বলতে চান, আমাদের ফিউচার জেনারেশন ওরকম তৈরি হবে ? আপনারাই সেটা করবেন ?

— সিওর। আপনার ঐসব বাতিল ভ্যালুজ ধুয়ে কি —

হঠাৎ বাইরে থেকে এক ভয়ংকর চিৎকার ভেসে এল। ডিরেক্টরের কথা মাঝ পথে থেমে গেল।

অস্বাভাবিক খসখসে গলায় কে চিৎকার করছে, — খুন করবো। . . . সবাইকে খতম করবো। জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছারখার করে দেবো। . . .

পাশাপাশি মহিলা কণ্ঠের কান্নাও শোনা যাচ্ছে — এ আমার কি সর্বনাশ হয়ে গেল !

ওগো, তুমি কিছু করো . . .

. . . থাম্ থাম্ বাবা থাম্ . . . এ কি হয়ে গেল !

ডিরেক্টর ও মেয়েটি ততক্ষণে একলাফে স্যুইং ডোর খুলে বাইরে চলে গেছে। ওদের পিছন পিছন বেরিয়ে এসেছেন শমিত ও জয়ন্তী সান্যালও।

পরক্ষণেই ওঁরা দুজনেই বিস্ময়ে পাথর। এ দৃশ্য তো দুঃস্বপ্নেও ভাবা যায় না !

মায়ের কোলে মাস আট-দশেকের একটি শিশু। তারই গলা দিয়ে বেরিয়ে আসছে ঐসব বাক্যবাণ বিষাক্ত, — না আমি যাবো না। তোমরা আমার কেউ না ! আমি একা, এক এবং অদ্বিতীয়। আর সবাই নরকের কীট, আমার দাসানুদাস। আমি যা চাইব, তাই হবে . . .।

এ কি করে সম্ভব ? আট মাসের শিশুর যে বুলিও ফোটে না !

গোটা হলঘর নিস্তব্ধ। শিশুটি চেঁচিয়ে চলেছে, ওকে কোলে নিয়ে মা হাপুস নয়নে কেঁদে চলেছেন, পাশে ওর বাবা স্তম্ভিত দাঁড়িয়ে রয়েছেন।

মা কাঁদছেন আর চিৎকার করছেন,

— ওগো, তুমি এই বদমাসদের কিছু করো — এরা আমাদের ছেলেটাকে পাগল করে দিল — পুলিসে দেবো — সবাইকে জেলে দেবো — আমার ছেলেকে ঠিক করে দাও — এ আমার কি হল আমি কিচ্ছু চাই না . . .

কেউ ওদের কাছে ঘেঁষছে না। সবাই চিত্রার্পিতের মতো দাঁড়িয়ে।

শিশুটি কিন্তু চেঁচিয়েই চলেছে, — কি হল ? এখানে দাঁড়াচ্ছ কেন ? চল, আমায় নিয়ে চল। অনেক কাজ বাকি —

শমিত আর সহ্য করতে পারলেন না। ভিড় ঠেলে এগিয়ে গেলেন শিশুটির বাবার কাছে।

— একটু বলবেন, কি হয়েছে ? হঠাৎ এমন আনন্যাচারাল বিহেভিয়ার, আসলে আমরাও এসেছিলাম ছেলের জন্যে।

ভদ্রলোকের কথা বলার মতো অবস্থা নেই ! যেটুকু বোঝা গেল, ওঁরাও আজ কাগজে খবর দেখে এসেছিলেন। তারপর স্ত্রীর পেড়াপিড়িতে আজ থেকেই "জিন ট্রিটমেন্ট কোর্স" শুরু করেছিলেন একমাত্র শিশুপুত্রের। ওর স্ত্রীর ইচ্ছে ছিল ছেলেকে রাজনীতিবিদ করবেন। কেমন রাজনীতিবিদ ? না, যে হবে সবার ওপরে, ডিক্টেটর। ওরা সেই কোর্সই চালু করে। আজকের কোর্স শেষ করে যখন বেরোচ্ছেন, তখন থেকেই আচমকা শিশুটি এমন আচরণ শুরু করেছে। যে তিনঘন্টা আগে একটাও কথা বলতে পারত না, সে এইসব ভয়ংকর কথা বলে চলেছে অবিরাম।

এইসময় ভিড়টা দুভাগ হয়ে গেল। একজন পুরোদস্তুর বিদেশী বয়স্ক মানুষ এসে দাঁড়ালেন ওদের কাছে। ইংরাজিতে বললেন, — তোমরা তোমাদের শিশুকে আগের অবস্থায় ফেরত চাও ? উত্তেজিত হয়ো না। ওকে আমাকে দাও, একটা ইঞ্জেকশন দিলেই ও আবার আগের জায়গায় ফিরে আসবে।

বলতে বলতে শিশুটিকে মায়ের কোল থেকে নিজের কোলে নিয়ে নিলেন।

তারপর সটান ঢুকে গেলেন 'অপারেশন থিয়েটার' লেখা দরজা দিয়ে।

শমিতবাবু হাত ধরে টানলেন জয়তীদেবীকে, — কী, শখ মিটেছে ? চলো এবার হুঁ, প্রকৃতির ওপর খোদকারী, শিব গড়তে শিবা।

হ্যাঁ চলো। — জয়তীদেবী মুখের ঘাম মুছে বললেন ঃ বাপ্‌রে ! কী সাংঘাতিক। দরকার নেই আমাদের সোনামণিকে 'সুপারম্যান' করে। ও ভালভাবে বড় হয়ে উঠলেই আমি খুশি।

বিজ্ঞানের শব্দজব্দ

রো শে না রা মি শ্র

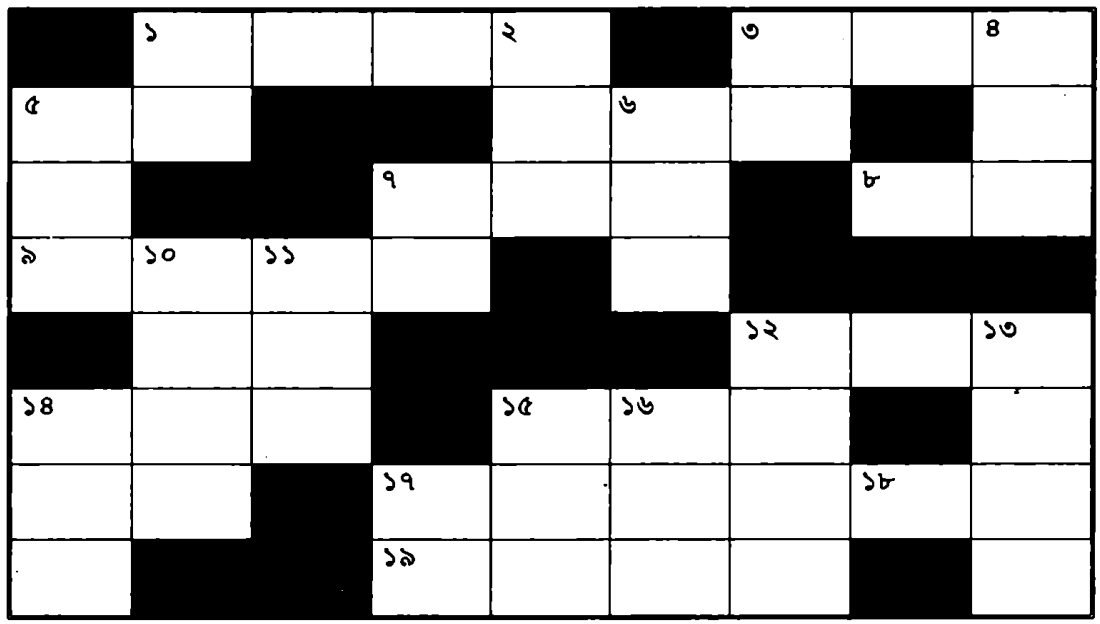

পাশাপাশি

১. এম. কে. এস পদ্ধতিতে বলের একক
৩. দিগনির্ণায়ক যন্ত্র
৫. একটি দানাশস্য
৬. হঠাৎ পাওয়া ধাক্কা
৭. দক্ষিণ আমেরিকার প্রাচীন সভ্যতা
৮. যে রক্তকনিকা জীবাণুর সঙ্গে লড়াই করে
৯. চতুষ্পদী সরীসৃপ
১২. কুইনাইন যে গাছ থেকে পাওয়া যায়
১৪. ফ্যাটি অ্যাসিডের লবণ যা কাপড় কাচতে ব্যবহার হয়
১৫. যে যন্ত্র হৃদপিণ্ডের কাজ বুঝতে ব্যবহৃত হয়
১৮. গ্যালিলিও যে হেলানো টাওয়ার-এ পরীক্ষা করে দেখান যে ভারী জিনিষ আর হাল্কা জিনিষ একই দূরত্ব একই সময়ে অতিক্রম করে।
১৯. ক্ষুদ্রান্ত্রের একটি অংশ

ওপর নীচ

১. একটি উপকারী বৃক্ষ
২. একটি ইন্দ্রিয় ও একটি প্যালিনড্রোম
৩. রবার্ট — , একজন ভূপর্যটক
৪. যে শ্বসন পদ্ধতিতেঅক্সিজেন দরকার হয়
৫. একটি কোষীয় অঙ্গানু
৬. যে বর্ষ গণনা পদ্ধতি কনিষ্কর আমলে চালু হয়
৯. স্পিলবার্গের যে কল্প বিজ্ঞানাশ্রয়ী সিনেমায় ভিনগ্রহের প্রাণী আছে
১০. রক্ত যার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়
১১. একজন ঐতিহাসিক ১২. একটি মৌল
১৩. দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় যে শহরটিকে অ্যাটমবোমা ধ্বংস করেছিল ১৪. কোণানুপাত মাপা হয় যার দ্বারা
১৫. গ্যালিলিও যে দেশের লোক ছিলেন
১৬. ব্যাক্টেরিয়ার গমনাঙ্গ
১৭. ২২/৭ কে যে রোমান হরফে প্রকাশ করা হয়

IMPORTANT PUBLICATION OF THE CALCUTTA UNIVERSITY

1.	Bama Bodhini Patrika	:	Dr. Bharati Ray	Rs. 150/-
2.	Asutosh Mukhopadhyer Sikkha Chinta	:	Dr. Dinesh C. Sinha	" 75/-
3.	Purba Banger Kabi Gan	:	Dr. Dinesh Ch. Sinha	" 90/-
4.	Mymensingha Gitika	:	Ray Bahadur D. C. Sen	" 90/-
5.	Banglar Baul	:	Pt. Kshiti Mohan Sen Shastri	" 30/-
6.	Agrarian System of Ancient India	:	U. N. Ghosal	" 15/-
7.	Kavi Kankan Chandi	:	Srikumar Banerjee	" 60/-
8.	Bankim Smarak Sankha	:	Dr. Ujjal Kr. Mazumdar	" 55/-
9.	Hand Book fo the C.U.	:	Calcutta University	" 15/-
10.	The Science of Sulba	:	B. B. Dutta	" 40/-
11.	Anchalik Bangla Bhashar Abidhan	:	Dr. A. K. Bandyopadhyay	" 100/-
12.	Bangla Chhander Mulsutra	:	Amalendu Mukhopadhyay	" 35/-
13.	Introduction to Tantric Buddhism	:	Dr. S. Dasgupta	" 16/-
14.	Yoga Philosophy of Patanjali	:	H. Aranya	" 125/-
15.	An Introduction to Indian Philosophy	:	Dutta & Chatterjee	" 35/-
16.	Elements of the Science of language	:	I. J. S. Taraporewala	" 60/-
17.	History of Sanskrit Literature	:	Dr. S. N. Dasgupta & S. K. Dey	60/-
18.	Temples of Ranipur Jharial	:	D. R. Das	" 145/-
19.	Nabacharyya Pada	:	Dr. Sasibhusan Dasgupta	" 35/-
20.	Studies in Indian Antiquities	:	H. C. Ray Chaudhury	" 55/-
21.	Vaishnab Padavali (Chayan)	:	Calcutta University	" 30/-
22.	Sakta Padavali	:	Amarendra Nath Ray	" 35/-
23.	Ekaler Samalachana Sanchayan	:	Calcutta University	" 30/-
24.	Ekaler Prabandha Sanchayan	:	Calcutta University	" 35/-
25.	Ekaler Kabita Sanchayan	:	Calcutta University	" 25/-
26.	Ekaler Chhoto Galpa Sanchayan	:	Calcutta University	" 25/-

For further Details Please Contact—

Manager, Book-Depot, Calcutta University
48, Hazra Road, Calcutta-700 019

All the Publications will be available at the Calcutta University Sales Counter, College Street Campus, Calcutta-700 073

আমাদের বই

জীবনের জন্য বিজ্ঞান	❐	২.০০	মানুষের জন্য বিজ্ঞান, সমাজের জন্য বিজ্ঞান	❐	৩.০০
ভূপাল গ্যাস দুর্ঘটনা	❐	৩.০০	পরিবেশ : প্রাকৃতিক সম্পদ ও দূষণের সঙ্কট	❐	৫.০০
বিজ্ঞান নাটিকা	❐	৮.০০	শক্তির বিকল্প উৎসের সন্ধানে	❐	৩.০০
বরণীয় বিজ্ঞানী	❐	৫.০০	সন তারিখ হপ্তা মাস	❐	৬.০০
কম খরচে দরকারী খাবার	❐	৫.০০	সমাজ বিজ্ঞান ও জে. ডি. বার্নাল	❐	৮.০০
মা ও শিশুর স্বাস্থ্য	❐	৩.০০	পাখির কাহিনী	❐	৬.০০
পূর্ণ সূর্যগ্রহণ, ১৯৯৫	❐	৭.০০	বিজ্ঞানের মজার খেলা	❐	১০.০০
বিজ্ঞান কি ?	❐	৩.০০			
এই আমাদের বসুন্ধরা	❐	৬.০০			

শিশু যখন কিশোর হল	❐	৬.০০	সমাজ শরীর অসুখ	❐	৪০.০০
জ্যোতির্বিদ্যা জ্যোতিষবিদ্যা	❐	৮.০০	জল মাটি বাতাস	❐	৪.০০
এবারের সূর্যগ্রহণ আমরা কি পেলাম	❐	৬.০০	ভারতের স্বনির্ভরতা ও ডাঙ্কেল প্রস্তাব	❐	৫.০০
বাংলা সংস্কৃতি ও বিজ্ঞান চর্চা	❐	৮.০০	**In Search of National Mineral Policy**	❐	40.00
মৌলবাদ ও বিজ্ঞান	❐	৬.০০			
পরিবেশ কথা	❐	১০.০০			

পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান মঞ্চ

হেমন্ত বসু ভবন (৩য় তল), ১২ বি. বি. ডি. বাগ
কলিকাতা-৭০০ ০০১